এক্ষণ

১২ বর্ষ
১-২ সংখ্যা
২০৮৩

RDDHI • INDIA

announce their maiden release

A. F. Salahuddin Ahmed

SOCIAL IDEAS & SOCIAL CHANGE IN BENGAL 1818-1835

enlarged new edition

Rs. 60·00

Tapas Kumar Banerjee

HISTORY OF INDIAN CRIMINAL LAW

Rs. 40·00

Mary Carpenter

LAST DAYS IN ENGLAND OF THE

RAJAH RAMMOHUN ROY

Edited with notes by Swapan Majumdar

Rs. 25·00

Nisikanta Chattopadhyaye

YATRAS OR THE POPULAR DRAMAS OF BENGAL

Introduction by Ramakanta Chakrabarty

Rs. 8·00

28 BENIATOLA LANE CALCUTTA 700 009

ORIENT LONGMAN ANNOUNCES THE RELEASE OF

Satyajit Ray's First Book on Films in English

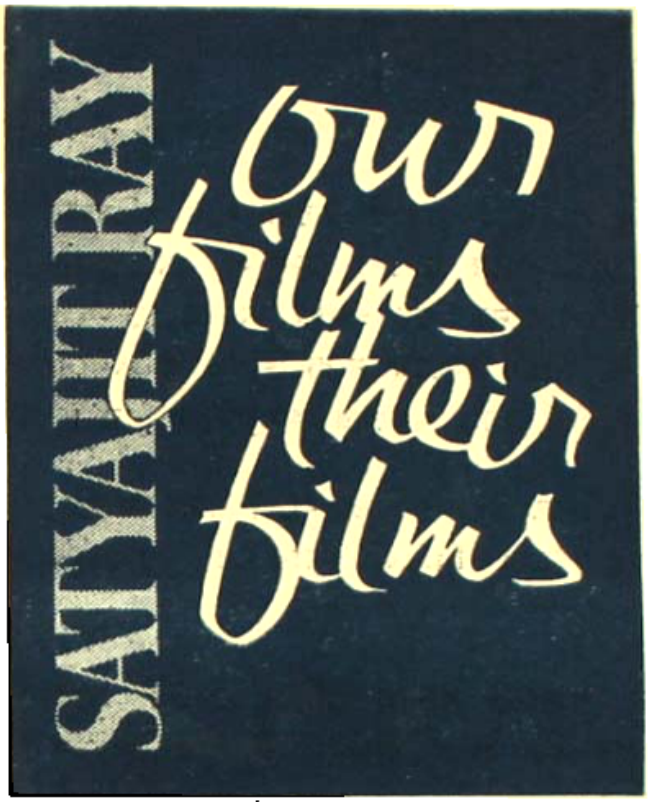

And yet to one who survives the initial shock of unrelenting pressure, film making offers rewards as nothing else does. I hope I have been able to convey in my writings some of the unique excitement that I get out of my work.

CONTENTS

☐ Introduction

OUR FILMS

☐ What is Wrong with Indian Films ? (1948) ☐ Extracts From a Banaras Diary (1956) ☐ A Long Time on the Little Road (1957) ☐ Problems of a Bengal Film Maker (1958) ☐ Winding Route to a Music Room (1963) ☐ Film Making (1965) ☐ The Odds Against Us (1966) ☐ Some Aspects of My Craft (1966) ☐ Those Songs (1967) ☐ Meetings with a Maharaja (1968) ☐ An Indian New Wave ? (1969) ☐ Four and a Quarter (1974)

THEIR FILMS

☐ Renoir in Calcutta (1949) ☐ Some Italian Films I have seen (1951) ☐ Hollywood Then and Now (1962) ☐ Thoughts on the British Cinema (1963) ☐ Calm Without, Fire Within (1963) ☐ Moscow Musings (1964) ☐ The Gold Rush (1964) ☐ Little Man, Big Book (1964) ☐ Akira Kurosawa (1966) ☐ Tokyo, Kyoto and Kurosawa (1967), ☐ New Wave and Old Master (1969) ☐ The Silent Films (1970) ☐ A Tribute to John Ford (1973)

Demy 8vo Pp. 8 + 220 Rs. 60·00

ORIENT LONGMAN LIMITED

CALCUTTA BOMBAY NEW DELHI MADRAS
BANGALORE HYDERABAD PATNA

দধিমঙ্গল

স্মরণাতীত কাল থেকে ভারতে পবিত্র বিবাহ অনুষ্ঠানের সঙ্গে দধিমঙ্গল উৎসবের যোগ রয়ে গেছে। দইয়ের সঙ্গে মঙ্গলের কেন এই যোগসূত্র? এই আশ্চর্য মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানটি পালনের ভেতরকার কারণ খুঁজতে খুব বেশিদূর যেতে হবে না। কারণ দইয়ের মধ্যে আছে যৌবনকে ধারণ করার ও সর্ব রোগমুক্ত দীর্ঘ আয়ু অর্জনের অনন্ত উপাদান।

আমাদের মধ্যে বহুকাল ধরে যে-ধারণা সংস্কারের মতো কাজ করছে, আজকের বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দইয়ের বিবিধ গুণাবলীর আবিষ্কার তাকেই সপ্রমাণ করেছে।

দই শরীরের ক্লান্তি দূর করে, শরীরের সামর্থ্য বাড়িয়ে দেয়। তাই ভারতীয় জীবনযাত্রায় প্রত্যহ সকালের প্রথম পানীয় হিসেবে দইয়ের ব্যবহার এক অতি পুরনো প্রথা। দইয়ের সব চেয়ে বড় গুণ হচ্ছে তা দেহের অপচিত ক্যালসিয়াম ফসফেটকে শোধন ক'রে দেবার ক্ষমতা রাখে ও শরীরে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস উৎপন্ন করে। এটা আমাদের শরীর গঠনের ও পুষ্টির কাজে বিশেষ সহায়ক।

যৌবনকে দীর্ঘায়িত করতে দইয়ের ভূমিকা অসামান্য॥

—

কে. সি. দাশ প্রাইভেট লিমিটেড

মিষ্টান্ন বিক্রেতা

কলিকাতা ॥ বাঙ্গালোর

শ্রীপ্রবীর ঘোষ কর্তৃক ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রেস, কলকাতা ৯ থেকে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা ৯ থেকে প্রকাশিত।

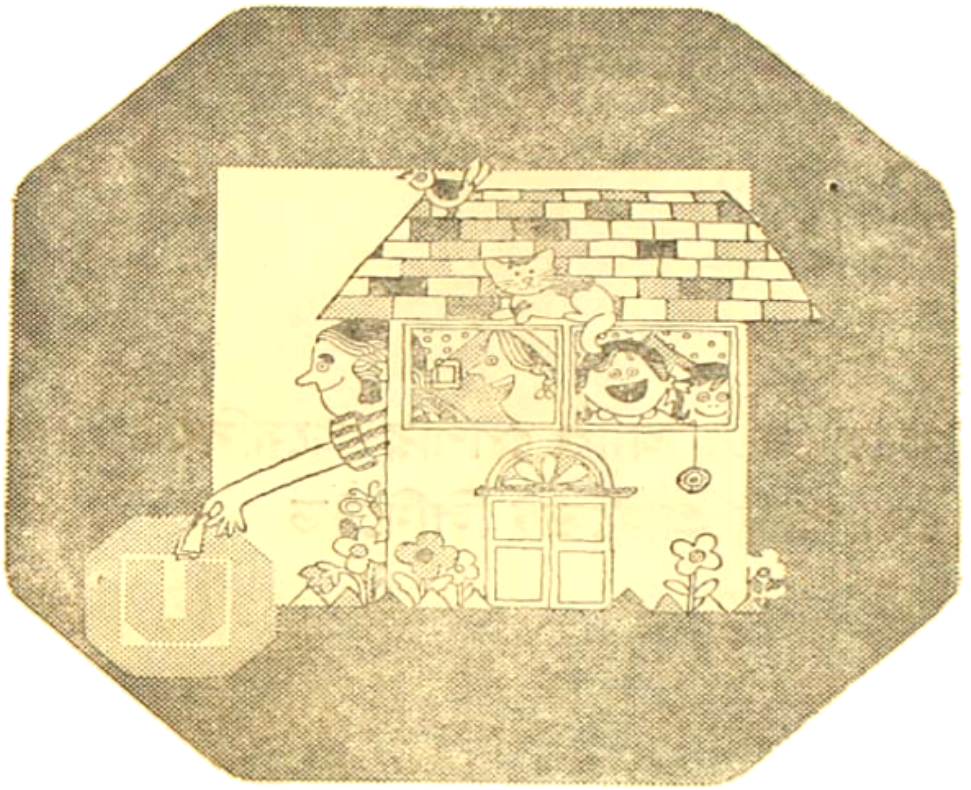

ইউকোব্যাঙ্ক কাছেই আছে, ইউকোব্যাঙ্কে টাকা জমান

যেখানেই থাকুন কাছাকাছি ইউকোব্যাঙ্কের শাখা নিশ্চয়ই পাবেন। এখানে এলে বুঝতে পারবেন, সঞ্চয় কতো সহজে হতে পারে। সারা দেশ জুড়ে ইউকোব্যাঙ্কের শাখা ছড়ানো, আপনার সঞ্চয় যেখানে বেড়ে ওঠে। ইউকোব্যাঙ্কে আপনার সাদর নিমন্ত্রণ—

বিশদ বিবরণের জন্য
যে কোন শাখায় চলে আসুন।

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

UCOCSMA 8BN

আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই

করোগেটিং অ্যাণ্ড পেপার প্রসেসিং
কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড

২৪৩ ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড
কলকাতা ৩৬

টেলিফোন : ৫৫-৩০৫৮/৫৯

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা: নিউ দিল্লী

কলকাতার জয়ঢাক !

বাজলে, আমরা খুশী, আপনারা ?

২বি বাসে প্রণয় চৌধুরী (৯) তাঁর বসার আসনটি ছেড়ে দিলেন এক মহিলাকে। তাঁর দেখাদেখি নাম-না-জানা আরেকজন অতিবৃদ্ধ এক বাসযাত্রীকে বসতে দিলেন···কলকাতার সুনাম ছড়ালো।

কলকাতা আরেকটু ভাল হচ্ছে। কারণ কয়েক জায়গায় বাসযাত্রীরা 'কিউ' করে লাইনে দাঁড়িয়ে পুরো ভাড়া দিয়ে টিকিট কিনে বাসে উঠছেন। অভিনন্দন সি. এস. টি. সি.-কে এবং সেই সব বাসযাত্রীদের যাঁরা কলকাতাকে একটু ভালর দিকে নিয়ে গেলেন···

কলকাতা আরেকটু ভাল কারণ মাদার টেরেসা এবং বহু স্বেচ্ছাসেবী ও প্রতিষ্ঠান অনাথ, আতুর, দুঃস্থ আর বস্তীবাসীদের পাশে দাঁড়াচ্ছেন। তাঁদের অভিনন্দন···

শিয়ালদা স্টেশনের রূপান্তর হয়েছে পূর্ব রেলের স্পর্শে;

নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়াম দেখবার মত জিনিস, বানিয়েছেন পূর্ত বিভাগ। উল্টাডাঙ্গার শিশু উদ্যান দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়, বানিয়েছেন বিধানচন্দ্র রায় মেমোরিয়াল কমিটি। তাঁদের অভিনন্দন

আর অভিনন্দন জানাই কলকাতা কর্পোরেশন এবং রাস্তার ধারের দোকান মালিকদের, যাঁরা স্বার্থত্যাগ করে কলকাতাবাসীর চলার পথ একটু বাধামুক্ত করলেন···ডায়মণ্ডহারবার রোড বেহালা-বাসীদের সহযোগিতায় আজ প্রশস্ত। সি. এম. ডি. এ. প্রকল্পে সি. আই. টি. বালীগঞ্জ ফনবা ব্রীজের কাজ প্রায় শেষ করে এনেছেন, এইচ. আই. টি. বঙ্কিম সেতুকে দাঁড় করিয়েছেন। ব্রাবোর্ন রোডে উড়াল পুলের কাজও শেষ পর্যায়ে···পাতাল রেল আর দ্বিতীয় হুগলী সেতু হবে না বলে যাঁরা এখনও মনে করেন তাঁরা অবিলম্বে নাম লেখান। কয়েক বছর পরে, তাঁদের মুখেই শুনতে চাই, "আমরা তো আগেই বলেছিলাম···"

এই বিজ্ঞাপনের মানে কি ? এটা সি. এম. ডি. এ. বা তার চেয়ারম্যান শ্রীভোলানাথ সেনের ঢাক পেটানো বিজ্ঞাপন, তা নয়, এটা জয়ঢাক, কলকাতার জয়ঢাক। যাঁরা কলকাতার জন্য কিছু করছেন, তাঁদের জয় হোক।

কলকাতার উন্নতি হচ্ছে, আমার খুশী, আপনারা ?

বিশ্বভারতীর বই

আধুনিক শিল্পশিক্ষা

শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

আধুনিক ভারতে শিল্পশিক্ষার ইতিহাস, তিনটি পর্যায়ে আলোচিত : ১. ইংরাজ-প্রবর্তিত আর্টস্কুলের শিক্ষা, ২. ভারতীয় পদ্ধতিতে শিল্পশিক্ষা, এবং ৩. আধুনিকতম শিল্পশিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য। অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলালের শিল্প সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা সংবলিত। মূল্য ৬·০০ টাকা

শিল্পে ভারত ও বহির্ভারত

মণীভূষণ গুপ্ত

শিল্প-শিক্ষার্থী এবং শিল্প-জিজ্ঞাসুদের জন্য প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা। গ্রন্থটি চার-ভাগে বিভক্ত : ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, ভারতীয় চিত্রকলা, বহির্ভারতের শিল্পের ইতিহাস এবং সমসাময়িক চিত্রকলা ও অবনীন্দ্র-যুগ। মূল্য ২০·০০, শোভন ২৪·০০ টাকা

শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ

শ্রীরানী চন্দ

অবনীন্দ্রনাথের শিল্পসৃষ্টির চিত্তাকর্ষক কাহিনী এবং ব্যক্তি অবনীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ পরিচয়। বহু চিত্র ও সুদৃশ্য প্রচ্ছদপটে অলংকৃত। মূল্য ১০·০০, শোভন ১২·০০ টাকা

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কার্যালয় : ১০ প্রিটোরিয়া স্ট্রীট, কলিকাতা ৭১
বিক্রয়কেন্দ্র : ২ কলেজ স্কোয়ার / ২১০ বিধান সরণী

With the compliments of

TATA STEEL

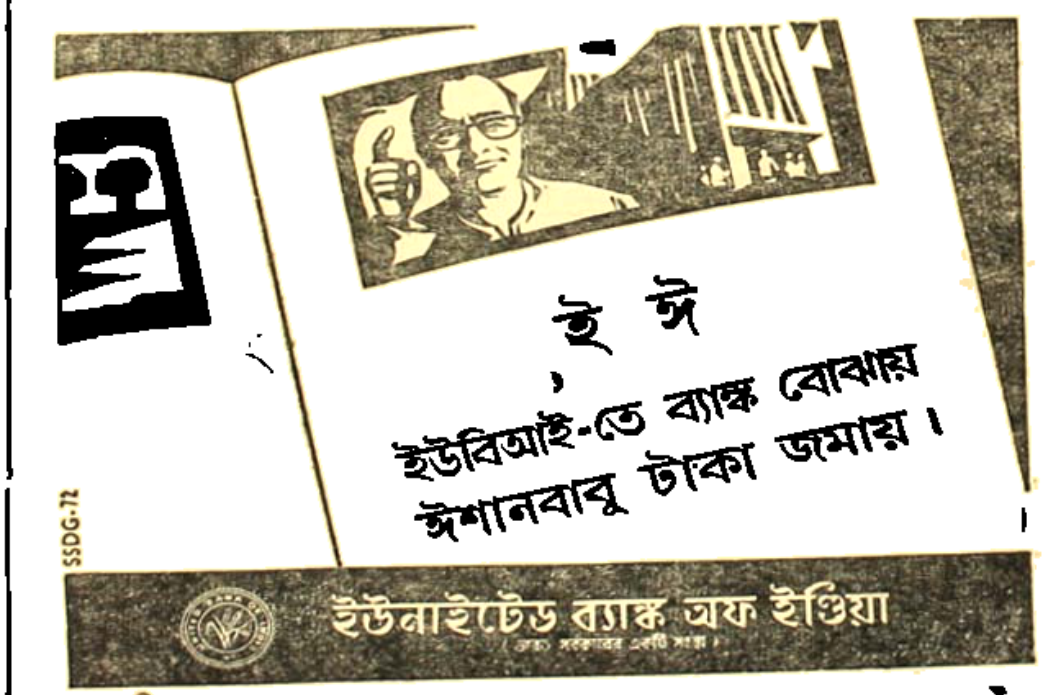

'প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ আত্মার শান্তি'

—শান্তিনিকেতন

কোলাহলের অসহ্য পরিবেশ থেকে মুক্তি পেতে চলুন সব পেয়েছির দেশ শান্তিনিকেতনে, যেখানে মানুষ আর প্রকৃতি কাছাকাছি, যেখানে পরিবেশ সুমধুর, বাতাস স্নিগ্ধ, গন্ধমদির। জগৎ এসে যেখায় মেশে সেই শান্তিনিকেতনে এলে মনে হবে এলেম নতুন দেশে।

রবিতীর্থ এই আশ্রমে এসে পরম নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নিন, ফিরিয়ে আনুন মনের প্রশান্তি। দেখুন মুক্তাঙ্গন অধ্যয়ন, বিচিত্র দেয়াল-চিত্র, নন্দলাল, রামকিংকর, বিনোদবিহারীর শিল্পকর্ম, কলা-ভবন ও বিচিত্রার অমূল্য সংগ্রহশালা, রবীন্দ্ররচনার পাণ্ডুলিপি আর তাঁর চিত্রকলার নিদর্শন। আসুন উত্তরায়ণের আঙ্গিনায় — দেখুন সেখানকার অপূর্ব গৃহশৈলী, উদয়ন, কোনার্ক, পুনশ্চ, উদীচি আর শেষ বেলাকার ঘরখানি শ্যামলী।

আসুন শান্তিনিকেতনে, যেখানে আকাশে গান, বাতাসে গান ঋতুতে ঋতুতে উৎসব। আপনার আনন্দ আর আরামের জন্য প্রস্তুত ট্যুরিস্ট লজ।

বুকিংএর জন্য যোগাযোগ করুন :
রিজার্ভেশন কাউন্টার, ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন,
৩/২, বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (ইস্ট)
কলিকাতা-৭০০ ০০১ অথবা যোগাযোগ করুন,
ট্যুরিস্ট লজ।

বিদেশ বিভাগের জন্য যোগাযোগ করুন :
ট্যুরিস্ট ব্যুরো
৩/২, বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (ইস্ট)
কলিকাতা-৭০০ ০০১
ফোন : ২৩-৬২১১ গ্রাম : TRAVELTIPS
পর্যটন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

TCPT 83AIR/74

With Best Compliments From

Universal Marketing Company

9/1 R. N. MUKHERJEE ROAD

CALCUTTA 1

Stockists

'CHARMINAR' brand

Asbestos Cement Sheets, Accessories Flex-o-Boards, and Pressure Pipes

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য

এই দেশে আনন্দ-বেদনার প্রকাশ বৈচিত্র্যের অন্ত নেই। আমাদের গভীরতম বেদনা, সুকুমার অনুভূতি, আর আনন্দঘন সংবেদন আমাদের চিত্রে ও সাহিত্যে, নৃত্যে ও গীতে রসরূপ প্রাপ্ত হয়। বিভিন্ন প্রদেশের সৃজনী প্রতিভার অপরূপ ভাব ও ব্যঞ্জনা আজ রসিকা লাভ ক'রে সমন্বিত ভারতীয় সংস্কৃতির রূপ নিয়েছে। দূরকে নিকট ক'রে, আন্তঃপ্রাদেশিক সাংস্কৃতিক সংযোগ সম্ভব ক'রে, জাতির ভাব সম্প্রসারের মহৎ আয়োজনে ভারতীয় রেলপথের ভূমিকা সামান্য নয়।

পূর্ব রেলওয়ে

With Best Compliments From

USHA MARTIN BLACK (WIRE ROPES) LIMITED

Registered Office

14 PRINCEP STREET, CALCUTTA 700072
Phone : 23-9516 Cable : 'USHAROPE'
Telex USHAROPE CA-7483

Works

TATISILWAI, RANCHI

Largest Manufacturer and Exporter of
Steel Wires and Wire Ropes
in South East Asia

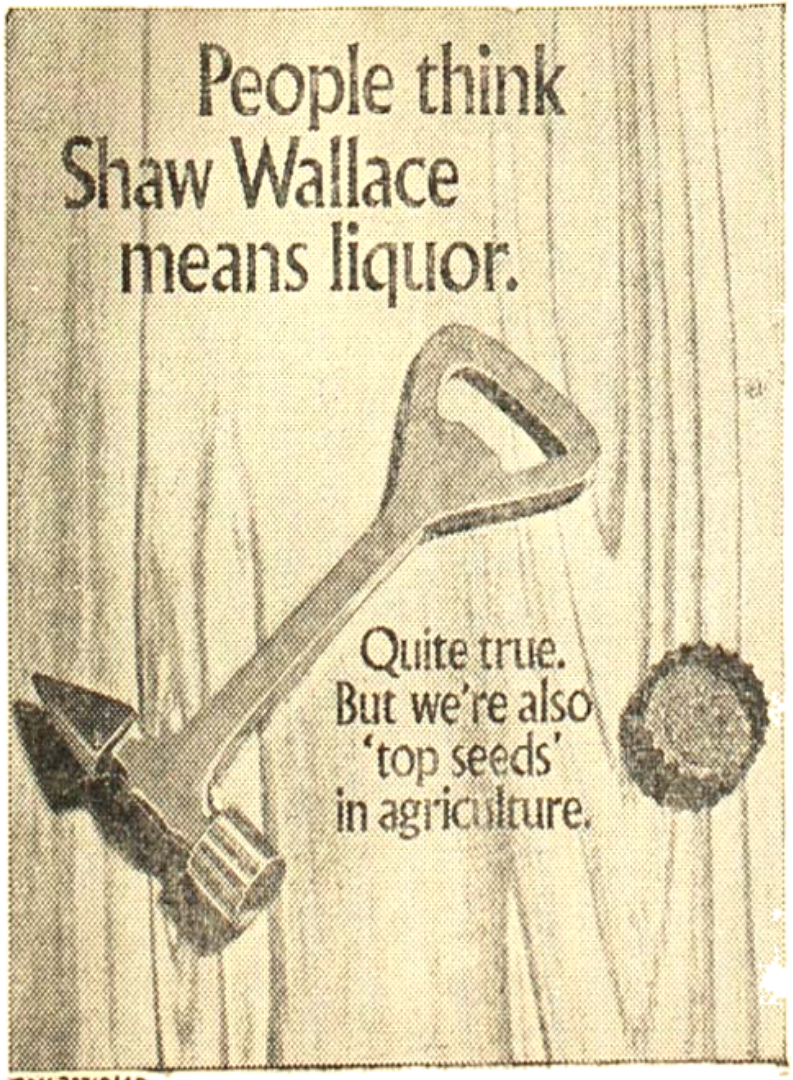

OBM-3376D/4R

And from agrochemicals to feeding stuffs, Shaw Wallace have been sowing the seeds of development from West Bengal to Tamil Nadu.

In the crucial area of agriculture, more specifically fertilisers, we often have to battle against odds, to reach the farmers – even in the remotest village – on time, in times of scarcity. To help them benefit from modern inputs.

We manufacture glue and gelatine, mine steatite, mill flour and grow tea. We have special schemes for unemployed graduates.

Of course, the liquor division continues to record outstanding progress, its products enjoying a high level of confidence.

"...Agricultural operations recorded an increase in the tonnage of fertilisers sold. Demand for superphosphate continued at a high level. Agrochemical sales again increased dramatically by 127% over the previous year..."

From the Chairman's Review of 1973.

We are not the biggest, but we try to be the best.

SHAW WALLACE

মালশ্রীর পঞ্চতন্ত্র

গৌরী ধর্মপাল

সংস্কৃত পঞ্চতন্ত্রের বাংলা রূপান্তর মালশ্রীর পঞ্চতন্ত্র। মূলের নীতিপ্রধান গল্পগুলিকে রসপ্রধান করে তুলে কিশোরদের উপযোগী করে রচিত একটি অভিনব কল্পকথামালা। মূলের পাঁচটি বড় গল্প—মিত্রভেদম্ (বন্ধুবিচ্ছেদ), মিত্রপ্রাপ্তিকম্ (বন্ধুলাভ), কাকোলূকীয়ম্ (চিরশত্রুতা), লব্ধপ্রণাশম্ (পেয়ে হারানো) এবং অপরীক্ষিতকারকম্ (হঠকারিতা) এ বইয়ে যথাক্রমে নাম নিয়েছে শৃগাল-চরিত, চারবন্ধু, কাকে-পেচায়, আর যাব না এবং মণিভদ্র। মধ্যে মধ্যে গাঁথা আছে আরো ৪৬টি ছোট-বড় গল্প। 'বিষ্ণুশর্মা'র পরে মালশ্রী-র কাহিনীটি নতুন সংযোজন।

গীতার পরে আর কোন গ্রন্থ পঞ্চতন্ত্রের মত এত লোকপ্রিয়তা লাভ করতে পারেনি। প্রায় অর্ধশত দেশের দুই শতাধিক ভাষায় এই অমর গ্রন্থখানি অনূদিত হয়েছে।

লেডি ব্রেবোর্ন কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপিকা শ্রীমতী গৌরী ধর্মপাল ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রথম হন এবং আই-এ, বি-এ ও এম-এ পরীক্ষায় কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ স্থান লাভ করেন। শ্রীমতী ধর্মপাল ১৯৭১ সালের ঈশান স্কলার।

[দাম : ১৪·০০]

১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট : কলকাতা ৭০০ ০১২
শাখা ॥ এলাহাবাদ : বোম্বাই : দিল্লী

When a rolling stone gathers moss

Ever since man invented the wheel, things began to move. Centuries later John Boyd Dunlop invented the pneumatic tyre and wheels moved faster and better. And then Dunlop India brought tyre manufacture to India in a big way. Since then Dunlop has led the way. With a progressive record of firsts in the service of India's transport, industry, agriculture, defence and exports.

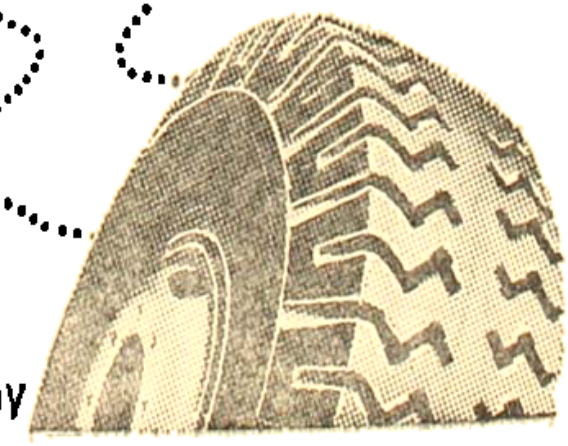

DUNLOP leads the way

সদ্য প্রকাশিত

ড. গিরীন্দ্রনাথ দাস

বাংলা পীর-সাহিত্যের কথা

সচিত্র ॥ ৫০০ পৃষ্ঠা ॥ দাম ৩০ টাকা

বাংলা সাহিত্যের অনাবিষ্কৃত এক অধ্যায়ের লুপ্ত উৎসের সন্ধান ও বিস্তৃত তথ্যের পরিপূর্ণ বিবরণ এই গ্রন্থে পাওয়া যাবে। এতে সন্নিবিষ্ট হয়েছে পীর দরবেশের বাংলা দেশে আগমন কাল, তাঁদের জীবনী, বাংলা সাহিত্যে ও জনমানসে তাঁদের প্রভাবের পরিচয়। সাহিত্যতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে পীর-সাহিত্যের আলোচনা বাংলাসাহিত্যে এই প্রথম ও নিঃসন্দেহে একটি অভিনব প্রচেষ্টা। লেখকের দীর্ঘদিনের পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও গবেষণার ফল এই গ্রন্থ। এটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই লেখককে অভিনন্দিত করেছেন আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. সুকুমার সেন, ড. দেবীপদ ভট্টাচার্য, শ্রীবিনয় ঘোষ প্রমুখ চিন্তাবিদ্‌গণ।

সুবর্ণরেখা ॥ ৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা ৯

সুবর্ণরেখা-র বই

প্রবন্ধ

উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজি সাহিত্যে বিদ্রোহী ভারতের চিত্রকল্প ॥ পল্লব সেনগুপ্ত ৫·০০

প্রাচীন শিল্প-পরিচয় ॥ গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ ৭·০০

রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত ॥ জগদীশ ভট্টাচার্য ১০·০০

বীরভূমের যম-পট ও পটুয়া ॥ দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ৪·০০

নাটক

দানশা ফকির ॥ কমলকুমার মজুমদার ৪·৫০

রাজকুমার ॥ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ৫·০০

ছোটগল্প

গল্প-সংগ্রহ ॥ কমলকুমার মজুমদার ১০·০০

উপন্যাস

সমান্তরাল ॥ সাধনা মজুমদার ১০·০০

দেশদ্রোহী ॥ অসীম রায় ৬·০০

অনুবাদ

বিস্মাকার রাজা ॥ তরু দত্ত ৩·০০

সুবর্ণরেখা ॥ ৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা ৯

এক্ষণ সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক দ্বিমাসিক পত্রিকা
দ্বাদশ বর্ষ ॥ ১-২ সংখ্যা : ১৫৮৩ ॥ সূচিপত্র

শিল্প-জিজ্ঞাসা ॥ বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ১
'কলকাতার টুকিটাকি' ও অন্যান্য প্রসঙ্গ ॥ রাধারমণ মিত্র ১৭
দিবারাত্রির কাব্য : একটি উপন্যাসের জন্ম ॥ যুগান্তর চক্রবর্তী ৪৩
দিবারাত্রির কাব্য : আদি পাণ্ডুলিপি ॥ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৮
ত্রৈলোক্যনাথ : একটি অন্বেষিত অধ্যায় ॥ সন্তোষকুমার বসু ৯৪

প্রচ্ছদপট ঃ সত্যজিৎ রায়

সম্পাদক ঃ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ॥ নির্মাল্য আচার্য

কার্যালয় : ৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড ॥ কলিকাতা ৯

১৯৭৬-এর কর্মসূচী

পশ্চিমবঙ্গে প্রতিটি জেলায় সাক্ষরতা অভিযান প্রসারিত হয়েছে। এই মুহূর্তে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যা ১০৬৯ ও শিশু শিক্ষাকেন্দ্র ১৪১। বর্তমান বছরের মধ্যেই এই কেন্দ্রগুলির সংখ্যা বাড়িয়ে তুলে আমাদের বিরাট কর্মসূচীর অন্যতম প্রধান লক্ষ্যে পৌঁছে যাব বলে আমাদের বিশ্বাস।

সাক্ষরতা কেন্দ্রগুলির গত বছরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমাদের আরো আশাবাদী হবার কারণ রয়েছে। আমাদের সহযোগিতা নিয়ে সাফল্যের পথে এগিয়ে যাচ্ছেন আমাদের সহযোগী কেন্দ্ররূপে পরিচিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয় সেবাদলসহ বহু সংগঠন। নিরক্ষর দেশবাসীকে 'শিক্ষালাভে সহযোগিতা' করা এবং সেই সঙ্গে তাদের জীবিকার প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে সামাজিক দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ করাই ১৯৭৬-এ সমিতির কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য।

বয়স্ক, নিরক্ষর ও বিদ্যালয়-বহির্ভূত শিশু মিলিয়ে তিনটি পর্যায়ে কর্মসূচীকে ভাগ করার এক ব্যাপক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে: বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র, শিশু সাক্ষরতা কেন্দ্র ও বিদ্যালয় সাক্ষরতা কর্মসূচী। ১৯৭৬-এর সমস্ত কর্মসূচীর রূপায়ণের জন্য চাই বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ সমস্ত প্রগতিশীল ব্যক্তি ও গণ-সংগঠন সমূহের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা। এই রাজ্যে আরো যেসব সাক্ষরতা সংগঠন আছেন তাঁদের কাছেও সক্রিয় সহযোগিতার আহ্বান আমরা রাখছি। রাজনৈতিক দলসমূহকে এই কর্মসূচীর প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করার প্রস্তাবও আমরা দিচ্ছি।

কিছু স্বার্থান্বেষী মহল সমিতির বিভিন্ন সাফল্যে আতঙ্কিত ও সমিতির ভাবমূর্তি কলঙ্কিত করার জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে সচেষ্ট। এই আক্রমণের লক্ষ্য শুধুমাত্র সমিতি নয়, ক্রমপ্রসারমান সুস্থ সাংস্কৃতিক চেতনার ক্ষেত্রই এর মূল লক্ষ্য। সমিতির সাক্ষরতা প্রকাশনের নিরলস প্রয়াসে এই ক্ষেত্রটি সজীবতা লাভ করেছে। অন্যান্য বহু প্রকাশন-সংস্থা এই প্রচেষ্টার শরিক হয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই অপসংস্কৃতির বাহকরা এতে ক্ষতিগ্রস্ত ও ক্ষিপ্ত। ব্যাপকতর সাক্ষরতা কর্মসূচীর মাধ্যমেই এর জবাব দেওয়া ১৯৭৬-এ আমাদের অন্যতম লক্ষ্য॥

—

পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি

বিদ্যাসাগর সাক্ষরতা ভবন

৬০ পটুয়াটোলা লেন॥ কলকাতা ৯

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

শিল্প-জিজ্ঞাসা

শক্ত মোমের তাল হাতের উত্তাপে রৌদ্রের ঝাঁজে ধীরে ধীরে নরম হয়ে আসছে, আঙুলের চাপে বস্তুটার আকার-প্রকার বদলে যাচ্ছে। এখন মোমের তাল হাতের টানে লম্বা করা যাচ্ছে, ছুরি দিয়ে কাটা যাচ্ছে, যেমন ইচ্ছা তেমনই তার আকার বদলে দিতে কষ্ট হচ্ছে না।

এইভাবে মোমের তাল নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে একদিন তার মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এল একটা আকার, মানুষ কি বাঁদর ঠিক ঠাওর না করতে পারলেও এটা যে বস্তুপিণ্ডের স্বাভাবিক আকার থেকে ভিন্ন তা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না।

এইভাবে টেপাটিপি করতে-করতে একদিন মোম থেকে বেরিয়ে এল একটা মানুষের আকার। ছেলে কি মেয়ে তা অবশ্য বোঝা যাচ্ছে না। তবে এটি যে মানুষ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। স্বাভাবিক মানুষের সঙ্গে মিল না থাকলেও এর অস্তিত্ব অস্বীকার করা চলে না। অন্যান্য মোমের তাল থেকে এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন।

উত্তাপ বাড়িয়ে দিতেই মোমের তৈরি মানুষ আবার বস্তুপিণ্ডে পরিণত হল। যদি কেউ চায় তবে আবার একই মোম থেকে আরও অনেক রকম আকার-প্রকার বেরিয়ে আসতে পারে। বস্তুপিণ্ডকে রূপান্তরিত করার এই যে দাবি, এই থেকে দেখা দিয়েছে শিল্পরূপ।

মাটি, ইঁট, পাথর, কাঠ, লোহা, প্লাস্টিক সকল বস্তুর মধ্যে নিহিত আছে নতুন রকমের আকার-প্রকার। বস্তুবিশেষের স্বভাব আয়ত্ত করতে পারলেই শিল্পী তার থেকে নানা আকার-প্রকার উদ্‌ভাবন করতে পারেন। বৈজ্ঞানিক বস্তুপিণ্ডের বিভিন্ন বস্তু-উপাদান আবিষ্কার করতে পারেন। কাঠ, পাথর কাটতে হলে কি রকম শক্ত হাতিয়ারের প্রয়োজন, মাটি পোড়াতে গেলে কতখানি উত্তাপের দরকার, এসব বৈজ্ঞানিকদের কাছে জানা যাবে। কিন্তু বস্তুর মধ্যে আর একটি সত্তা নিহিত আছে, সে খবরে বৈজ্ঞানিকদের প্রয়োজন নেই।

প্রদীপ, তেল, সলতে সবই আছে কিন্তু সেখানে আলো নেই। দেশলাই জেলে প্রদীপ জ্বলে উঠল, আলো হল, উত্তাপও পাওয়া গেল। বিজলী বাতি দেশলাই দিয়ে জ্বালা যাবে না। সুইচ টিপলেই জ্বলে উঠবে। টর্চের আলোয় অন্য বাতি জ্বলবে না।

যেসব মানুষ নিজের অন্তরের উত্তাপ দিয়ে প্রকৃতি-জাত বস্তু দিয়ে আকারের জগৎকে উজ্জ্বল ক'রে তুলতে পারে তাদেরই আমরা বলি শিল্পী। আর যাদের হাতে বুদ্ধির টর্চ আছে তারা শিল্পীর রচনাকে দেখতে পারে কিন্তু নতুন রচনাকে সৃষ্টি করতে পারে না।

শিল্পী যা সৃষ্টি করে তা চিরস্থায়ী নয়। অনেককিছু ভেঙে মুছে মাটির সঙ্গে মিশে যায়। আবার কিছু-কিছু মাটির নিচে চাপা পড়ে যায়। বহু শতাব্দী পরে তার উদ্ধার হয়। অতীতের সৃষ্টি কখনো-বা বর্তমানকে আলোকিত করে কখনো-বা তার সে শক্তি থাকে না। কেবল অতীতের স্মৃতির ধারক মাত্র হয়ে থাকে।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রভাবে সভ্যতার বিকাশ-বিবর্তন বদলে যায়, তা আমরা নিজেদের জীবনযাত্রার দিকে লক্ষ করলেই অনুভব করতে পারি। বৈজ্ঞানিকের এই অবদানের সঙ্গে তুলনা করলে অনেক সময় শিল্পীর অবদান সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। কারণ শিল্পী প্রত্যক্ষভাবে কোনো সামাজিক সমস্যারই সমাধান করে না। তবু শিল্পের প্রয়োজন আছে বলেই এই কাজকে কোনো দিনই সমাজ বর্জন করে নি।

মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি যেমন আছে তেমন তার হৃৎপিণ্ডেরও কিছু প্রয়োজন আছে। শরীরের অভ্যন্তরে এই ক্ষুদ্র যন্ত্রটিতে যদি ছুঁচ ফুটিয়ে দেওয়া যায় তবে মানুষের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। শিল্প, সংগীত, সাহিত্য সমগ্রভাবে সমাজের হৃদ্‌যন্ত্র-রূপে কাজ করছে। এ গুলিকে নষ্ট ক'রে দিলে সমাজজীবনে মনুষ্যত্ব লোপ পাবে। ব্যক্তিজীবন মমত্বহীন যন্ত্রে পরিণত হবে।

জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়েও শিল্পের বিকাশ সহজসাধ্য নয়। এই প্রসঙ্গে এ কথাও বলা প্রয়োজন যে আজকের দিনে শিল্প ও বিজ্ঞানের যে পার্থক্য সেটি অস্বাভাবিক সামাজিক পরিস্থিতিরই ফল। সকল শিল্প, কাব্য-কলা এককের সৃষ্টি। তৎসত্ত্বেও পরম্পরারও শিল্পে যে কিছু স্থান নেই তা নয়।

ছোট ছেলে করাত নিয়ে খেলা করতে করতে আবিষ্কার করতে পারে যে করাতের কোন দিকটি সোজা, কোন দিকটি উল্টো। ছুরি-কাঁচি চালানো, কথা বলা, শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নড়াচড়া সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন সকলের পক্ষে সম্ভব। তবে এই জাতীয় শিক্ষা সময়সাপেক্ষ। এই জন্য প্রয়োজন হয় অন্যের সাহায্য নেওয়া।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অন্যের সাহায্য যতটা দরকার শিল্পের ক্ষেত্রে ততটা নয়। কী ক'রে শক্ত জিনিস কাটতে হয়, কী ক'রে কীভাবে দেওয়ালে, কাগজে, মাটিতে রং লেপতে হয়, চাক কী ক'রে ঘুরোতে হয়, এগুলি পরম্পরার পথে জেনে নেওয়ার দরকার। শিল্পের ভাষা যখন জটিল হয়ে ওঠে তখন পরম্পরার আধিপত্য বেড়ে চলে। শিল্পের নিজের সৃষ্টি-শক্তি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় পরিণত হয় এবং শিল্পের মৃত্যুর কারণ ঘটে। বৈজ্ঞানিক বিচার-বিশ্লেষণ যুক্তির

পথ ধরে শিল্পী কাজ করে না। হৃদয়াবেগের শক্তিতেই শিল্প আত্মপ্রকাশ করে বিভিন্ন উপাদানের আশ্রয়ে।

বৈজ্ঞানিক যুক্তির সঙ্গে শিল্পীর যুক্তির পার্থক্য যে কতটা, সে সম্বন্ধে উপরে ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। বাস্তব সত্যের সঙ্গে শিল্পের মিল খুঁজতে যাওয়া পণ্ডশ্রম। শিল্পের নিজস্ব সত্তা উপলব্ধি করার সঙ্গে দর্শক শিল্পের যুক্তি উপলব্ধি ক'রে থাকেন।

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ—এই ইন্দ্রিয়-জাত উদ্দীপনা শিল্পীর পথ আলোকিত ক'রে থাকে। যেখানে এইসব ইন্দ্রিয়-জাত উদ্দীপনা নেই সেখানে শিল্পরূপের অস্তিত্ব নেই।

ইন্দ্রিয়-জাত উদ্দীপনা শিল্পীর প্রধান অবলম্বন হলেও এইসব উদ্দীপনা অনির্বচনীয় বিমূর্ত ক'রে তুলতে না পারা পর্যন্ত চরম সার্থকতা সম্ভব নয়। তাই বলতে হয় শিল্প প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ, মূর্ত ও বিমূর্ত—এই দুই চরম সীমাকে চুম্বক-শক্তির মতো ধারণ ক'রে আছে। শিল্পের যে অংশটি মূর্ত, যা আমরা চোখে দেখি, কানে শুনি, হাতে স্পর্শ করি, সেই অংশটি ভাষা-আঙ্গিক আশ্রিত, আর যেখানে শিল্প বিমূর্তের দিকে এগিয়ে চলে সে অংশটি সৃষ্টি হয় শিল্পীর অন্তরের উত্তাপে।

বৈদ্যুতিক শক্তির মতো এই শক্তি রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শের বাস্তব সত্যকে নতুন আলোয় আলোকিত করে।

ভাষা-আঙ্গিক শেখানো যায়, আবেগ-উদ্দীপনা শেখানো যায় না। এটি সহজাত শক্তি। কোথাও এর উত্তাপ কম কোথাও বেশি। এখানে পরম্পরা অথবা সমাজের দায়িতে এই ব্যক্তিনির্ভর শক্তিকে চেপে মারার চেষ্টা এক রকমের সামাজিক বর্বরতা ছাড়া আর কিছুই না। এই বর্বরতার সম্মুখীন হয়েই শিল্পের ক্ষেত্রে বিদ্রোহ দেখা দেয়। মুষ্টিমেয় শিল্পীর উপলব্ধির সাহায্যে শিল্পের নতুন যুগের সূচনা দেখা দেয়। যেমন হয়েছে আধুনিক যুগে।

ভাষা মাত্রেই বিবর্তনশীল। সাহিত্য, শিল্প, সংগীত, নৃত্যকলা এর কোনোটারই ভাষা একভাবে চলে না এবং এই পরিবর্তন সৌন্দর্যবোধের দ্বারাই ঘটে থাকে। ভাষা বিবর্তনশীল হওয়া সত্ত্বেও কতকগুলি মৌল উপাদান একই থেকে গেছে।

সংগীত শব্দাশ্রিত। শব্দ থাকবে না অথচ সংগীত থাকবে এমনটি হয় না। সাহিত্য শব্দাশ্রিত হলেও সেখানে অর্থ প্রধান লক্ষ্য। উত্তম কাব্যে শব্দ-অর্থের যুগপৎ সমন্বয় হয়ে থাকে।

শিল্পকলা (স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্র ইত্যাদি) আকারাশ্রিত। শিল্পের ভাষার সাহায্যে শব্দ প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ফুলের রং কবি বর্ণনা করতে পারেন,

তবে রঙের আবেদন ও উদ্দীপনা দেখানো সাহিত্যিকের পক্ষে সম্ভব না। অপরদিকে এই কাজটি শিল্পী করতে পারেন অনায়াসে রঙের লেপ দিয়ে।

চিত্রের মতো মূর্তিও দৃক্‌জাত উদ্দীপনার সাহায্যে সৃষ্টি করে শিল্পী। এ ক্ষেত্রে দৃক্‌-জাত উদ্দীপনা অপেক্ষা স্পর্শ-জাত অভিজ্ঞতার পথে আবেদনই অধিক সক্রিয়। স্পর্শের সাহায্যে আলোকহীন স্থানে মূর্তির আকার-প্রকার খুঁজে পাওয়া যায়, কিন্তু আলোকহীন স্থানে চিত্রের কোনো আবেদন নেই।

আমরা কথা বলার সময় হাত-পা নেড়ে মুখভঙ্গি ক'রে বক্তব্য বিষয়কে অনেক সময় প্রাঞ্জল করার চেষ্টা করি। এই অঙ্গভঙ্গিকে নাটকীয় ভঙ্গি বলা চলে, কিন্তু নৃত্য বলা চলে না। কারণ নৃত্যে অঙ্গভঙ্গি প্রধান, অর্থব্যঞ্জক বাক্য সে ক্ষেত্রে গৌণ এবং সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়।

অঙ্গভঙ্গি, অর্থব্যঞ্জক শব্দ, সাজপোশাক ইত্যাদির সমন্বয়ে দেখা দিয়েছে অভিনয়ের ভাষা। অভিনয়ের ভাব (Dramatic element) চিত্রে, মূর্তিতে, নৃত্যে, সাহিত্যে উপাদান-রূপে গৃহীত হতে দেখা যায়। প্রয়োজনের তাগিদে, ভাবের আবেগে অথবা যুক্তি-বিচারের পথে কোনো তথ্য প্রকাশ করার প্রয়োজন থেকে বিভিন্ন ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটেছে। এই তিনের মধ্যে ভাব-মুখী ভাষাই ভাষার গতি-প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে।

শিল্পের ভাষা মূলত ভাবপ্রধান। প্রত্যেক ভাষার কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। অপর দিকে আছে ভাষার মধ্যে নিহিত সম্ভাবনা (Limitation and possibility)। অনুসন্ধান করলে লক্ষ করা যাবে শিল্পের ভাষা ও আঙ্গিক কোনো শব্দ প্রকাশ করে না।

শব্দাশ্রিত বাক্যের সাহায্যে তথ্য প্রকাশ বা প্রয়োজনীয় বিষয় ব্যক্ত করা যত সহজ শিল্পের ভাষায় তেমন নয়। পরিবর্তে শিল্পের ভাষা প্রকাশ আকার ও ভঙ্গির আশ্রয়। যে কোনো দেশের যে কোনো শিল্পের বিশ্লেষণ করলে শেষ পর্যন্ত পাওয়া যাবে মৌল উপাদানরূপে আকার ও ভঙ্গি।

আলোকোজ্জ্বল, বর্ণময় জগতের মধ্যে আকার ও ভঙ্গি বৈচিত্র্যময় হয়ে আমাদের যে বিশেষ উদ্দীপনা সৃষ্টি করে সেই উদ্দীপনার পথেই শিল্পকলার সৃষ্টি।

উদ্দীপনা থেকে ভাব, ভাব থেকে রস-সৌন্দর্য প্রকাশ পায়। শিল্পীর সৃষ্টিতে অর্থাৎ শিল্পীর বাস্তব অভিজ্ঞতা অথবা মানসিক প্রবণতা এই দুটির সমন্বয় ছাড়া ভাষার পূর্ণাঙ্গ পরিণতি ঘটে না।

এখন প্রয়োজন এই দুই ভিন্ন উপাদানকে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা ক'রে উপাদানগত বৈশিষ্ট্যগুলিকে স্পষ্ট ক'রে তোলা।

প্রকৃতি-জাত বস্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সীমিত করা যায়। ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই উপাদান কয়টি দিয়েই জগতের সৃষ্টি। এই বিশুদ্ধ জ্ঞানের

পথে শিল্পসৃষ্টি সম্ভব নয়। শিল্পসৃষ্টির জন্য প্রয়োজন আবেগ ও উদ্দীপনা। আবেগ ও উদ্দীপনার যুগপৎ মিশ্রণে সীমিত বাস্তবতা বৈচিত্র্যময় হয়ে ওঠে।

আদিম চিত্রে গতি ও ভঙ্গির প্রকাশই সর্বপ্রধান। আরও নানাদিক দিয়ে সন্ধান করলে মনে হয় গতিভঙ্গির প্রভাবেই আকারকে প্রত্যক্ষ করেছে মানুষ এবং যাদের এই উদ্দীপনা অধিক শক্তিশালী তারাই শিল্পরূপ নির্মাণে প্রবৃত্ত হয়েছে।

জীব-জগতের আকার-প্রকারের বহু বৈচিত্র্য থাকলেও সে ক্ষেত্রে আকার ও ভঙ্গির ক্রিয়া বৈচিত্র্যের দ্বার খুলে দেয়। উদ্ভিদ ও জীব-জগতের যে কথা সেই কথাই প্রয়োগ করা চলে প্রকৃতি-জাত সকল বস্তুতে।

মানুষের আকার-প্রকার এক রকম। অস্থি, মেদ-মজ্জা দিয়ে গড়া মানুষের আকার যখন নৃত্যের ভাষায় নিজেকে প্রকাশ করে তখন তার আবেগ ও উদ্দীপনায় রূপান্তর ঘটে। বটগাছের ছোট চারা ও অতিকায় বটগাছ উভয়ের যে পার্থক্য সেটি প্রধানত ভঙ্গিরই পার্থক্য। স্থির অবস্থায় হরিণ এবং দ্রুত ধাবমান হরিণের মধ্যে আকারগত মিল থাকলেও গতির পার্থক্য উভয়ের মধ্যে আবেগ ও উদ্দীপনার পার্থক্য।

ভাব, ভঙ্গি, আকার এগুলি সম্বন্ধে ধারণা সর্বসাধারণের মধ্যে আছে। তবে যখন এই উপাদানগুলির বিশেষ সংযোগ ঘটে তখন সেই যুক্ত আকারের বৈশিষ্ট্য সে সহজে বুঝতে সক্ষম হয় না, তখন দরকার হয় নতুন দৃষ্টিকোণের।

সাহিত্যিক যেসব শব্দ ব্যবহার ক'রে থাকেন সেই শব্দগুলি অভিধানে পাওয়া যায়, কিন্তু আভিধানিক অর্থ এবং সাহিত্যে-গাঁথা শব্দের তাৎপর্য বদলে যায়। এই তাৎপর্য বদলে যাওয়ার শক্তিকেই আমরা বলি সৃষ্টিশক্তি।

দৃশ্য ও স্পর্শ এই দুইয়ের সমন্বয় ঘটেছে চিত্রে ও ভাস্কর্যে। এই কারণে দুই উপাদানকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করা চলে না। চিত্রে ভাস্কর্যের উপাদান এবং ভাস্কর্যে চিত্রের উপাদান মিশে মিশে আছে। (চিত্রেতে আলো প্রধান)।

উপরের আলোচনা থেকে সিদ্ধান্ত করা চলে যে আকার ও ভঙ্গি বাস্তব জগতে এবং শিল্পের জগতে অঙ্গাঙ্গি হয়ে মিশে আছে। আকার আছে ভঙ্গি নেই, ভঙ্গি আছে আকার নেই তেমনটি ঘটে না। এইবার কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যার প্রয়োজন।

আকার ও ভঙ্গি এই দুই বাক্যের সাহায্যে প্রকৃতিকে চেনা যায় না। প্রকৃতিকে আমরা চিনে থাকি নামের সাহায্যে। তাই কথায় বলে 'নাম-রূপের এই জগৎ'। এই নাম-রূপের জগতের অন্তরালে রয়েছে আকার ও ভঙ্গি। অর্থাৎ সমস্ত জগৎ আবৃত রয়েছে নাম-রূপের আচ্ছাদনে। উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও লয়— প্রকৃতির এই নিয়ম থেকে কারও নিষ্কৃতি নেই। ইন্দ্রিয়-জাত জগতে যে এত বৈচিত্র্য, তার মূলে আছে এই দুর্লঙ্ঘ্য আইন।

শিল্পী যখন এই নিরবচ্ছিন্ন গতি উপলব্ধি করে তখন তার শিল্পে দেখা দেয় রস-সৌন্দর্য। শিল্প-সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই গতিকেই বলা হয় ছন্দ বা Tension।

চীন শিল্প-শাস্ত্রে 'চী' (Chi), ভারতে অলংকার শাস্ত্রে রস ও ধ্বনি, গ্রীক শাস্ত্রে সৌন্দর্য (Beauty) এইগুলি জীবনপ্রবাহকে প্রকাশ করতে চেয়েছে। যখন এই জীবনপ্রবাহের উপলব্ধি শিল্পী ক'রে থাকে তখন জীবনের যে কোনো ক্ষুদ্র অংশের মধ্যেও ঐ একই প্রবাহের ইঙ্গিত দিতে সক্ষম। এই জন্যই মহৎ শিল্পের মধ্যে একটি ব্যাপকতার ইঙ্গিত আমরা পেয়ে থাকি যেটি শিল্প-রূপকে বাস্তব থেকে রূপান্তরিত করে। তখন তার আবেদন হয় অনির্বচনীয়।

আমাদের মন নানা সংস্কারের দ্বারা আচ্ছন্ন। সুন্দর, অসুন্দর সম্বন্ধে আমাদের যে আদর্শ তার অনেকখানি সংস্কারের দ্বারা চালিত। ধ্যান-ধারণার পথে পূর্বার্জিত এই সংস্কার থেকে শিল্পী নিজেকে মুক্ত করতে সক্ষম। এই জন্যই কালে-কালে শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা সৌন্দর্য সম্বন্ধে নতুনতর চেতনা দর্শকদের কাছে উপস্থিত করে।

ধ্যান-ধারণার সম্বন্ধে সূক্ষ্ম বিচার এ ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। কারণ অনুরূপ আলোচনার জন্য দরকার দার্শনিক মননশীলতা ও যোগীর উপলব্ধি। শিল্পীর ধ্যান-ধারণা কিরকম হয়ে থাকে, কতটুকু আবশ্যিক, সেই বিষয়েই এ ক্ষেত্রে আলোচনা করা গেল।

নিজের শিল্প-দৃষ্টিকে সংস্কারমুক্ত করার জন্য প্রয়োজন তীব্র আবেগ এবং একাগ্রতা। চরম দুঃখ, চরম লাঞ্ছনা, তীব্র আনন্দ, তীব্র শোক এইসব অভিজ্ঞতার পথে মানুষের মন এমন একটা অবস্থায় উপনীত হয় যখন আশে-পাশের ঘটনা তাকে আকৃষ্ট করে না। তাই শিল্পীর প্রয়োজন জীবনে কোনো চরম মর্মান্তিক বা তীব্র আবেগ। জন্ম, মৃত্যু, প্রেম, বিরহ এগুলি তাই শিল্পে সাহিত্যে বারংবার প্রতিফলিত হয়েছে।

একাত্মবোধ জন্মালে শিল্পীর ধ্যান সার্থক হল বুঝতে হবে। সৃষ্টি-রত শিল্পীর মন থেকে সংসারের অনেক কথা মুছে যায়। এর সঙ্গে আরও একটি কথা, কাজের সঙ্গে নিজেকে এক ক'রে দেওয়া (Involvement), অর্থাৎ যা করছি সেটাই সর্বপ্রধান আর সব গৌণ। বলতে বা লিখতে গিয়ে অনেক সময় সহজ জিনিস জটিল হয়ে ওঠে। ধ্যান, একাত্মবোধ শব্দগুলি শুনলেই আমরা চমকে উঠি। অথচ যে কাজে আমাদের মন বসে সে কাজেই ধ্যানের উপলব্ধি হয়। তবে কখনো সেই ধ্যান কয়েক মুহূর্তের, আবার কখনো সেই একাগ্রতা, ধ্যান, একাত্মবোধ জীবনব্যাপী হতে পারে। শিল্পীর সাধনার বস্তু এই জীবনব্যাপী ধ্যানের সৃষ্টি।

স্মৃতিশক্তির দ্বারাই বস্তুজগৎ সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা স্থায়ী হয়ে থাকে।

শৈশবে যে গাছ, যে ফুল আমরা দেখেছি সেটিকে পরিণত বয়েসে দেখলেই আমরা চিনতে পারি। তার মূলে আছে স্মৃতিশক্তি। স্মৃতি-পটে কত যে বিচিত্র বস্তু, কত রঙ, কত শব্দ, মুহূর্তে-মুহূর্তে চিহ্ন রেখে যাচ্ছে তার সবটা অনেক সময় আমাদের মনে থাকে না। কোনো অংশ স্পষ্ট, কোনো অংশ অস্পষ্ট থেকে যায়। কিন্তু যেগুলি গভীরভাবে আমাদের স্মৃতি-পটে চিহ্নিত থাকে সেগুলিকে আমরা ভুলি নি। সুখ, দুঃখ, ভয় ইত্যাদি ভাবের সঙ্গে যুক্ত রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ স্মৃতিতে স্থায়ী হয়ে থাকে।

স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে শিল্পী যা রচনা করেন তা প্রকৃতি-জাত উদ্দীপনার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বা রূপান্তরিত নয়। উদ্দীপনা ধারণায় রূপান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত উপাদানগুলি সার্থক শিল্পসৃষ্টির উপযোগী হয়ে ওঠে না।

বহু নরনারীর শরীর দেখতে-দেখতে নারী-পুরুষের একটি বিশিষ্ট রূপ আমাদের ধারণার জগতে জীবন্ত হয়ে ওঠে এবং বাস্তবের এক রকমের রূপান্তর ঘটে। বাস্তব রূপের বহু আকস্মিক আকার-প্রকার মুছে গিয়ে প্রতিমা-রূপে (Image) আত্মপ্রকাশ করে।

প্রত্যক্ষ উদ্দীপনা থেকে স্মৃতি, ধ্যান থেকে ধারণা, ধারণা থেকে বিমূর্ত উপলব্ধির জগতে আমরা পৌঁছোই। বিশ্লেষণের ভাষায় বিষয়টি যেভাবে আমরা বলবার চেষ্টা করলাম ব্যাপারটি ঠিক সেইভাবে ঘটে না। প্রত্যক্ষ উপলব্ধি থেকে ধ্যান-ধারণা উপলব্ধি করে শিল্পী। এই জন্যই দীর্ঘকালের একাগ্র অভিনিবেশ শিল্পীর জীবনে আবশ্যিক।

দীর্ঘকালের অভিনিবিশের পথেই প্রকৃতির ব্যাপক অস্তিত্ব একের সঙ্গে অন্যে সংযুক্ত হয়। এইগুলি স্পষ্ট থেকে স্পষ্ট হয়ে থাকে। ফুল, পাতা, মানুষ, জল, আকাশ যে কোনো একটিকে লক্ষ ক'রে শিল্পী ধ্যানলব্ধ উপলব্ধিকে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়ে থাকে।

উদ্দীপনা, ভাব-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি বিবিধ গুণ একের সঙ্গে এক যুক্ত হয়ে একটি অখণ্ড অস্তিত্বে পরিণত হয়। এই অবস্থা উপলব্ধি করতে হলে প্রয়োজন একাত্মবোধ। এই একাত্মবোধ শৈশবে অতি শক্তিশালী থাকে। এই কারণেই পরিণত শিল্পীকে শিশুর সঙ্গে তুলনা করা হয়। এই একাত্মবোধের সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্তের জন্য বিচারবুদ্ধি অন্তরালে থেকে যায়। পরিবর্তে প্রত্যক্ষ আবেগ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। শিল্প-ভাষার গতি-প্রকৃতি এবং আকার-প্রকার আবেগের তীব্রতার ওপরই নির্ভর করে। এইখানেই শিল্পীর ধ্যান এবং যোগীর ধ্যান ভিন্ন পথে চলে। যোগীর আদর্শ স্ফটিক-শুভ্র শুদ্ধতার উপলব্ধি। শিল্পী চায় স্ফটিকের উপর লাল ফুলের ছায়া।

আনন্দ, সৌন্দর্য, প্রাচুর্য এগুলিও স্ফটিক-শুভ্র শুদ্ধতারই প্রকাশ। আর এক দিকে এ কথা স্বীকার করেছেন যাঁরা ভক্তি-ভালবাসার পথ গ্রহণ করেছেন।

শিল্পীও এ পথের পথিক। তাই বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতি বলেছেন: 'জনম অবধি হাম রূপ নিহারনু, নয়ন না তিরপিত ভেল।'

তৃপ্তি ও অতৃপ্তির মধ্য দিয়ে শিল্পী নিজেকে এক ক'রে যে চেতনার সাক্ষাৎ পায় তা শিল্পী-জীবনের সর্বপ্রধান সম্পদ এবং এই চেতনাকে ভাষার আধারে যে প্রকাশ করতে সক্ষম তাকেই আমরা বলি শিল্পী। এই উপলব্ধিরই প্রকাশ শিল্পে, সাহিত্যে, সংগীতে আমরা উপভোগ করি এবং এক অনির্বচনীয় অবস্থায় উপনীত হই।

আকার-প্রকার দেখে শিল্পীর মনে তার উদ্দীপনা জাগে। এর মধ্যে কোনো কথা নেই। কথা দিয়ে যা ব্যক্ত করা যায় না সেটিকে বোঝাবার জন্য অনেক কথা বলতে হল।

সৃষ্টি-রত শিল্পীর কাছে এইসব কথার প্রয়োজন বিশেষ নাও থাকতে পারে। এমনকি এত কথা না জেনেও সে সার্থক শিল্প সৃষ্টি করতে সক্ষম। কিন্তু শিল্প-সৃষ্টির পর শিল্পী যখন নিজের সৃষ্টিকে দেখে তখন তার মনে ভাল-মন্দের বিচার দেখা দিতে বাধ্য। এ ভাল-মন্দের বিচারের কাছে বিচারবুদ্ধি সক্রিয় হয়ে ওঠে। প্রত্যক্ষ উপলব্ধি বিচারের শাণিত অস্ত্রে খণ্ড-খণ্ড হয়ে যেতে পারে। কাজেই তত্ত্ব তথা তথ্যের প্রয়োজন আছে এও যেমন সত্য, তেমনি তথ্যের দ্বারা সৃষ্টির পূর্ণতা হয় না সে কথাও মিথ্যা নয়।

শিল্পী রস-সৌন্দর্যের পূজারী। সেই পূজার প্রত্যক্ষ প্রকাশ তার আঙ্গিক ও উপকরণের সাহায্যে। ভাষার বৈশিষ্ট্য, আঙ্গিকের স্বকীয়তা যার জানা নেই, যে এগুলি অভ্যাসের পথে আয়ত্ত করে নি সে রসিক হতে পারে, স্রষ্টার মর্যাদা সে পেতে পারে না। স্রষ্টা হতে হলে প্রয়োজন ভাষাজ্ঞান।

সূর্যের আলোক-ছটার মতো মানুষের জ্ঞান এক অমূল্য সম্পদ। এই জ্ঞানের প্রকাশ নানা পথে। শিল্পীর জীবনে জ্ঞানবুদ্ধির উপযোগিতা এবং বৈজ্ঞানিকের পক্ষে একই জ্ঞানের উপযোগিতা ভিন্ন রকম। শিল্পী জ্ঞানবুদ্ধির প্রভাবে শিল্প-রূপকে নতুন-নতুন বৈচিত্র্য দিতে পারে কিন্তু সৃষ্টি করে না। বিচার-বুদ্ধির প্রয়োজন বৈজ্ঞানিকের চেয়ে শিল্পীর অনেক কম হতে পারে, তাতে শিল্পসৃষ্টিতে বাধা পড়ে না।

সাহিত্যের ভাষা-শিল্পের করণ-কৌশল কালে কালে বদলে যায়। এ পরিবর্তনের মূলে প্রায়ই দেখা যায় সমাজগত আদর্শ। এই আদর্শ যেমন শিল্পী-জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে, অপরদিকে শিল্পী সমাজ-মনকে প্রভাবান্বিত করে। অনুকূল অবস্থায় সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে যোগাযোগ সহজ হয়, প্রতিকূল অবস্থায় সংঘাত অনিবার্য।

শিল্পের ভাষাগত বৈশিষ্ট্য উপরের বর্ণিত দুই কারণে ঘটে থাকে। বিবর্তন ও

পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে শিল্পের ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের অনুসন্ধান করতে গেলে লক্ষ করা যাবে যে ভাষাগত কতকগুলি বৈশিষ্ট্য কোনোদিনই সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যায় নি। যে বৈশিষ্ট্যগুলি কালে কালে ভাষা নিয়ন্ত্রিত করেছে সেগুলির সম্বন্ধে জ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত শিল্প-দৃষ্টি বাধা পেতে পারে।

আকার, ভঙ্গি, উদ্দীপনা, ধ্যান-ধারণা—এইগুলিকে বলা যায় শিল্পের অন্তরের বস্তু। আঙ্গিকের সাহায্যে নির্মিত হয় আধার। এবং উদ্দীপনা ধ্যান-ধারণা এগুলিকে বলা যেতে পারে আধেয়। আধার ও আধেয় উভয়ের অখণ্ড সংযোগে প্রকাশিত হয় রস-সৌন্দর্য। যেটিকে বলা হয় 'সহৃদয়-হৃদয় গ্রাহ্য'। শিল্পের জগতে আধার এবং আধেয় এই দুইয়ের সম্বন্ধ স্থাপনের কোনো নির্ভুল কৌশল আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি এবং ভবিষ্যতেও শিল্পজগতে এই দিকটি রহস্যাবৃত থাকবে। কেবলমাত্র প্রতিভার শক্তিতে এই রহস্য উদ্ঘাটিত হয়ে থাকে। নির্মিতি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বুঝিয়ে দেওয়া সম্ভব।

শিল্পীর প্রয়োজন উভয়ের সমন্বয়। এই সমন্বয়ের জন্য প্রয়োজন প্রেরণা। প্রত্যক্ষ উপলব্ধির পথে আবেগ ও জ্ঞানবুদ্ধির সমন্বয় ঘটে। এ জন্যই প্রতিভার সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে 'নব-নব উন্মেষশালিনী প্রজ্ঞা'।

সচরাচর দেখা যায় বুদ্ধির ক্রিয়া আবেগের অন্তরালে, অর্থাৎ আবেগকে সংযত ক'রে চালিত করছে জ্ঞান-বুদ্ধি। দ্বিতীয়ত দেখা যায় নৈতিক বা দার্শনিক জ্ঞান আবেগের দ্বারা চালিত হতে। তৃতীয়ত দেখি আবেগ ও জ্ঞান-বুদ্ধির মধ্যে সংঘাত। শিল্পীর মানসিক গঠনে যখন এই সংঘাত অতি প্রবল তখনই তাঁর রচনাতে সংঘাতের চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং যেখানে আবেগ-বর্জিত জ্ঞান-বুদ্ধি সে ক্ষেত্রে শিল্প-রূপের মাধ্যমে শিল্পী নৈতিক, দার্শনিক বা সামাজিক কোনো একটা আদর্শকে প্রচার করার চেষ্টা করেন।

উদ্দীপনা ও আবেগের পথে শিল্পসৃষ্টি হয় এ কথা সত্য হলেও বুদ্ধিবৃত্তির প্রভাব সে ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয়, এ কথা মনে করার হেতু নেই। বুদ্ধিবৃত্তি হৃদয়-বৃত্তির মতোই মানুষের চরিত্রগত গুণ। জ্ঞান-বুদ্ধির প্রভাবে মননশীলতা মার্জিত উজ্জ্বল হয়ে থাকে। এই কারণে মননশীলতার অংশটি সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া চলে না শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে। একথা ঠিক যে বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে শিল্পসৃষ্টি হয় না, কিন্তু শিল্পীর আদর্শ উদ্দেশ্যকে আলোকিত করার জন্য বুদ্ধিবৃত্তি সকল সময় সাহায্য করছে। এই জন্য শ্রেষ্ঠ শিল্পসৃষ্টিতে Intellect-এর প্রভাব আমরা লক্ষ করি। তবে এই দুই বৈশিষ্ট্য অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এবং হয়েও থাকে তাই।

প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে আদিম শিল্প পর্যন্ত বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগ অন্তরালে থেকেছে। ধর্মীয় আদর্শ বুদ্ধিবৃত্তির স্থান অধিকার ক'রে ছিল। সে সময় শিল্পীদের চিন্তা সামাজিক অবস্থা-ব্যবস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থেকেছে।

ক্রমে শিল্প যতই ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়েছে ততই বুদ্ধির প্রভাব শিল্পের ক্ষেত্রে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে এবং বৈজ্ঞানিক যুগে শিল্পীরা একান্তভাবে বিচারনিষ্ঠ এবং বুদ্ধিমার্গী হয়ে উঠেছে।

Intellect-এর সঙ্গে শিল্পসৃষ্টির সম্বন্ধ কখনো নিকটে কখনো দূরে থাকে, কিন্তু সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয় না। শিল্পীর মানসিক গঠনের সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়-বৃত্তি জড়িত থাকে। বৈজ্ঞানিক মনোভাব, দার্শনিক মনোভাব, আবেগপ্রধান মনোভাব শিল্পীর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে মিলেমিশে আছে। এগুলি কোনটি প্রধান হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে শিল্পী নিজেও বলতে পারেন না। এবার দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টি বোঝবার চেষ্টা করা যাক।

যদি কোনো মধ্যযুগীয় কারিগরকে তার রচিত শিল্পরূপের ব্যাখ্যা দিতে বলা হয় তবে সে ধ্যান-ধারণার কথা বলবে অথবা তার আঙ্গিক সম্বন্ধে কিছু ব্যাখ্যা ক'রে দেবে। পরম্পরার পথ ধরে চলার কারণে কারিগরদের নিজস্ব চিন্তা সব সময় উজ্জ্বল থাকে না। পরিবর্তে সে জানে তার দায়িত্ব কী ?

ভাষা সম্বন্ধে তার ধারণা খুবই স্পষ্ট, কিন্তু বিশ্লেষণ ক'রে সেই ভাষার স্বকীয়তা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা প্রায় সম্ভব হয় না। বৈজ্ঞানিক-পূর্ব যুগের শিল্পী কেবল উদ্দীপনা, ভাব, সৌন্দর্য উপলব্ধি করা ছাড়া আর সবকিছুকেই আনুষঙ্গিক বলে মনে করে।

সামাজিক অবস্থা-ব্যবস্থা, অর্থ নৈতিক সমস্যা এসব বিষয়ে তার ধারণা অস্পষ্ট থাকাই স্বাভাবিক। সোজা কথায় পরম্পরার পথে যে আদর্শ তার কাছে উপস্থিত হয়েছে সেটিকে ধ্যান-ধারণার পথে উপলব্ধি করাই তার সাধনা। এবং ধ্যান-ধারণার পথে জ্ঞানের উন্মেষ তার শিল্পরচনাকে সজীব রাখে।

বহুবিধ তথ্য আহরণের শক্তি ও কৌতূহল মধ্যযুগীয় শিল্পীদের জীবনে সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় না হলেও গৌণ। সাধারণভাবে বৈজ্ঞানিক-পূর্ব যুগের শিল্পীদের জীবনে বৈজ্ঞানিক তথ্য অপেক্ষা সৌন্দর্য তত্ত্বই তার অনুসন্ধানের বিষয় ছিল।

মোমের তাল নাড়াচাড়া করতে কেমন ক'রে বিশেষ রকমের জড় বস্তু থেকে একটি আকার বেরিয়ে এল সেই রহস্য অনুসন্ধান করতে গিয়ে ভাষাগত বৈশিষ্ট্য, ধ্যান-ধারণা, বুদ্ধি বিবেচনা ইত্যাদি প্রসঙ্গ আলোচনা করা গেল। তার সবটাই প্রায় শিল্পীর অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র ক'রে। কেবল মাত্র ধ্যান-ধারণা (Contemplation) ও বুদ্ধি-বিচার (Intellect) এই দুই শক্তি শিল্পের অন্তরে প্রবেশ করবার প্রধান অবলম্বন। অবশ্য ওপরের দুই শক্তি শিল্পীর অভিজ্ঞতারই অংশ। কিন্তু এই দুই অভিজ্ঞতা উপলব্ধির পথে যখন শিল্পের অন্তরের বস্তু (Content) হয়ে দর্শকের হৃদয় স্পর্শ করে তখনই ধ্যান-ধারণা বা বুদ্ধি-বিচারের চরম সার্থকতা।

শিল্পী যে বিষয় নির্বাচন করে তার বৈচিত্র্যের কোনো অন্ত নেই। যত

রকমের উদ্দীপনা তত রকমের বিষয়। অলস কৌতূহল অথবা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের পথে যে বিস্ময়, আনন্দ ও বিশেষ রকমের উদ্দীপনা সেগুলি আবেগ-গ্রাহ্য না হওয়া পর্যন্ত কোনো বিষয়ই শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে সার্থক হয় না। যে উদ্দীপনা শিল্পীর মনকে সচকিত করে সেই উদ্দীপনাই জীবনের সঞ্চিত ভাবাবেগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আর এক রকমের উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। শিল্পী মনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে এই ভাবাবেগ ব্যক্তিকেন্দ্রিক Association-এর সংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে আর এক স্তরে পৌছায় যে-স্তরে ব্যক্তিজীবনের সংস্কার থেকে অনেক পরিমাণে ভাবাবেগ-মুক্ত হয় এবং শিল্পী সাক্ষাৎ পায় বিশেষ রকমের ধারণার জগৎ। আধ্যাত্মিকতাবাদী দার্শনিকদের মতে এই ধারণার জগৎ অতিক্রম করতে পারলেই বিমূর্ত উপলব্ধির স্তরে পৌছান যায়। যদি এই বিশ্লেষণ ঠিক হয়ে থাকে তবে স্বীকার করতে হয় যে ব্যক্তিগত ভাবাবেগের বিমূর্ত ধারণাই শিল্পসৃষ্টির আবশ্যিক উপাদান।

একদিকে উদ্দীপনা-জাত অভিজ্ঞতা অপর দিকে বিমূর্ত উপলব্ধি উভয়ের উপযুক্ত ভাষার সংযোগে নির্মিত হয়েছে শিল্প-রূপ। পৃথিবীর সর্বত্র উভয় শক্তির সংযোগ-স্তরে যে আবেগময় শিল্পরূপ গঠিত হয়েছে ভোগোলিক পরিবেশ অর্থ নৈতিক অবস্থা-ব্যবস্থা ইত্যাদির সঙ্গে তার কোনো প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নেই। আবার Form নির্মাণের ক্ষেত্রে এই সবের প্রভাব অবশ্যই স্বীকার করতে হয়।

যে ক্ষেত্রে শিল্পী ইন্দ্রিয়-জাত উদ্দীপনাকেই প্রধান বলে দেখে সে ক্ষেত্রে শিল্পীর অনুকরণের পথ অবলম্বন করা ছাড়া উপায় নেই। অপর দিকে যে শিল্পী উদ্দীপনা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলে ভাবাবেগের শক্তিকে ধারণায় রূপান্তরিত করতে পারে না তার রচনা নানাবিধ তথ্যের দ্বারা চালিত হয়ে থাকে।

মোট কথা, শিল্প-রূপ একান্তভাবে অনুকরণ হতে পারে না অথবা শুষ্ক জ্ঞানেরও আকর নয়। কিন্তু উভয় গুণ সকল দেশের সকল শিল্পেই বর্তমান। তাই শিল্প-কলা শুষ্কও নয় ইন্দ্রিয়-জাত উদ্দীপনার অনুকরণও নয়। অর্থাৎ প্রত্যেক সার্থক শিল্প-রূপের মধ্যে শিল্পের আবেদন হল একটি বিশেষ রকমের শক্তি। এই চুম্বক শক্তিতে বাস্তব উদ্দীপনা এবং বিমূর্ত উপলব্ধি এক বিন্দুতে এসে মেলে। তবে এই সংযোগের কোনো একটি নির্দিষ্ট অথবা কাল-নিরপেক্ষ অবস্থান আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। কোনো শিল্পী কীভাবে এই সংযোগস্থলে পৌছাবেন তার কোনো শাস্ত্র নেই বলেই শিল্পের ভাষা কালে কালে বিবর্তিত হয়ে চলেছে। কখনো জটিল্ কখনো সরল, কোথাও বা বুদ্ধি-প্রধান (Intellectual) কোথাও বা ভাব-প্রধান (Emotional।

অনেকেই হয়ত লক্ষ করেছেন যে উপলব্ধ বিষয় যুক্তির পথে প্রমাণ করতে

গেলে বিষয়টি জটিল ও দুরূহ হয়ে ওঠে। সম্ভবত এই কারণেই ভারতীয় অলংকারশাস্ত্র এত জটিল। অথচ যে-সত্যটি অসাধারণ ধী-শক্তি সম্পন্ন অলংকার-বিদ্‌রা যুক্তিতর্কের পথে প্রমাণ করতে চেয়েছেন সেটি কাব্যে প্রকাশিত হয়েছে সহজে। সম্ভবত এই আলোচনা প্রসঙ্গেও অনেক অংশ কিছু জটিল হয়ে উঠেছে।

এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকাটির প্রয়োজন হল এই কারণে যে পরবর্তী অংশে যে বিষয় নিয়ে আমি আলোচনা করব সেটি আর একটু জটিল—সন্নিকর্ষ, টান (Tension) তথা ছন্দ। এই দুই শক্তির প্রভাবেই শিল্পের ভাষা, ভাব তথা অন্তর ও বাহিরের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয়।

বলা প্রয়োজন যে সাহিত্যাশ্রিত ছন্দ ও শিল্পাশ্রিত ছন্দের পার্থক্য আছে। শিল্পে ছন্দের গুণ প্রকাশ করতে গিয়েই শিল্পীর হাতে সৃষ্টি হয়েছে রেখা। এই রেখাই হল ছন্দের প্রতীক। আমার দৃঢ় বিশ্বাস গতির উপলব্ধি থেকেই চিত্র-কলার উদ্‌ভব। আকার দেখা গিয়েছে পরে। লাস্কো এবং আল্টামিরা এই দুই গুহাচিত্রের তুলনার পথে সহজেই বুঝতে পারা যাবে যে গতির সাহায্যে চিত্র রচিত হয়েছে সর্বপ্রথম। পরে প্রাধান্য পেয়েছে আকার তথা অ্যামিতি।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের মাটির পাত্র অথবা ছুঁড়ে মারবার জন্য পাথরের অস্ত্র, এগুলির সঙ্গে দৈহিক গতির সম্বন্ধ অতি-ঘনিষ্ঠ। চোখের সামনে থেকে একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি।

একজন কাঠের মিস্ত্রি যখন বিভিন্ন আকারের কাঠের টুকরো জুড়ে টেবিল তৈরি করে তখন কারিগরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গতি, নির্মিত টেবিলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাকে সক্রিয় ক'রে তোলে। ঘুরন্ত চাকের উপর মাটির তাল কুমোরের হাতের কারদায় গড়ে তোলে বিভিন্ন রকমের পাত্র। কাঠের মিস্ত্রি ও কুমোর উভয়ের কার্যপ্রণালী ও উপকরণ সম্পূর্ণ ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও একটি জায়গায় তারা অভিন্ন। কারণ উভয় ক্ষেত্রেই দৈহিক শক্তির প্রয়োগ লক্ষ করা যাচ্ছে। এই দৈহিক গতি পর্যবসিত হয়েই মাটি, পাত্র, টেবিল তৈরি হচ্ছে। এরই নাম সন্নিকর্ষ শক্তি। এটিকে ঠিক ছন্দ বলা চলে না। শক্তির প্রকাশ আর এক ভাবেও হতে পারে। তারও দৃষ্টান্ত এখানে দিলাম।

জলপূর্ণ পাত্রে যদি একটা কাঠের টুকরো ফেলা যায় তখন পাত্র, জল এবং কাটের টুকরো তিনে মিলে এক রকমের স্পন্দন জাগিয়ে তোলে। যে স্পন্দন বা টান (Tension) জলে, কাঠে বা জলপাত্রে পূর্বে ছিল না।

বিশ্ব-প্রকৃতিতে বৈচিত্র্যের অভাব নেই। কোনো জায়গায় কোনো একটি বস্তু স্থির হয়ে নেই। ছয় ঋতু, দিন-রাত্রি, কোনো ঘটনাই অকস্মাৎ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে না। সকালের সূর্যোদয়, দ্বিপ্রহরে সেই সূর্যের প্রচণ্ডাকার, তার দিকে তখন আর তাকানো যায় না। সন্ধ্যার আকাশে সূর্য আবার লাল

হয়ে দেখা দেয়, কিন্তু সকালের সূর্যের সঙ্গে তার হুবহু মিল নেই। এই বিবর্তনের অন্তরালে রয়েছে একটি নিরবচ্ছিন্ন গতি-শক্তি। এই গতিকে চিহ্নিত করার জন্য অনেকগুলি নাম দেওয়া হয়েছে। কেউ বলেন কাল-চক্র ; কেউ বলেন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের খেলা ; কেউ বলেন ছন্দ।

শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে এই গতি তথা ছন্দই একমাত্র অবলম্বন। নিঃসন্দেহে বলতে পারি মানুষের সৃষ্টির সার্থকতা ছন্দের পথেই আত্মপ্রকাশ করে। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সাদৃশ্য অস্বীকার করা যায় না। পার্থক্য কেবল ভাব-ভাবনা, আবেগ-উদ্দীপনার ক্ষেত্রে। আনন্দ, দুঃখ, বেদনা-বোধ এসবও হয়ত জীবজগতে বিদ্যমান, কিন্তু বৈচিত্র্য, গভীরতা, তীব্রতার দিক দিয়ে মানুষ প্রকৃতি থেকে স্বতন্ত্র।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ দ্রুত ধাবমান জীবজন্তুর সঙ্গে দৌড়ে শিকার করতে করতে একদিন অনুভব করেছিল নিজের ও ধাবমান জন্তুর মধ্যে একটি অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ তথা সন্নিকর্ষ শক্তি। সম্বন্ধের উপলব্ধি প্রকাশ পেল মানুষের অঙ্কিত চিত্রে, ছুঁড়ে মারার পাথরের হাতিয়ারে। দেখা দিল ছন্দ। এ হল আর এক রকমের শক্তির উপলব্ধি। এ বিষয়ে পূর্বেই দৃষ্টান্তের সাহায্যে ব্যাখ্যা করেছি।

পাখিকে মারতে উদ্যত নিশাদের দিকে তাকিয়ে কবি বাল্মীকির কাছে প্রথম ছন্দবদ্ধ ভাষার সৃষ্টি হয়েছিল। পৌরাণিক কাহিনী হলেও এই কাহিনীর থেকে মানুষের শিল্পসৃষ্টির আদি কারণ অনুমান করা যায়। যে শব্দগুলি বাল্মীকি মুনি ব্যবহার করেছিলেন সে শব্দ আজও অভিধানে পাওয়া যাবে। কিন্তু সেই শব্দগুলি পাঠ করলেই আমাদের মন ছন্দের গতিতে পৌঁছাবে না। গ্রীক থেকে শুরু ক'রে এই মুহূর্ত পর্যন্ত ইয়োরোপের শিল্প-পরম্পরাতে জ্যামিতির স্থান খুবই উর্ধ্বে। প্লেটোর কাল থেকে এই জ্যামিতিক আকারের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ আছে।

যদি আমরা সন্নিকর্ষ-শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করি তাহলে বলতে হয় জ্যামিতিক আকার কর্ষ-শক্তির সাহায্যেই আত্মপ্রকাশ করেছে। লাস্কো গুহাচিত্রে কর্ষ-শক্তির প্রকাশ আছে। অপর দিকে আল্টামিরার গুহা-চিত্রে আছে জ্যামিতিক আকারের প্রভাব। ক্রমে ইয়োরোপের শিল্পে এই জ্যামিতিক আকার বিমূর্ত গুণ রূপে স্বীকৃত হয়েছে। অপর দিকে সমগ্র এশিয়াতে সন্নিকর্ষ (Tension) ও ছন্দকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এই পার্থক্যটি স্মরণ রাখলে আমার পরবর্তী আলোচনা বুঝতে সহজ হবে।

যে বিশেষ রকমের শব্দবিন্যাসের সাহায্যে শব্দ তির্যক গতি পায় সেই বিন্যাসেরই অপর নাম সন্নিকর্ষ-শক্তি। শিল্পের জগতে এই সন্নিকর্ষ-শক্তিকে যত স্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায় তেমন সাহিত্যে যায় না। সাহিত্যের ছন্দ

অনুভব-গ্রাহ্য, প্রত্যক্ষ করবার উপায় নেই। এই কর্ষ-শক্তিকে প্রত্যক্ষ করি আমরা নরনারীর নৃত্যে।

। এখানে যদি কেউ প্রশ্ন তোলেন যে সন্নিকর্ষ-শক্তি ও ছন্দের গতি উভয়ের মধ্যে কে কার অধীন? জবাবে বলতে হয় কর্ষণই মৌল শক্তি। এই শক্তি ভাবাবেগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ছন্দে রূপান্তরিত হয়ে ছন্দের গতিতে বৈচিত্র্যময় হয়ে ওঠে। জগতের যাবতীয় বস্তুতে কর্ষ-শক্তি নিহিত রয়েছে। যদি কোনো বস্তুকে পটভূমি বা পৃষ্ঠভূমির থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখতে পাওয়া যেত তবে সে বস্তুর সন্নিকর্ষশক্তি অনুভবগ্রাহ্য হতো না। যেহেতু বস্তু মাত্রেই একটি নির্দিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে আছে, উভয়ের সম্বন্ধে লক্ষ করা যাচ্ছে কর্ষ-শক্তির বিশিষ্টতা। ছন্দ এই বিশিষ্ট সন্নিকর্ষ-শক্তিরই বৈচিত্র্যময় রূপ। আবেগের শক্তিতে ছন্দ শিল্পের জগতে আত্মপ্রকাশ করে এবং সন্নিকর্ষ-শক্তির অন্তরালে থেকে যায়। শক্তি যেখানে উপলব্ধির কথা বলে সেখানেই রস, যেখানে আকার পায় সেখানেই সৌন্দর্য, যেখানে গতি পায় সেখানেই ছন্দ।

এই নাম-রূপের জগৎ আমরা দেখছি আলোর সাহায্যে। সূর্যের আলো, চাঁদের আলো, প্রদীপের আলো আমাদের মনে নতুন নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি করছে। অন্ধকারে নাম-রূপের জগৎ মুছে যায়, থাকে কেবল মাত্র কতকগুলি আকার। যে আকারের নাম অনুমান করতে হয়, কিন্তু দেখা যায় না।

ফুল সাজানো ফুলদানির সকাল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে আলোর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রঙেরও বিবর্তন ঘটেছে। রাত্রির গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে ফুল সমেত ফুলদানি স্পর্শের সাহায্যে জানতে গিয়ে এক নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হই আমরা। জানতে পারি পাপড়ির মসৃণতা, নমনীয়তা, ফুলদানির রুক্ষতা। যদি দিনের আলোয় এই ফুল দেখা না থাকত তাহলে আমাদের মনে ভয়, বিস্ময়, বিরক্তির কারণ ঘটতে পারত।

অপরিচিত স্থানে চলতে গিয়ে অবস্থাটা আরও তীব্র হয়ে ওঠে। তখন কেবলই সংঘাত কঠিন, কর্কশ, মসৃণ বস্তুর সঙ্গে। সংক্ষেপে, অন্ধকারে বস্তু মাত্রেই বিচিত্র আকার নিয়ে আমাদের সমস্ত শরীরকে সচকিত ক'রে তোলে। মেদ, মাংস জড়িত শরীরের যতগুলি সন্ধি-স্থান আছে সকল সন্ধি-স্থান সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই স্পর্শের দ্বারা সচকিত শরীরের সন্ধি-স্থানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যে অভিজ্ঞতা আমরা অর্জন করি তারই নাম সন্নিকর্ষ-শক্তি। এবং সেই শক্তি প্রকাশ করতে গিয়ে আবিষ্কৃত হয়েছে রেখা।

তাবৎ এই শিল্প সৃষ্টির মধ্যে এই সন্নিকর্ষ-শক্তি যেমন প্রত্যক্ষ করা যায় সাহিত্যে তেমন প্রত্যক্ষ করা যায় না। সে ক্ষেত্রে এই শক্তি অনুভব-গ্রাহ্য। একথা পূর্বেই বলেছি। আলোর শক্তিতে যেটিকে আমরা দেখি স্পর্শের সাহায্যে

সেটিকে আমরা অন্তভাবে জানি। এই দেখা ও জানার সংযোগে শিল্প-রূপের সৃষ্টি। কর্ষণের অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করতে গিয়ে শিল্পের ভাষায় দেখা দিয়েছে রেখা। অপর দিকে আলোর উদ্দীপনাকে প্রকাশ করতে গিয়ে প্রবর্তিত হয়েছে বর্ণ-প্রয়োগ রীতি।

দৃশ্য ও স্পর্শ উভয়ে একত্রে মিলেমিশে রয়েছে। কেবল অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে পৃথক হয়ে দেখা দিয়েছে। শিল্পী এই খণ্ডিত অভিজ্ঞতাকে উপলব্ধির পথে নতুন ক'রে প্রত্যক্ষ করেন। শিল্পী এইভাবে যেটি উপলব্ধি করেন সেটি শুদ্ধ আলো-ছায়ার উদ্দীপনাও নয়, নাম-হীন আকারের অভিজ্ঞতাও নয়। উভয়বিধ সৃষ্টি এই মানুষ-প্রতিমা বস্তুর অনুকরণও নয়, বস্তুর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নও নয়।

শিল্প-রূপের এই বিশিষ্ট গুণ আছে বলেই সার্থক শিল্প-রূপকে নিছক অনুকরণও বলা চলে না, শুদ্ধ আকারও বলা চলে না। এখানে আর একটি কথার উল্লেখ করতে হয়। রেখা-প্রধান সন্নিকর্ষ-শক্তি সম্পন্ন শিল্প যতটা বাস্তব থেকে আমাদের দূরে নিয়ে যায় (Abstract) আলোছায়া-মণ্ডিত দৃশ্য-জাত উদ্দীপনার থেকে সৃষ্ট শিল্প-রূপ বাস্তবের সীমা তেমন অনায়াসে লঙ্ঘন করতে পারে না। শিল্পের বিমূর্ত গুণ প্রকাশিত হয়েছে ছন্দ ও রেখা-প্রধান ভাষার সাহায্যে। অপর দিকে শিল্পের বহির্মুখী গতি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে আলোছায়া-নির্মিত ভাষার সাহায্যে।

কথার সাহায্যে বিষয়টি যেভাবে পৃথক করা হল শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে এই পার্থক্যটি তেমন স্পষ্টভাবে ধরা না-ও যেতে পারে। বৈজ্ঞানিক যুগের প্রভাবে অন্তর্মুখী ও বস্তুমুখীর মধ্যে পার্থক্য তীব্র হয়ে উঠেছে। এই পার্থক্যের কার্য-কারণ সম্বন্ধে আলোচনা পরে করা যাবে। বৈজ্ঞানিক যুগের প্রাক্‌কাল পর্যন্ত শিল্পের আধার ও অধেয় সম্বন্ধে যে ধারণা শিল্পী-সমাজ পোষণ করতেন সেই সম্বন্ধেই এই পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে আরও কিছু বলবার আছে।

যে বিষয় নিয়ে ভাবছি বা লিখছি সে বিষয়টিকে আমাদের অতি সুপরিচিত একটি রূপকথার সাহায্যে স্পষ্ট ক'রে তোলবার চেষ্টা করছি। রাজপুত্রের শৈশবে একদিন ঘুমন্ত পুরীর রাজকন্যার কথা মনে পড়ল। তারপর রাজপুত্র সেই রাজকন্যার কথা ভাবতে-ভাবতে বেরিয়ে পড়লেন ঘোড়ায় চড়ে ঘুমন্ত পুরীর রাজকন্যার অনুসন্ধানে। ক্রমে পাহাড় পর্বত অরণ্য ভেদ ক'রে একদিন তিনি হাজির হলেন ঘুমন্ত পুরীর রাজকন্যার কাছে। তারপর সোনার কাঠি, রুপোর কাঠির স্পর্শে রাজকন্যাকে জাগিয়ে তুললেন।

রূপকথার রাজপুত্রের মতোই শিল্পী রসের অনুসন্ধানে যাত্রা করে এবং বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম ক'রে শেষপর্যন্ত হ্লাদিনীর সন্ধান পায়। যে সৌন্দর্য মনের গভীরে ছিল ঘুমন্ত তাকেই সুখ-দুঃখের স্পর্শে জাগিয়ে তোলে শিল্পী। কেবল

পার্থক্য এই যে রাজপুত্র চলেছিল পাহাড় পর্বত অতিক্রম ক'রে, আর শিল্পী চলে জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে। এই জন্যই শিল্পীর সাধনার সঙ্গে সমাজজীবনের সম্বন্ধ উল্লেখ করা প্রয়োজন।

অনুলিখন
শ্রাবণী চৌধুরী

শিল্পী শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় শিল্প বিষয়ে একটি দীর্ঘ লেখার প্রস্তাবনা করেছেন বর্তমান অংশটি দিয়ে। পরবর্তী সংখ্যায় অপর অংশ প্রকাশিত হবে বলে আমরা আশা করছি। স. এ.

'কলকাতার টুকিটাকি' ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

পাঠকবর্গের প্রতি নিবেদন

এক্ষণের গত শারদীয় সংখ্যায় (১৩৮২) প্রকাশিত আমার 'কলকাতার টুকিটাকি' লেখাটির মধ্যে তিনরকম ত্রুটি আমার নজরে পড়েছে। প্রথম, তথ্যের ভুল আছে; দ্বিতীয়, ছাপার ভুল আছে; তৃতীয়, কতকগুলি বক্তব্য বাদ পড়ে গেছে।

১. তথ্যের ভুলের মধ্যে প্রথমটি ১৯৬ পৃষ্ঠার প্রথম লাইনে: 'এই বাড়িতেই ১৯০৬ সালে প্রধানত সরলা দেবীর উদ্যোগে প্রথম "শিবাজী উৎসব" হয়।' —এই বাক্য থেকে 'প্রধানত সরলা দেবীর উদ্যোগে প্রথম' এই বাক্যাংশ বাদ যাবে। ঐটি কলকাতার প্রথম 'শিবাজী উৎসব' ছিল না, আর সরলা দেবীর উদ্যোগেও হয় নি।

২. ১৯২ পৃষ্ঠার প্রথম ও দ্বিতীয় লাইনে: 'থ্যাকারের ডিরেক্টারি প্রথম বেরোয় ১৮৬৫ সালে।' থ্যাকারের ডিরেক্টারি প্রথম বেরোয় ১৮৬৪ সালে, ১৮৬৫ সালে নয়।

৩. ১৯৯ পৃষ্ঠার ১১ লাইনে: 'আর্ট স্কুল এখানে ১৮৬৬ সালের জুন মাস পর্যন্ত থাকে।' ১৮৬৬ সাল নয়, ১৮৬৪ সাল পর্যন্ত থাকে।

৪. আমি বলেছি ফিরিঙ্গি কমল বোসের বাড়ি আপার চিৎপুর রোডে বর্তমান শ্রী ডিডু মাহেশ্বরী পঞ্চায়েৎ বিদ্যালয়। এটি ভুল। কী ক'রে ভুল হল তা প্রথমে বলে নেওয়া দরকার।

ফিরিঙ্গি কমল বোসের বাড়ি একটি ঐতিহাসিক বাড়ি। এই বাড়ি বার করবার জন্য আমি বহুদিন ধরে চেষ্টা ক'রে নিষ্ফল হই। শেষে একদিন সাংবাদিক ৺ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের কাছে যাই। শুনেছিলাম তিনি প্রাচীন কলকাতার অনেককিছু জানেন ও খবর রাখেন। তিনি বললেন, 'আমি জানি না, তবে আমি এমন একটি লোকের কাছে আপনাকে পাঠাতে পারি যিনি জানেন।' এই বলে তিনি আমাকে ৬৭ নম্বর পাথুরেঘাটা স্ট্রীটে রাসবিহারী মল্লিকের কাছে পাঠিয়ে দেন। দুঃখের বিষয় রাসবিহারীবাবু অল্পদিন হল পরলোকে গমন করেছেন। তিনি এককালে প্রাচীন কলকাতা নিয়ে কিছু গবেষণা করেছিলেন।

হিন্দু কলেজের ছাত্র রাজনারায়ণ বসুর প্রস্তাব অনুসারে প্রথম কলেজ

সম্মিলন হয় ১৮৭৫ সালের ১ জানুয়ারি ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের 'মরকত নিকুঞ্জ' (Emerald Bower) নামক বিখ্যাত বাগানবাড়িতে। এই সম্মিলনে রাজনারায়ণ বসু হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিবৃত্ত বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তাতে তিনি বলেন, 'প্রথম গরানহাটায় গোরাচাঁদ বসাখের বাটীতে (যেখানে একণে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী আছে সেইখানে) হিন্দু স্কুল স্থাপিত হয়। তাহার পর ফিরিঙ্গি কমল বসুর বাটীতে (একণে যাহা বাবু হরনাথ মল্লিকের বাটী ও যেখানে সর্ব্বপ্রথম ব্রাহ্ম সমাজ কিছু-দিন হইয়াছিল) লইয়া যাওয়া হয়।' আমি যখন রাসবিহারীবাবুকে ফিরিঙ্গি কমল বোসের বাড়ির কথা জিজ্ঞাসা করি তখন তিনি 'জানি না' বলেন। যখন বলি সে বাড়ি পরে ৺ হরনাথ মল্লিক কিনেছিলেন তখন বলেন, 'হরনাথ মল্লিক তো আমাদের আত্মীয়। আমার যতদূর জানা আছে ডিহু মাহেশ্বরী বিদ্যালয় ভবন তাঁর বাড়ি ছিল।' রাসবিহারীবাবু হরনাথ মল্লিককে তাঁর আত্মীয় এই কারণে বলেছিলেন যে গৌরচরণ মল্লিকের পৌত্র সিঁদুরিয়াপটির হরনাথ মল্লিক, এবং গৌরচরণের ছোট ভাই মিমাইচরণ মল্লিকের পৌত্র পাথুরেঘাটার ৺ যদুলাল মল্লিক ও যদুলাল মল্লিকের জ্যেষ্ঠ পৌত্র রাসবিহারী মল্লিক। সুতরাং রাসবিহারীবাবুর কথায় আমার বিশ্বাস হল।

তারপর পেলাম বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ভূতপূর্ব সম্পাদক, অ্যাটর্নি খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৭৩-১৯৪৩) 'রবীন্দ্রকথা'। এটি ১৯৩১ সালে রবীন্দ্রনাথের ৭০ বৎসর জন্মদিনে প্রবন্ধ আকারে পাঠ করা হয় ও চট্টোপাধ্যায় মশাইয়ের মৃত্যুর পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। খগেন্দ্রনাথ ঠাকুর-পরিবারের নিকট-আত্মীয়। তিনি দ্বারকানাথ ঠাকুরের ভগ্নী রাসবিলাসী দেবীর জ্যেষ্ঠ পুত্র মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের (যাঁর নামে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির দক্ষিণে একটি গলি আছে) প্রপৌত্র। তিনি সমস্ত ঠাকুর-পরিবারের বংশাবলি সংকলন করেছেন। [তাঁর পুত্র ৺ রমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৯০০-৪৪) ৺ শিশিরকুমার ভাদুড়ীর মঞ্চাধ্যক্ষ ছিলেন।] সুতরাং রামমোহনের ব্রহ্মসভা প্রথমে কোন বাড়িতে ছিল খগেন্দ্রনাথের খুব ভাল রকমেই জানবার কথা। তিনি লিখেছেন: 'পর্তুগীজ বণিকদিগের অধীনে কর্ম্ম করায় এই বাটীর স্বত্বাধিকারী ফিরিঙ্গি কমল বসু বলিয়া আখ্যাত হন। ...আপার চিৎপুর রোডে মদনমোহন চ্যাটার্জীর ষ্ট্রীট আসিয়া মিশিয়াছে, তাহার পশ্চিম দিকের রাস্তার অপর পার্শ্বে এই বাটী অবস্থিত। পরবর্তী কালে ইহা হরনাথ মল্লিকের ও লোকনাথ মল্লিকের (হরনাথ মল্লিকের দাদা —রা. মি) বাটী বলিয়া পরিচিত হয়। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মাঘ হইতে এই বাটীর অনতিদূরে রাস্তার পূর্ব্ব পার্শ্বে অবস্থিত রামমোহন রায়ের নামে ক্রীত দ্বিতল বাটীতে স্থানান্তরিত হইয়া সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। পরবর্ত্তী কালে ইহা আদি ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনা মন্দির বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।'

আপার চিৎপুর রোড ও মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীটের সংযোগস্থলের ঠিক বিপরীত (পশ্চিম) দিকেই ডিডু মাহেশ্বরী পঞ্চায়েৎ বিদ্যালয়। সুতরাং ৺ রাসবিহারী মল্লিক ও ৺ খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দুই ওয়াকিবহাল ব্যক্তি যখন একই বাড়িকে ফিরিঙ্গি কমল বোসের বাড়ি বলে নির্দেশ করলেন তখন আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না যে বর্তমান ডিডু মাহেশ্বরী বিদ্যালয় ভবনই ফিরিঙ্গি কমল বোসের বাড়ি।

কিন্তু পরে রুস্তাক সাহেবের ১৮৫৭ সালের *The New Calcutta Directory*-র পাতা উল্টোতে উল্টোতে হঠাৎ দেখলাম আপার চিৎপুর রোডের পূর্বদিকে ৩৭ থেকে ৩৮ নম্বর বাড়ি ছিল হরনাথ মল্লিকের বাড়ি। ইংরেজিতে লেখা—'Haranath Mallick, merchant's banian।' যে বাড়ির গায়ে পাঁচ-পাঁচটা নম্বর থাকে সে বাড়ি নিশ্চয়ই বড় বাড়ি ছিল। এই বাড়ির সামান্য উত্তরে ১৩ নম্বর বাড়িতে ছিল ব্রহ্মসভা। ইংরেজিতে লেখা আছে—'Brahma Sabha, a place of worship'। বর্তমানে আদি ব্রাহ্ম-সমাজ বাড়ির নম্বর হচ্ছে ৫৫ ও কমল বোসের বাড়ির জায়গায় এখন যে দোতলা বাড়ি রয়েছে তার নাম হচ্ছে 'মাতৃমঙ্গল প্রতিষ্ঠান'—পুরানো নম্বর ৫১ আপার চিৎপুর রোড, বর্তমান নম্বর ২২৮ রবীন্দ্র সরণি। ১৯৩৩ সালে রামমোহন শতবার্ষিকী গ্রন্থে ৪৮ নম্বর আপার চিৎপুর রোড বলে লেখা হয়েছে। অন্য মতে ৪৯ নম্বর আপার চিৎপুর রোড। তাই আমি লিখেছিলাম: 'এ বিষয়ে অন্য মতও আছে।' এখন দেখছি অন্য মতই ঠিক। দুই বিচক্ষণ ব্যক্তির মত যা আমি সত্য বলে মেনে নিয়েছিলাম তা ঠিক নয়।

৫. ১৯৯ পৃষ্ঠার ৬-৮ লাইনে আমি লিখেছি: ১৮৫৪ সালের ১৬ আগস্ট গরানহাটায় 'দি স্কুল ফর ইণ্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট' স্থাপিত হয়। গরানহাটায় স্থান সংকুলান না হওয়ায় ঐ স্কুল হীরালাল শীলের কাছে আবেদন করে। হীরালাল শীল বিনা ভাড়ায় ঐ স্কুলকে নিজের বাগানবাড়িটি ছেড়ে দেন। ১৮৫৪ সালের নভেম্বর মাসের শেষদিকে আর্ট স্কুল এই বাগানবাড়িতে উঠে আসে।' এখানে বাগানবাড়ি বলতে নারসিংচন্দ্রের বাগানবাড়িকে বোঝাচ্ছে। কিন্তু এটা ভুল। ১৮৫৪ সালের নভেম্বর মাসে আর্ট স্কুল এই বাগানবাড়িতে উঠে আসে নি। এসেছিল এর খুব কাছেই আর এক জায়গায়। সেটিও মতিলাল শীলের ও তাঁর মৃত্যুর পর হীরালাল শীলের সম্পত্তি ছিল। ঐ রুস্তাক সাহেবের ১৮৫৭ সালের *TheNew Calcutta Directory*-তে দেখলাম ১৩ নং কলেজ স্ট্রীটে (রাস্তার পশ্চিমদিকে, কলুটোলা স্ট্রীটের ওপর, মাধব বাবুর বাজারের দক্ষিণেই) মতিলাল শীলের ব্যারাকবাড়ি ছিল এবং সেই বাড়িতে ছিল দি স্কুল অফ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট। ইংরেজিতে লেখা আছে—Moteelal Seal's barracks. The School of Industrial Art। এই ব্যারাকবাড়ি এখন নেই। তার জায়গায়

মেডিকেল কলেজের ভামাচরণ লাহা চোখের হাসপাতাল (Eye Infirmary) ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে তৈরি হয়েছে। এখন আর চোখের হাসপাতাল এখানে নেই। বাড়িটি আছে এবং অন্য কাজে ব্যবহার হচ্ছে।

ছাপার ভুল অনেক আছে। তবে তার মধ্যে যেগুলি প্রধান সেগুলি মাত্র নিচে উল্লেখ করলাম।

১. ১৯৫ পৃষ্ঠার শেষ লাইনে: 'এই মেলটি বছর কয়েক চলেছিল।' হবে, 'বছর খানেক চলেছিল'।

২. ২০২ পৃষ্ঠার ৮ লাইনে: 'মরহুম শেখ নবাব হোসেন (অপুত্রক) ওয়াকফ্-করা সম্পত্তি।' 'নবাব হোসেন' হবে 'নবাব হোসেনের'।

৩. ঐ পৃষ্ঠার ২২ লাইনে: 'কনডেণ্ট রোড, ইটালি'; 'কনডেণ্ট' হবে 'কনভেণ্ট'।

৪. ঐ পৃষ্ঠার ৩০ লাইনে: 'পৌর অফিসের ও কারখানার গা ঘেঁষে··· 'পৌর অফিসের' জায়গায় হবে 'স্টোর অফিসের'।

৫. ২০৫ পৃষ্ঠার ১৩ লাইনে: 'সাঁ সুচি থিয়েটার'। আমি ইচ্ছে করেই ইংরেজি উচ্চারণ অনুসারে 'সাঁ সুচি' লিখেছি। তাতে একটা সুবিধা এই যে কথাটার মানে অনেকটা পরিষ্কার হয়। ইংরেজি 'সুচি' ও সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দি 'শোচ'-এর একই অর্থ। বাংলা 'শোচনীয়', 'অনুশোচনার' মানের সঙ্গে মিল আছে। কিন্তু শব্দটা ইংরেজি নয়, ফরাসি। যাঁরা বিশুদ্ধতাবাদী তাঁরা আমাকে ক্ষমা করবেন ও 'সাঁ সুসি' পড়বেন।

এবার যা-যা ছাড় পড়ে গেছে তাদের কতকগুলির উল্লেখ করছি।

১. দু-একটি শব্দের ছাড়—যেমন, ১৯৬ পৃষ্ঠার ২০ লাইনের গোড়ায়: 'বাগানটির জায়গায় একটা প্রকাণ্ড নোংরা মাঠ পড়ে আছে'। 'বাগানটি' শব্দের আগে 'এখন' শব্দটি বসবে।

২. ২০২ পৃষ্ঠার ২ লাইনে: 'মুন্সিবাজারের মালিক মুন্সি আমির এই মহিলাকে বিয়ে করেন···'। 'মুন্সিবাজারের' আগে 'পরে' শব্দটি বসবে।

৩. ১৯৬ পৃষ্ঠার ১ম লাইনে: 'এই বাড়িতেই ১৯০৬ সালে···' হবে '১৯০৬ সালের জুন মাসের গোড়ায়'।

শব্দগত ছাড় ছাড়া কতকগুলি বিষয়বস্তুর ছাড় আছে। সেগুলি আপনারা যথাস্থানে বসিয়ে নেবেন।

১. আমার লেখার প্রথম পৃষ্ঠার শিরোনাম—'শালিমার বাগ ও শালিমার গার্ডেন'। 'শালিমার গার্ডেন'-কে অনেক জায়গায় 'শালিমার হাউস' বলেও

উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ ওটা শুধু গার্ডেনও ছিল না, আবার হাউসও ছিল না, ছিল গার্ডেন হাউস—বাগানবাড়ি।

২. প্রবন্ধের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় 'শালিমার গার্ডেন' প্রসঙ্গের শেষে এই বাক্যটি যোগ হবে : 'আলি মর্দান খাঁর সমাধি লাহোরে আছে।'

৩ ১৯৫ পৃষ্ঠার ২১ লাইনে : 'এ-বাড়ির মালিক ছিলেন জনৈক রাজকুমার দাস।' যে সময়ের কথা বলা হয়েছে তখন, অর্থাৎ ১৯০৬ সালে রাজকুমার দাস রাজমন্দিরের মালিক ছিলেন না, ছিলেন মহেন্দ্রনাথ দাস—অ্যাটর্নি ৺ ভূপেন্দ্রনাথ বসু মশাইয়ের শ্বশুর।

৪. ১৯৬ পৃষ্ঠায় 'পাস্তীর মাঠ'-এর শেষে যোগ হবে : 'এখন পাস্তীর মাঠের উপর বিদ্যাসাগর কলেজ হোস্টেল হয়েছে।'

৫. ১৯৬ পৃষ্ঠার ১৩ লাইনে শিরোনাম 'কাশীপুরের কেলসল হাউস'। কেলসল হাউসকে কেলসল গার্ডেনও বলা হতো।

৬. ১৯৭ পৃষ্ঠায় ৫ লাইনের পরে : 'কেলসল হাউস' প্রসঙ্গের শেষে যোগ হবে—'কেলসল হাউস ছিল একটি আট কোণা বাড়ি। এই বাড়িটি নাকি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নিজের দরকারে তৈরি করিয়েছিলেন।'

৭. ১৯৯ পৃষ্ঠায় ৫ লাইনের পরে এই অনুচ্ছেদটি যোগ হবে :

'পাদ্রি আলেকজাণ্ডার ডাফ ১৮৩০ সালে কলকাতায় আসা অবধি নার্সিংচন্দ্রের এই বাগানের আর একটি বাড়িতে বাস করেছেন ১৮৩৮ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত। সেই মাসে হেঁদোর পূর্বদিকে তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্কুল—জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন-এর নিজস্ব পাকা বাড়ি তৈরি শেষ হয়ে গেলে তাঁর স্কুলটি নিয়ে তিনি সেখানে উঠে যান।'

৮. ২০৪ পৃষ্ঠার শেষে এই অনুচ্ছেদটি যোগ হবে :

'Missionaries of Charity নামক মহিলা সেবা সংঘের প্রতিষ্ঠাত্রী মাদার টেরেসা ১৯২৮ সালে অ্যালবানিয়া থেকে কলকাতায় এসে এই ইটালির লোরেটো কনভেন্টে যোগ দেন ও এখানকার মেয়েদের হাইস্কুলের অধ্যক্ষা হয়ে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত ২০ বছর কাজ করেন। পাশেই মতি ঝিলের বিরাট বস্তি। বস্তিবাসীদের দুঃখ দুর্দশা দেখে তাঁর হৃদয় বিগলিত হয়। তিনি ১৯৪৮ সালে মহামান্য পোপের কাছে Missionaries of Charity নামক সেবা সংঘ প্রতিষ্ঠা করবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। পোপ অনুমতি দিলে তিনি ঐ সালেই Missionaries of Charity প্রতিষ্ঠা করেন।'

৯. ২০১ পৃষ্ঠায় ২৫ লাইনের পরে যোগ হবে :

'বরিশা থেকে যেসব ব্রাহ্মণ তাঁদের দলপতি সন্তোষ রায়ের সঙ্গে কালীপ্রসাদ দত্তের পিতৃশ্রাদ্ধ সমাধা করবার জন্য এসেছিলেন তাঁরা সকলেই দক্ষিণা নিতে অস্বীকার করায় কালীপ্রসাদ দত্ত কোনো সৎকার্যে ব্যয় করবার জন্য কুড়ি

হাজার টাকা সন্তোষ রায়ের (১৭১০-৯৯) হাতে দেন। সন্তোষ রায় সেই টাকা দিয়ে কালীঘাটে বর্তমান কালীমন্দির তৈরি করতে আরম্ভ ক'রে যান। তাঁর পুত্র রামলাল রায় সেই মন্দির নির্মাণ সম্পূর্ণ করেন ১৮০৯ খ্রীস্টাব্দে।'

১০. ২০৩ পৃষ্ঠায় ২০ থেকে ২২ লাইনের পরে, অর্থাৎ 'এই কারণে কর্তাদের আর ধর্মতলা স্ট্রীটের মোড় থেকে সাউথ শেয়ালদা রোড পর্যন্ত অংশটা তাড়াতাড়ি বোজাবার চাড় হয় নি।'—এর পরে, যোগ হবে :

'খালের ঐ অংশটা না-বোজানো অবস্থায় ছিল ১৮৭৯—৬০ সাল পর্যন্ত। পরের বছর অর্থাৎ ১৮৬০-৬১ সালে খালটা তাড়াতাড়ি বুজোতে হল দুই কারণে —প্রথম, বেলেঘাটা থেকে পোর্ট ক্যানিং পর্যন্ত রেল লাইন পাতার জন্য। এই লাইনটি ছিল কলকাতা থেকে দক্ষিণে যাবার সর্বপ্রথম রেল লাইন, নাম ছিল Calcutta and South-Eastern Railway। তখন শেয়ালদা হয় নি, একমাত্র স্টেশন ছিল বেলেঘাটা স্টেশন। দ্বিতীয় কারণ, কলকাতার মাটির নিচে পাকা ড্রেন তৈরির কাজ আরম্ভ হওয়া।'

১১. কালীপ্রসাদ দত্ত, চূড়ামণি দত্ত ও রামদুলাল সরকার সম্বন্ধে কিছু নতুন তথ্য এখানে দিলাম।

ক) ১৮৩৪ সালের ৫ এপ্রিল তারিখের 'সমাচার দর্পণ'-এ এই মর্মে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল : কিছুকাল হল কোনো প্রধান বংশোদ্ভব পরম মান্য জনৈক ব্যক্তি স্বেচ্ছায় স্বকচ্ছেছদন পূর্বক মুসলমানধর্মাবলম্বন ক'রে আনারো নামক মুসলমান রমণীকে বিবাহ করেন। মুসলমানগণ তাঁর ইজ্জতালি খাঁ নাম রাখেন। তিনি ঐ যবনী স্ত্রীর সঙ্গে রোজা, নামাজ ইত্যাদি পালনপূর্বক বহুকাল সংসারধর্ম করেন। অতঃপর ঐ খাঁ সাহেবের কোনো পৈতৃক প্রাচীন ভৃত্য নূতন ধনী হয়ে তাঁর সঙ্গে পানাহার ক'রে পুনরায় খাঁ সাহেবকে হিন্দুসমাজে গ্রহণ করেন।

খ) রাজা নবকৃষ্ণের সহিত চূড়ামণি দত্তের (কালীপ্রসাদ দত্তের পিতা—রা. মি ও কুমারটুলির অভয়চরণ মিত্রের (কালা-জমিদার গোবিন্দরাম মিত্রের প্রপৌত্র —রা. মি) মোকদ্দমা হয়, প্রিভি কাউন্সিল পর্যন্ত গড়ায়। শেষে চূড়ামণি দত্তের জিত হয়। এটিও মহারাজা নবকৃষ্ণের কালীপ্রসাদ দত্তের উপর খড়্গহস্ত হবার একটি অতিরিক্ত কারণ।

গ) ৫ ১. ১৮৩৩ তারিখের সমাচার চন্দ্রিকা'-য় এই মর্মে সংবাদ প্রকাশিত হয় : পূর্বে কলকাতায় দুটি সামাজিক দল ছিল—৺মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুরের এক দল এবং ৺ মদনমোহন দত্তের এক দল। রামদুলাল সরকার মদনমোহন দত্তের দলভুক্ত ছিলেন। রামদুলাল সরকারের মদনমোহন দত্তের দলে থাকাই স্বাভাবিক ছিল, কেন না তাঁর সমস্ত বৈষয়িক উন্নতির মূলে ছিলেন মদনমোহন দত্ত। সেই জন্যই কালীপ্রসাদ দত্ত পিতৃশ্রাদ্ধের ব্যাপারে রামদুলাল সরকারের সাহায্যপ্রার্থী হয়েছিলেন। এ থেকে আরো প্রমাণ হয় যে কালীপ্রসাদ দত্ত

হাটখোলার দত্ত ছিলেন না। যদি তিনি হাটখোলার দত্ত হতেন তাহলে তাঁকে তৃতীয় ব্যক্তির শরণাপন্ন হতে হতো না।

আমার নিজের লেখা সম্বন্ধে বক্তব্য এইখানেই শেষ হল।

'ভারত-শ্রমজীবী' প্রসঙ্গে

এখন এক্ষণের ঐ সংখ্যায় 'ভারত-শ্রমজীবী' পত্রিকার পুনর্মুদ্রণ প্রসঙ্গে শ্রী কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়ের লেখায় দু-একটি সামান্য ভুল আমার চোখে পড়েছে, সেগুলি দেখিয়ে দেওয়া দরকার মনে করি।

প্রথম ভুল, ২২ পৃষ্ঠার ২ লাইনে শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম-তারিখ লেখক দিয়েছেন, ২ এপ্রিল ১৮১০। জন্ম-তারিখ ২ এপ্রিলের জায়গায় হবে ২ ফেব্রুয়ারি। শশিপদবাবুর সমাধি-ফলকে ও 'নবযুগের সাধনা'য় ২ ফেব্রুয়ারি লেখা আছে।

দ্বিতীয় ভুল, ২৩ পৃষ্ঠার প্রথম পাদটীকায় Sitanatu Tactvabhusan-এর জায়গায় Sivanath Tactvabhusan ছাপা হয়েছে। এটা ছাপার ভুল।

তৃতীয় ভুলটি সত্যিই গুরুতর। ২২ পৃষ্ঠার ১৫ লাইনে তিনি লিখেছেন: 'সেই সময়ে বরানগরের কামারপাড়া, আড়িয়াদহ ও কুঠীঘাটাতে বোর্নিও কোম্পানির চটকল ছিল।' অনবধানতাবশত এই ভুলটি হয়েছে। এক জায়গায় একটি চটকল হওয়াই কি সহজ ব্যাপার! কাছাকাছি তিনটি জায়গায় তিনটি চটকল থাকা এক অভাবনীয় ঘটনা। যে কুলদাপ্রসাদ মল্লিকের 'নবযুগের সাধনা' নামক পুস্তক থেকে তিনি এই তথ্য সংগ্রহ করেছেন সেখানে আমার যতদূর মনে পড়ে একথা নেই। এই লেখা আছে যে ঐ তিনটি জায়গায় বরানগরের বোর্নিও কোম্পানির শ্রমিকদের সংঘ বা কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। শ্রমিকদের আড্ডা বা দলকে কানাইবাবু চটকল ধরে নিয়েছেন।

'দেবগণের কলকাতায় আগমন'

এবারে এক্ষণের ঐ একই সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রী বিনয় ঘোষের 'দেবগণের কলকাতায় আগমন'-শীর্ষক কলকাতার মন্দির, মসজিদ ও গির্জা সম্বন্ধে দীর্ঘ প্রবন্ধের কিছু বিস্তৃত সমালোচনা করতে বাধ্য হলাম।

শ্রীবিনয় ঘোষের অন্যান্য লেখার মতো এই প্রবন্ধটিও আমি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে পড়লাম এই আশা নিয়ে যে এতে আমার অজানা কিছু নতুন তথ্য হয়ত পাব। কিন্তু পড়ে নিরাশ হলাম। প্রবন্ধটির দুটি অংশ—একটি শাঁস ও একটি ছোবড়া। শাঁস বা সার অংশে তাঁর নিজের একটা কথাও পেলাম না।

হিন্দুদের মন্দির, মুসলমানদের মসজিদ ও খ্রীস্টানদের গির্জা সম্বন্ধে যা লিখেছেন তা শ্রীপঞ্চানন রায়ের বই 'বাংলার মন্দির', David McCutchion-এর 'The Temples of Calcutta' নামক প্রবন্ধ, Dr M. K. A. Siddiqui-র বই *Muslims of Calcutta* ও ইংরেজদের দু-একটি মামুলি লেখা ও Guide-Book-এর প্রতিধ্বনি মাত্র, অবিকল মাছি-মারা কেরানির মতো তিনি তাঁদের নকল করেছেন। অথচ তিনি কলকাতা সম্বন্ধে একজন প্রামাণিক পণ্ডিত (authority), অনেকদিন থেকে কলকাতা নিয়ে গবেষণা ক'রে আসছেন! এই দীর্ঘকালব্যাপী গবেষণার কি এই ফল? গ্রন্থনির্দেশে তিনি লিখেছেন: 'কলকাতা শহর পরিক্রমা এবং সরেজমিনে অনুসন্ধানলব্ধ তথ্যই এই প্রবন্ধের প্রধান অবলম্বন।' কিন্তু প্রবন্ধের মধ্যে তার তো বিশেষ পরিচয় পাওয়া গেল না। বরং প্রবন্ধ পড়ে এই কথাই মনে হল, ঘরে বসে পরের বই নকল করেই তিনি আপন কর্তব্য শেষ করেছেন। এ লেখার মূল্যই বা কী, আর সার্থকতাই বা কী বোঝা গেল না। মন্দিরের আকার, গঠন ও পদ্ধতি সম্বন্ধে অনেক কথাই আছে (এখানেও McCutchion-এর প্রতিধ্বনি), কিন্তু যাঁরা প্রতিষ্ঠাতা তাঁদের সম্বন্ধে একটা কথাও নেই। ক'টা দেওবন্দী ও ক'টা ব্রেলভী মসজিদ আছে কলকাতায় তা জেনে আমাদের কী লাভ? যে ক'টি গির্জার নাম দেওয়া হয়েছে তাদের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, কোনটা কোন সম্প্রদায়ের, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কতগুলি গির্জা ইত্যাদি খবর যদি দিতেন ঢের বেশি উপকার হতো। ধর্মতলায় Union Chapel-এর নাম করা হয়েছে, কিন্তু বলা হয় নি এই Chapel কোন সম্প্রদায়ের বা কেন এর Union Chapel নাম। এই তো গেল শাঁস অংশের কথা।

কিন্তু প্রবন্ধের অন্য অংশে অর্থাৎ ছোবড়া অংশে বিনয়বাবু পুরো নিজের মৌলিকতা বা স্বকীয়তা দেখিয়েছেন। সে অংশ হল প্রবন্ধের ভূমিকা ও পরিশিষ্ট। অর্থাৎ ল্যাজা-মুড়ো। লেখক ভূমিকার শেষে বলেছেন: 'দেবগণের কলকাতায় আগমনের এই বৃত্তান্ত নিতান্তই নীরস যেহেতু ঐতিহাসিক তথ্যাশ্রিত বিবরণমাত্র। লেখকের অনুরোধ পাঠকবৃন্দ এই বিবরণের মধ্যে কোনো সাহিত্যিক আস্বাদ আশা করবেন না।' (পৃষ্ঠা ১৪৯)। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে বৈজ্ঞানিক বা ঐতিহাসিকের মতো যুক্তিনিষ্ঠ, তথ্যনির্ভর প্রবন্ধ রচনা বিনয়বাবুর উদ্দেশ্য নয়, সাহিত্যিকের মতো রসরচনা বা রম্যরচনা করাই উদ্দেশ্য। শাঁস অংশে যার একান্ত অভাব ছিল ছোবড়া অংশে অতিরিক্ত পরিমাণে তা পূরণ করবার চেষ্টা করেছেন। তার ফল হয়েছে আশ্চর্য। মায়াবী যাদুকরের মতো বিনয়বাবু রসাল শাঁসকে করেছেন নীরস আর নীরস ছোবড়াকে করেছেন রসে ভরপুর। অসাধারণ কৃতিত্ব বটে! তবে যে রস দিয়ে ছোবড়াকে ভরেছেন সে রস মধুর রস নয়, অম্লরস—পচনক্রিয়ার শেষ পরিণতি। তাঁর

বোধ হয় বিশ্বাস যে তিনি উচ্চাঙ্গের রসিকতা করেছেন, কিন্তু আমাদের পড়ে মনে হয়েছে যে উচ্চাঙ্গের দূরের কথা, খেলো রসিকতাও হয় নি, যা হয়েছে তার নাম রুচি-বিকার। স্বামী বিবেকানন্দের সেই বিখ্যাত 'গানটি নাহি সূর্য্য নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর। ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্বচরাচর' —যেটি বাগেশ্রী রাগে গেয়, সেই গানটি যদি কোনো গায়ক টপ্পা, ঠুংরি, কিংবা গজলের ঢঙে গায় তাহলে সে-গান শুনে শ্রোতাদের মনে যে ভাব হওয়া স্বাভাবিক আমার ধারণা পাঠকমাত্রেরই শ্রীবিনয় ঘোষের প্রবন্ধের এই অংশ পড়ে মনে সেই ভাবেরই উদয় হবে। অলম্ অতি বিস্তরেণ।

এবার মূল প্রবন্ধের কয়েকটি উক্তির উপর সামান্য টীকাটিপ্পনি ক'রে আমার বক্তব্য শেষ করব।

১. ১৫২ পৃষ্ঠার পাদটীকায় লেখক বলেছেন: 'কিন্তু গোবিন্দরামের নবরত্ন মন্দির সম্বন্ধে "দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন" (১৩১৮ সং) গ্রন্থে উল্লেখ আছে: "চিৎপুর রোডের ধারে ইঁহার প্রতিষ্ঠিত নবরত্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।" (৬১৩ পৃষ্ঠা)।'

এই পাদটীকা পড়ে আমার মনে সন্দেহ জেগেছে যে শহর-পরিক্রমা ও সরেজমিনে অনুসন্ধানের দাবি সত্ত্বেও বিনয়বাবু এ মন্দির দেখেছেন কিনা। যদি দেখে থাকতেন এ কথা বলতে পারতেন না। কারণ ১৯১১ সালেও যে-নবরত্ন ছিল আজও তাই আছে। শুধু আকারে ছোট ও অন্য রকম হয়েছে। McCutchion সাহেবও তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন: **'To-day there is indeed a tall nava-ratna temple on what···appears to be the site of the original Mitter Pagoda.'**

২. ১৫৩ পৃষ্ঠার ২৯-৩০ লাইনে: 'নন্দরাম স্ট্রীটের রামেশ্বর শিবমন্দির (১৮৫৪ সালে নন্দরাম সেন নির্মিত)···'

প্রথমত, নন্দরাম স্ট্রীট নামে কলকাতায় কোনো গলি নেই, আছে নন্দরাম সেন স্ট্রীট। দ্বিতীয়ত, এ মন্দির ১৮৫৪ সালে নন্দরাম সেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় নি। একথা মন্দিরের গায়ে কোথাও লেখা নেই। এ লাইন তাঁর কলম দিয়ে বেরুলো কী ক'রে ভাবতেও অবাক লাগে। এত কলকাতার ইতিহাস চর্চা ক'রে শেষপর্যন্ত বিনয়বাবুর ধারণা হল নন্দরাম সেন উনিশ শতকের লোক! আমি অন্যত্র এ বিষয়ে আলোচনা করেছি। এটা McCutchion সাহেবের ভুল। বিনয়বাবু অন্ধের মতো ঐ সাহেবকে অনুসরণ করেছেন। তৃতীয়ত, যে-তারিখ মন্দিরের গায়ে লেখা আছে—১২৬১ সনের ১১ই চৈত্র—ইংরেজি হিসাবে তা হয় ১৮৫৫ সাল, ১৮৫৪ সাল নয়। বিনয়বাবু যে মন্দিরে গিয়ে অনুসন্ধান করেন নি, এ ভুলটি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বিদেশী যদি এ রকম ভুল ক'রে থাকে তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। McCutchion সাহেব 'বাংলায়

ভ্রমণ' বইটিকে তাঁর প্রবন্ধে 'বাংলায় ব্রাহ্মণ' (Banglay Brahman) বলে উল্লেখ করেছেন। সাহেব যদি ভুল ক'রে থাকেন তাহলে আমরাও কি সেই ভুল করব ?

৩. ১৫৮ পৃষ্ঠার ২৮-২৯ লাইনে : 'চিৎপুরের বৃহত্তম নাখোদা মসজিদ (কচ্ছি মুসলমান স্থাপিত) ১৯২৬ সালের দাঙ্গার সময় স্থাপিত হয়।'

'চিৎপুরের বৃহত্তম নাখোদা মসজিদ'—এটা কেমনতর বাংলা হল ? নাখোদা মসজিদ কি কেবল চিৎপুরের বৃহত্তম মসজিদ—না সারা কলকাতার ? বিনয়বাবু জানেন কি যে ১৯২৬ সালে বর্তমান নাখোদা মসজিদ তৈরি হবার আগে ঠিক ঐ জায়গায় আর একটি ছোট নাখোদা মসজিদ ছিল ? সেটি ভেঙে সেই জায়গায় এই বড় মসজিদটি তৈরি করা হয়েছে ! সে মসজিদের উল্লেখমাত্র নেই কেন ? সে মসজিদ কে বা কারা তৈরি করেছিল ?

৪. ১৫৯ পৃষ্ঠার ১৩ লাইনে মসজিদের গায়ে ইংরেজি লেখাটি কলকাতার ইতিহাসের বই থেকে হুবহু উদ্ধৃত করা হয়েছে। এই লেখাটি মসজিদের গায়ে কোনখানে আছে : '…in commemoration of the Honorable Court of Directors, granting him the arrears of his stipend in 1840' ? ব্যাপারটা কী হয়েছিল বিনয়বাবু জানেন কি ? যদি জানেন খোলসা ক'রে বলেন নি কেন ?

৫. ১৬১ পৃষ্ঠায় ২৪ লাইনে : 'দরগা হল পীরের কবরস্থান, আস্তানা ও খান্‌কা পীরফকিরের স্থান।'

পাঠকদের জ্ঞান দেবার জন্য এই বাক্যটি শ্রীবিনয় ঘোষ যদি না লিখতেন তো ভাল হতো। পাঠকদের জ্ঞান এ পড়ে এক বিন্দুও বাড়ে নি। তিনি শুধু নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। পীর, ফকির, দরগা, খান্‌কার পার্থক্য যত সোজা মনে করেছেন তত সোজা আদৌ নয়, ব্যাপারটা অত্যন্ত জটিল। ভাল ক'রে পাঠকদের বোঝাতে হলে একটা প্রবন্ধ লেখার দরকার হয়ে পড়ে, একলাইনে সারবার বিষয় নয়।

৬. ১৬১ পৃষ্ঠার ২৫ লাইনে আছে : 'কলকাতা শহরে প্রায় ১৩টি আস্তানা এবং ৬টি খান্‌কা আছে (সিদ্দিকি, ১৯৭৪)।' ডক্টর সিদ্দিকি পুরো ১৩টি আস্তানা খান্‌কার কথা বলেছেন, প্রায় ১৩টি বলেন নি। বিনয়বাবু 'প্রায় ১৩টি' লিখলেন কেন ? এর অর্থ কী ?

৭. ১৬২ পৃষ্ঠার ২০-২১ লাইনে : 'যেমন চিৎপুরের "সোনা গাজী" ("সোনা-গাছি" বিকৃত নাম)।'

'সোনাগাছি' যেমন বিকৃত নাম, 'সোনা গাজী'ও তেমনি বিকৃত নাম। নামটা আসলে সোনা (সুবর্ণ) নয়, আরবি 'সনা', মানে প্রশংসা, স্তব, স্তুতি। পীরের পুরো নাম হচ্ছে গাজী সনা উল্লাহ্ শাহ্'।

৮. ১৬২ পৃষ্ঠার ২৫ লাইনে : 'বাস্টিড, কটন, ব্লেশিনডেন, কার্মিগার প্রভৃতির প্রাচীন কলকাতার বিবরণ-পুস্তকে ('ইতিহাস' নয়) কলকাতা শহরের মন্দির অথবা মসজিদের কোনো উল্লেখ পর্যন্ত নেই বলা চলে।'

হরি হরি! বিনয়বাবু কি কটনের বই দেখেন নি? যদি দেখে থাকেন তবে কী ক'রে একথা বললেন? কটনের *Calcutta Old and New* গ্রন্থের ১৮শ অধ্যায়ের নাম হচ্ছে 'Some Temples and Shrines'। এই অধ্যায়ে তিনি নিম্নলিখিত হিন্দুদের মন্দির ও মুসলমানদের মসজিদ ও দরগার কথা ইতিহাসসহ উল্লেখ করেছেন :

১) কালীঘাটের কালীমন্দির
২) রামনাথ মণ্ডলের রাধানাথের নবরত্ন মন্দির (মেহেরপুরে)
৩) বৌবাজারের ফিরিঙ্গি কালীমন্দির
৪) চিৎপুর রোডের সিদ্ধেশ্বরী মন্দির
৫) কেওরডাইন লেনের ত্রৈলোক্যরাম পাকড়াশির তিনটি শিবমন্দির
৬) নিমতলার আনন্দময়ী কালীমন্দির
৭) ঠনঠনিয়ার সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির
৮) ধর্মতলার প্রিন্স গোলাম মহম্মদের মসজিদ
৯) শেয়ালদার কুতুবুদ্দিন সরকারের মসজিদ (ভুল ক'রে কটন সাহেব কুতুবুদ্দিনকে 'কিতাবুদ্দিন' লিখেছেন)
১০) চিৎপুরের ভোঁসড়ি শাহের মসজিদ ও দরগা
১১) সার্কুলার রোডের মানিক পীরের দরগা
১২) ক্লাইভ স্ট্রীটে জুম্মা পীরের দরগা
১৩) হেস্টিংসে রজব আলীর দরগা
১৪) কাশিয়াবাগানে উজির আলী আসফ জা-র (কবর লক্ষ্ণৌর গদীচ্যুত নবাব' পীর ন'ন।)
১৫) বদ্রীদাস মুকিমের জৈন মন্দির
১৬) ঐ মন্দিরের দক্ষিণে চন্দ্রপ্রভুর মন্দির
১৭) ঐ মন্দিরের পূর্বে মহাবীরের মন্দির ও দাদাজী গুরু ও খুসালজীর মণ্ডপ (Pavillion)

এতগুলি হিন্দু ও জৈন মন্দির ও মুসলিম মসজিদ ও দরগার বিস্তৃত বিবরণ থাকা সত্ত্বেও শ্রী বিনয় ঘোষ বলেছেন যে কটনের পুস্তকে কলকাতা শহরের মন্দির অথবা মসজিদের কোনো উল্লেখ নেই! কিমাশ্চর্যম অতঃপরম!

৯. ১৬৪ পৃষ্ঠার ১৭ লাইনে : 'যদিও আর্মেনিয়ান গির্জার প্রাঙ্গণে জনৈক Mrs. R. Bookea-এর কবরের উপর ১৬৩০ খ্রীস্টাব্দ খোদিত আছে।'

এটা বিনয়বাবুর চোখে দেখে লেখা, না পরের শুনে বা পড়ে লেখা?

চোখে দেখে লিখলে এ ভুল করতেন না। লাইনটা আগাগোড়াই ভুল। কবরের উপর Mrs. R. Sookeas বলে কোনো মহিলার নাম কিংবা ১৬৩০ খ্রীস্টাব্দ বলে কোনো সাল খোদাই করা নেই। যা আছে তা এই : 'This is the tomb of Rezabeebeh, the wife of the late charitable Sookeas, who departed from this world on the 21st day of Nakha in the year 15.'

দেখা যাচ্ছে Mrs. R. Sookeas নেই, ১৬৩০ খ্রীস্টাব্দও নেই। আছে Rezabeebeh ও ১৫ সাল। বিনয়বাবু Rezabeebeh-কে Mrs. R. Sookeas এবং ১৫ সালকে ১৬৩০ সাল কী মন্ত্রবলে করলেন ?

১০. ১৬৪ পৃষ্ঠার ১৯ লাইনে : 'চার্নকের সমাধি-ফলকে খোদিত ১৬৯২-৯৩ সাল, তাঁর কন্যা আয়ার (Eyre) ও ক্যাথারিনের (Catherine) ফলকে ১৬৯৬-৯৭ ও ১৭০০-০১।'

এটিও নিজের চোখে দেখে লেখা নয়। বই পড়ে বা নোট থেকে লেখা। নচেৎ এমন ভুল হতো না।

সমাধি-ফলকে জোব চার্নক এবং তাঁর দুই কন্যা Mary Eyre ও Catherine White—প্রত্যেকের মৃত্যুর তারিখ যথাক্রমে এইভাবে লেখা আছে—১০ জানুয়ারি ১৬৯২, ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৬৯৬-৯৭ ও ২১ জানুয়ারি ১৭০০। বিনয়বাবু একজনেরও মৃত্যুর তারিখ উল্লেখ করেন নি। ধরে নিলাম হয়তো মৃত্যুর তারিখ দেওয়া তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না, তাই দেন নি। কিন্তু সালের বেলায় এমন কাণ্ড কী ক'রে ঘটল ? চার্নকের মৃত্যু-সাল লিখেছেন ১৬৯২-এর জায়গায় ১৬৯২-৯৩ ও Catherine-এর ১৭০০-র জায়গায় ১৭০০-০১। মাত্র Mary Eyre-এর সালটা ঠিক হয়েছে—১৬৯৬-৯৭। এখন বিনয়বাবুকে জিজ্ঞাসা প্রত্যেকের মৃত্যুর জোড়া সাল দিয়েছেন কেন ? A. F. M. Abdul Ali প্রভৃতির লেখায় পেয়েছেন বলে দিয়েছেন, না অন্য কারণে ? আর জোড়া সালেরই বা অর্থ কী ? কোনো লোক তো দু-বছর পরপর মরতে পারে না ! চার্নক ও ক্যাথারিনের বেলায় যদি তাঁর ভুল হয়েছে বলে স্বীকারও করেন, মেরি আয়্যারের দুটো বছর (১৬৯৬-৯৭) তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই জোড়া বছরের রহস্য তিনি দয়া ক'রে আমাদের জানাবেন কি ?

১১. ১৬৪ পৃষ্ঠার ২৬ লাইনে : 'পুবদিকে ছিল কোম্পানির বারুদখানা, মধ্যে ছিল প্রাচীন ও গভীর একটি পরিখা।' বারুদখানা ঠিক আছে। কিন্তু এর মধ্যে একটি গভীর পরিখা পেলেন কোথা থেকে বিনয়বাবু ? আমার তো ধারণা কলকাতার কোনো ইতিহাসে বা বিবরণ-গ্রন্থে একথা নেই। আমি যতদূর জানি তাতে এই আছে যে সেন্ট-জন গির্জার যেটা vicarage অর্থাৎ

পাদ্রির থাকবার বাড়ি, ঐ বাড়ি হবার আগে সেখানে একটা ছোট পুকুর ছিল। পুকুর ও পরিখা কি এক জিনিস ?

১২. ১৬৫ পৃষ্ঠার ২৯-৩০ লাইনে : '১৮৪০-এর দশকে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে এই গির্জায়। কবি মধুসূদন দত্ত, ৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৩, এই 'ওল্ড মিশন চার্চে' খ্রীস্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন।'

এই গির্জার নাম 'ওল্ড মিশন চার্চ' নয়—'ওল্ড বা মিশন চার্চ'। ১৭৬৭ সালের মে মাসে এই গির্জার ভিত্তি স্থাপন ও ১৭৭০ সালের ২৩ ডিসেম্বর দ্বারোদ্ঘাটন হয়। প্রথম থেকেই এই গির্জার নাম ছিল 'মিশন চার্চ'। কারণ এই গির্জার প্রতিষ্ঠাতা পাদ্রি কিয়ারনাণ্ডার (Kiernander) দক্ষিণ ভারতে প্রোটেস্টাণ্ট মিশনারি ছিলেন। আর মিশন-কাজ করবার জন্যই অর্থাৎ রোমান ক্যাথলিকদের ও পৌত্তলিকদের প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মে দীক্ষিত করবার জন্যই তিনি কলকাতায় এসেছিলেন। এ বিষয়ে তিনি একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন। কারণ সে সময়ে কোনো মিশনারিকেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তার এলাকার মধ্যে আসতে বা থাকতে দিত না। এই গির্জা প্রতিষ্ঠার ১৭ বছর পরে সেণ্ট জন গির্জা প্রতিষ্ঠিত হলে মিশন চার্চের নাম হল 'ওল্ড চার্চ', আর সেণ্ট জন চার্চের নাম হল 'নিউ চার্চ'। তখন থেকেই এই গির্জাকে বলা হতে লাগল Old or Mission Church।

সত্য বটে গির্জার ফটকের গায়ে এক মার্বেল পাথরে 'Old Mission Church. Founded 1770' লেখা আছে, কিন্তু স্বাধীনতার পরে কোনো সময়ে এই পাথরটিকে বসানো হয়েছে। তার আগে ঐ জায়গাতেই আর একটি পাথরে লেখা ছিল 'Old or Mission Church. Foundation laid 176/, completed 1769'। এই পাথরটি বহুকাল ছিল। তাতে নির্মাণকার্য শেষ হবার তারিখ ভুল লেখা থাকার দরুণ বোধ হয় ঐ পাথরটি খুলে ফেলে বর্তমান পাথরটি লাগানো হয়েছে। কিন্তু তারিখের ভুল সংশোধন করতে গিয়ে আর একটি দারুণ ভুল করা হয়েছে—নামের ভুল, Old or Mission Church-এর জায়গায় Old Mission Church লেখা হয়েছে।

১৯৪৫ সালে এই গির্জার ১৭৫ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে একটি স্মারক-গ্রন্থ গির্জার কর্তৃপক্ষগণ প্রকাশ করেন। তার নাম ছিল *One Hundred and Seventy Five Years of the Old or Mission Church*। আমি এ-বিষয়ে ঐ গির্জার বর্তমান যাজক আচার্য এস. কে. মণ্ডলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি অনুসন্ধান ক'রে এক চিঠিতে আমাকে লিখেছেন : 'Thanks very much for calling on us the other day. You are quite correct in saying—Old or Mission Church.'। এই গির্জার দ্বি-শতবার্ষিকী উপলক্ষে আর একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়েছে। তাতেও

গির্জার নাম লেখা হয়েছে Old or Mission Church। Old Mission Church নামটা ঠিক বলে তখনই মানা যেত, যদি দেখানো যেত যে কলকাতায় New Mission church নামে আর একটি গির্জা আছে বা ছিল। যেহেতু এই নামের কোনো গির্জা নেই বা ছিল না, সেই হেতু Old Mission Church নামটা ভুল।

১৩. ১৬৩ পৃষ্ঠার ২৭ লাইনে: 'সারা বাংলা প্রেসিডেন্সির "Parish Church"-র মর্যাদার উত্তরাধিকারী সেন্ট জন্‌স গির্জা।'

সেন্ট জন গির্জার নামমাত্র Parish Church ছিল না। প্রেসিডেন্সি চার্চও ছিল ১৭৮৭ থেকে ১৮১৪ সাল পর্যন্ত ২৭ বছর। ১৮১৪ সালে টমাস মিড্‌লটন কলকাতার বিশপ নিযুক্ত হলে এই গির্জার নতুন নাম হল Cathedral Church। ১৮১৪ সাল থেকে ১৮৪৭ সাল পর্যন্ত এই গির্জা Cathedral Church থাকে। ১৮৪৭ সাল থেকে ইংরেজ শাসনের শেষ পর্যন্ত সেন্ট পল্‌স চার্চ ক্যাথিড্রাল চার্চ ছিল।

শ্রীবিনয় ঘোষের প্রবন্ধের সমালোচনা এখানেই শেষ হল।

'কলকাতার মন্দির': ডেভিড ম্যাক কাটিঅন

McCutchion সাহেব 'The Temples of Calcutta' নামক তাঁর প্রবন্ধে (*Bengal Past & Present*, Jan-June, 1968) যে ৩১টি মন্দিরের উল্লেখ করেছেন, এখন আমি মাত্র কয়েকটির সম্বন্ধে বা তাদের প্রতিষ্ঠাতাদের সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলতে চাই। আপত্তি হতে পারে যে ঐ প্রবন্ধ বা তার বাংলা তর্জমা 'এক্ষণ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নি। সুতরাং এক্ষণ পত্রিকার পাঠকদের বুঝতে অসুবিধা হবে। আমি আশ্বাস দিচ্ছি বিন্দুমাত্র অসুবিধা হবে না। আর যখন মন্দির নিয়েই আলোচনা হচ্ছে তখন সে-প্রবন্ধেরও কিছু আলোচনা হওয়া দরকার। কারণ সেই প্রবন্ধই শ্রীবিনয় ঘোষের প্রবন্ধের প্রধান অবলম্বন মন্দির সম্পর্কে।

১. প্রথম, নন্দরাম সেনের রামেশ্বর শিবের মন্দির।

এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠার তারিখ লেখা আছে একেবারে মন্দিরের চূড়োয়—নিচে থেকে এত উঁচুতে যে মই লাগিয়ে উপরে উঠে না দেখলে নিচে থেকে পড়া যায় না। আগে এইটেই মন্দিরের গায়ে একমাত্র তারিখ ছিল, এখন নিচের দিকে সবশুদ্ধ পাঁচটা ফলকে পাঁচটা তারিখ লেখা আছে—দুটি ফলক আছে বাঁদিকে, দুটি মধ্যে ও একটি ডানদিকে। একটি ফলকে মন্দিরের মাথায় যে তারিখ লেখা আছে সেই তারিখই দেওয়া আছে—১০৬১ সনের ৩১শে চৈত্র নন্দরাম সেন কর্তৃক মন্দির প্রতিষ্ঠিত। ইংরেজি হিসাবে এই তারিখ হয় ১৬৫৫

সালের এপ্রিল মাস। বাঁদিকের আর একটি ফলকে লেখা আছে ১২৬১ সনের ১১ই চৈত্র। ইংরেজি হিসাবে এ তারিখ হয় ১৮৫৫ সালের ২৩শে মার্চ। এটি মন্দির-প্রতিষ্ঠার তারিখ নয়। আর যে তিনটি তারিখ আছে তিনটি ফলকে সেগুলিও মন্দির-প্রতিষ্ঠার তারিখ নয়, অন্য তারিখ, যেমন তুলসী-মঞ্চ প্রতিষ্ঠার তারিখ, নন্দরামের দুজন বংশধর জগৎচন্দ্র ও জয়ন্তীচন্দ্রের কল্যাণ কামনার তারিখ।

তাহলে মন্দিরের গায়ে আমরা মন্দির-প্রতিষ্ঠার তারিখ একটি মাত্রই পাচ্ছি—১৬৫৫ সালের এপ্রিল মাস। আর একটি তারিখ যা আগেই বলা হয়েছে মন্দির-প্রতিষ্ঠার তারিখ নয়, তা হল ১৮৫৫ সালের মার্চ মাস। McCutchion সাহেব এই দুটি তারিখ সম্বন্ধে তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন: 'One reading of the original date plaque states that this was built in 1854 by Nandaram Sen, but a modern inscription puts this in 1654'. অর্থাৎ সাহেবের মতে ১৮৫৪ সালটাই নন্দরাম সেন কর্তৃক মন্দির-প্রতিষ্ঠার আসল তারিখ; আর ১৬৫৪ সালটা হালে লাগানো হয়েছে, এটা আসল তারিখ নয়। সাহেব বাংলা বছরের হিসেব না জানার দরুণ ১৬৫৫ ও ১৮৫৫কে ১৬৫৪ ও ১৮৫৪ পড়েছেন। দুটোই ভুল তারিখ। আর ১৮৫৪ (১৮৫৫) সালটা যা মন্দির-প্রতিষ্ঠার তারিখ নয় তাকে ভুল ক'রে মন্দির-প্রতিষ্ঠার সাল ধরে আসল সাল ১৬৫৪ (১৬৫৫)-কে নকল সাল বলেছেন। এটি গুরুতর ভুল। সাহেব নিশ্চয়ই জানতেন না নন্দরাম সেন কোন সময়ের লোক। জানলে কখনোই এ ভুল করতেন না।

এ মন্দির যে নন্দরাম সেন তৈরি করেছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তিনি ১৭ ও ১৮ শতাব্দীর লোক, ১৯ শতাব্দীর ন'ন। ১৬৯৯ সালে কলকাতা প্রেসিডেন্সি শহরে উন্নীত হয়। সিদ্ধান্ত হয় যে কলকাতায় একজন প্রেসিডেন্ট ও তাঁর চারজন সদস্যসমেত একটি কাউন্সিল থাকবে। প্রথম সদস্য হবেন Accountant (হিসাব রক্ষক), দ্বিতীয় সদস্য Warehouse Keeper (মাল-গুদাম রক্ষক), তৃতীয় সদস্য Marine Purser (নৌবিভাগের হিসাব রক্ষক) এবং চতুর্থ সদস্য Receiver of Calcutta Revenues (কলকাতার খাজনা-আদায়কারী)। চতুর্থ সদস্যের নাম তখনো জমিদার (Zaminder) হয় নি। এই কাউন্সিল কাজ শুরু করে ১৭০০ খ্রীস্টাব্দে।

প্রথম Receiver of Revenues হন Ralph Sheldon। সাহেব মানুষ, ব্যবসা করতে এসেছেন, ব্যবসা বোঝেন, জমিদারির বা খাজনা-আদায়ের ব্যাপার মোটেই কিছু বোঝেন না। তাই একজন এদেশীয়কে খাজনা-আদায়ের কাজে নিযুক্ত করতে হল। নাম নন্দরাম সেন, দেগঙ্গার লোক, জাতিতে কায়স্থ। তিনি নামে Sheldon সাহেবের সহকারী কিন্তু কাজে সর্বেসর্বা। কয়েক বছর পরে

কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা চার থেকে বাড়িয়ে আট করা হয়। তাদের মধ্যে সপ্তম সদস্যের অ্যাখ্যা ছিল 'জমিদার'। কিন্তু তখনো একা 'জমিদার' কলকাতার জমির খাজনা ও অন্যান্য কর আদায়ের জন্য দায়ী ছিলেন। এই ব্যবস্থা ১৭২০ সাল পর্যন্ত চালু ছিল। নন্দরাম সেনের পর রামভদ্র ও জগৎ দাস নামে দুজন কলকাতার সহকারী খাজনা-আদায়কারী হয়েছিলেন।

১৭০০ সালে যখন নন্দরাম সেন কলকাতার সহকারী খাজনা-আদায়কারী নিযুক্ত হন তখন তিনি নেহাৎ ছেলেমানুষ ছিলেন না নিশ্চয়ই। অন্তত ৩০ বছর বয়স হয়ে থাকবে। তাহলে তাঁর জন্ম ১৬৭০ সালে হয়েছিল ধরতে হয়। তাই যদি হয় তাহলে তিনি ১৬৯৫ সালে মন্দির তৈরি করেন কী ক'রে? তখনো তো তাঁর জন্ম হয় নি! আর যদি ধরা যায় যে ১৬৯৫ সালেই তিনি মন্দির তৈরি করেছিলেন তাহলে তাঁর বয়স হয়েছিল কত? যদি কমসম করেও ২৫ বছর ধরা যায় তাহলে বলতে হয় তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৬৭০ সালে। ১৭০০ সালে যখন সরকারী চাকরি পান তখন তাঁর বয়স হয়েছিল এই হিসেবে ৩০ বছর। এই বয়সে কে তাঁকে চাকরি দেবে? তারপর দেখতে হবে তিনি কতদিন বেঁচে ছিলেন। গোবিন্দরাম মিত্রের পৌত্র ও রঘুনাথ মিত্রের পুত্র রাধাচরণ মিত্রের (মৃত্যু ১৭৭৫) এক দলিল (দানপত্র) জাল করার অপরাধে শহর কলকাতার General Quarter Session-এ ইংলণ্ডের আইন অনুসারে বিচার হয়ে ২৭. ২. ১৭৬৫ তারিখে আসামীর ফাঁসির হুকুম হয়। এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে কলকাতার ৯৫ জন প্রধান নাগরিক ২৯. ১. ১৭৬৬ তারিখে প্রেসিডেন্ট ও গভর্নর John Spencer ও তাঁর Council-এর কাছে এই বলে দরখাস্ত করেন যে রাধাচরণের ফাঁসির হুকুম অন্যায়ভাবে বিলাতি আইন অনুসারে দেওয়া হয়েছে। এদেশে বিলাতি আইন প্রযোজ্য নয়। এ দেশের আইন অনুযায়ী রাধাচরণের বিচার হলে মাত্র কিছু জরিমানা হতো। অতএব প্রেসিডেন্ট ও কাউন্সিল যেন রাধাচরণের এদেশীয় আইন অনুসারে পুনর্বিচারের আদেশ দেন। তা সম্ভব না হলে মহামান্য ইংলণ্ডেশ্বরের নিকট আবেদনের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত রাধাচরণের ফাঁসি যেন মুলতুবি রাখা হয়। এই ৯৫ জন আবেদন-কারীর মধ্যে নন্দরাম সেন ছিলেন অন্যতম। তাহলে দেখা যাচ্ছে ১৭৬৬ পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। ১৬৩০ সালে জন্ম হয়ে থাকলে ১৭৬৬ সালে তাঁর বয়স হয়েছে ১৩৬ বছর, যেটা অসম্ভব মনে হয়। আর যদি ১৬৭০ সালে তাঁর জন্ম হয়ে থাকে তাহলেও ১৭৬৬ সালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৬ বছর। সেটাও সম্ভব বলে মনে হয় না। যেদিক থেকেই দেখা যাক না কেন যতদিন না তাঁর সঠিক জন্মসাল জানা যাচ্ছে ততদিন ১৬৯৫ সালকে মন্দির-প্রতিষ্ঠার সময় বলে নির্দ্বিধায় মানতে পারা যায় না। মনে হওয়া স্বাভাবিক যে কোথাও একটা হিসেবের গণ্ডগোল আছে।

২. দ্বিতীয়, গোবিন্দরাম মিত্রের নবরত্ন মন্দির।

গোবিন্দরাম মিত্র ১৭৩০ সালে চিৎপুর রোডে ঐ মন্দির তৈরি করেন। ১৭৩৭ সালে ১০ সেপ্টেম্বরের (মতান্তরে ১১ সেপ্টেম্বরের*) মহাঝড়ে ও ভূমিকম্পে ঐ মন্দির ভেঙে পড়ে। ঐ ঝড়ে কলকাতায় ইংরেজদের প্রথম গির্জা St. Anne's Church-এর চূড়াও ভেঙে পড়ে। গোবিন্দরামের মন্দিরের চূড়া ছিল অক্টারলনি মনুমেন্টের চেয়েও উঁচু। মনুমেন্টের চূড়া বিভিন্ন হিসাব মতো ১৫২ ফুট থেকে ১৫৮ ফুট উঁচু। আর গোবিন্দরাম মিত্রের মন্দিরের চূড়া ছিল ১৬৫ ফুট উঁচু।

যাঁরা বলেন গোবিন্দরাম মিত্রের মন্দির কালীমন্দির ছিল তাঁদের মতে ঐ মন্দির ভেঙে গেলে গোবিন্দরাম মিত্রের প্রপৌত্র অভয়চরণ মিত্র (মৃত্যু ১৮১৮ সাল) ঐ মন্দিরের উল্টোদিকে মন্দির তৈরি ক'রে ঐ কালীকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করেন, যাঁকে এখন সিদ্ধেশ্বরী কালী বলা হয়। আর যাঁরা বলেন গোবিন্দরাম মিত্রের মন্দির ছিল শিব মন্দির, তাঁদের মতে ঐ সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির বনমালি সরকার তৈরি করেছিলেন।

১৭২০ সালে প্রথম 'জমিদার'পদ সৃষ্ট হয়। অর্থাৎ প্রেসিডেন্টের কাউন্সিলের সদস্য ন'ন এমন একজন কোম্পানির কর্মচারীকে স্বতন্ত্রভাবে কলকাতার খাজনা ইত্যাদি আদায়ের সম্পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়। Sterndale সাহেব লিখেছেন যে কাগজপত্র নষ্ট হয়ে যাবার দরুণ তিনি বলতে অক্ষম কলকাতার প্রথম জমিদার কে হন। ঐ ১৭২০ সালেই একজন ডেপুটি-জমিদার বা কালো-জমিদারের পদও সৃষ্টি করা হয়। প্রথম কালো-জমিদার নিযুক্ত হন গোবিন্দরাম মিত্র। তিনি ১৭২০ থেকে ১৭৫৬ সাল পর্যন্ত প্রায় একটানা ৩৬ বছর দোর্দণ্ডপ্রতাপে কলকাতা শাসন করেন। লোকে তাঁকে যমের মতো ভয় করত। সিরাজদ্দৌলার কলকাতা আক্রমণের সময় তাঁর কী অবস্থা হয়েছিল, কোথায় ছিলেন, জানা যায় না। তবে এটা জানা যায় যে কলকাতা দখলের পরেই নবাবের হুকুমে তাঁর বাড়ির সামনে ও যেসব জায়গায় তাঁর সম্পত্তি ও মালপত্র রাখা ছিল তাদের সামনে শান্ত্রী-পাহারা বসানো হয়েছিল, যাতে ক'রে সেসব কেউ লুঠ ক'রে না নিয়ে যেতে পারে, যেমন বসানো হয়েছিল উমিচাঁদের বাড়ির সামনে। ইংরেজরা কলকাতা পুনর্দখল করবার পর তিনি ফিরে আসেন ও ডেপুটি-ফৌজদার বা পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। তিনি ১৭৭২-৭৩ সালেও জীবিত ছিলেন, তার প্রমাণ আছে।

সিরাজের আক্রমণের ফলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ও কলকাতার ইংরেজ, আর্মানি, গ্রীক ও এদেশী নাগরিকদের ধনসম্পত্তির যে ক্ষতি হয় তা পূরণের জন্য নবাব মীর্জাফর সন্ধির শর্তানুযায়ী এক কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ টাকায় ক্ষতিপূরণ দেন। এদেশীয় লোকদের ভাগে যে টাকাটা পড়েছিল তা বিতরণ করবার জন্য

১৩ জন হিন্দু-মুসলমান কলকাতার প্রধান নাগরিক কমিশনার নিযুক্ত হয়েছিলেন। একজন মুসলমান নাগরিকের নাম ঐ ১৩ জনের ভেতরে থাকলেও তিনি এক পয়সাও পান নি। সুতরাং কমিশনের সংখ্যা ১২ জন মাত্র ছিল। তাঁদের মধ্যে প্রথমেই নাম ছিল গোবিন্দরাম মিত্রের ও তাঁর পুত্র রঘু মিত্রের। এই ১২ জন কমিশনার সবশুদ্ধ দশ লক্ষ পঁচিশ হাজার সাতশো ষাট টাকা পেয়েছিলেন। তার মধ্যে গোবিন্দরাম ও রঘু মিত্র পেয়েছিলেন তিন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা। আর এই ১২ জন কমিশনার অন্ত দেশী গরিব লোকদের মধ্যে যে টাকা ভাগ ক'রে দেবার ভার পেয়েছিলেন তাদের মধ্যে ৯ জনের কোনো পাত্তা নেই। মাত্র ৩ জন—গোবিন্দরাম মিত্র, শোভারাম বসাক ও রতু সরকার—মোট তিয়াত্তর হাজার চারশত তিপ্পান্ন টাকা বার আনা তাঁদের আশ্রিত, অনুচর ও পেটোয়াদের মধ্যে ভাগ ক'রে দেন। গোবিন্দরাম মিত্রের পেটোয়া-সংখ্যা সব চেয়ে বেশি ছিল—১২ জন। তারপর শোভারাম বসাকের ৯ জন ও রতু সরকারের মাত্র ৩ জন। এই ২৪ জন বাদে অন্ত কেউ বা অন্ত কারো লোক এক পয়সাও পায় নি।

গোবিন্দরাম মিত্র কুমারটুলি মিত্র বংশের আদি পুরুষ। তিনি ১৭২০ সালে ডেপুটি জমিদার বা কালা-জমিদারের পদে নিযুক্ত হন। ব্যারাকপুরের কাছে চন্দনপুকুরে বা চন্দনপুরে তাঁর আদি বাস ছিল। সেখান থেকে কলকাতায় আসেন। বহু বছর কালা-জমিদার হিসেবে মাসে ৩০ টাকা বেতন পেয়ে এসেছেন। শেষের দিকে ঐ বেতন বেড়ে মাসে ৫০ টাকা হয়েছিল।

আপার সার্কুলার রোডের ধারে পূর্বদিকে অর্থাৎ ২৪ পরগনার দিকে তাঁর এক মস্ত বাগানবাড়ি ছিল, তার নাম ছিল নন্দনবাগান। এখনো ঐ অঞ্চলে একটা রাস্তা—নন্দনবাগান স্ট্রীট—গোবিন্দরাম মিত্রের বাগানের স্মৃতি রক্ষা করছে। এই বাগানের দক্ষিণ গায়েই অপেক্ষাকৃত ছোট উমিচাঁদের বাগানবাড়ি ছিল। নবাব সিরাজদ্দৌলা যখন ১৭৫৬ সালে প্রথমবার কলকাতা আক্রমণ করেন তখন তাঁর সেনাপতি মীর মর্দন এই বাগানে ছাউনি করেছিলেন। হলওয়েল সাহেবকে বন্দী ক'রে এই বাগানে তাঁর কাছে আনা হয়। ১৭৫৭ সালে সিরাজের দ্বিতীয়বার কলকাতা আক্রমণের সময় নবাব স্বয়ং এই বাগানে ছিলেন। ১৭৪২ সালে যখন মারাঠা খাত খোঁড়া হয় তখন গোবিন্দরামের ও উমিচাঁদের বাগানবাড়িকে বাঁচাবার জন্ত খাতকে ঐ দুই বাগানের তিন পাশ দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। অর্থাৎ গোবিন্দরাম মিত্রের বাগানের উত্তর ধার দিয়ে পুব মুখে গিয়ে ঐ দুই বাগানের পেছন দিয়ে দক্ষিণ মুখে গিয়ে উমিচাঁদের বাগানের দক্ষিণ ধার দিয়ে পশ্চিম মুখে এসে ঐ খাত সার্কুলার রোডে পড়ত। ঐ দুই বাগানের তিনদিকে খাত ছিল। শুধু সামনের দিকে (পশ্চিম দিকে) কোনো খাত ছিল না। সেই কারণে আজও এই দুই বাগান ২৪ পরগনার মধ্যে

থাকা সত্ত্বেও ২৪ পরগনার মধ্যে গণ্য না হয়ে কলকাতার মধ্যে ধরা হয়। এই বাগানের পরিধির মধ্যে কোনো মামলা মোকদ্দমা হলে সেরালদা বা আলিপুর কোর্টে না হয়ে সরাসরি কলকাতা হাইকোর্টে হয়।

নিমতলা ঘাট স্ট্রীটের দক্ষিণে যে জোড়াবাগান স্কোয়ার আজকাল দেখা যায় (প্রবাদ, এখানে বৈষ্ণবচরণ শেঠের পাশাপাশি দুটি বাগান ছিল), আগে সেখানে জোড়া কেন একটাও বাগান ছিল না। গঙ্গার ধার থেকে একটা রাস্তা সোজা পুব মুখে গিয়ে সার্কুলার রোডের কাছে এসে দুমুখো হয়ে, একটা মুখ গোবিন্দরাম মিত্রের বাগানে, আর একটা মুখ উমিচাঁদের বাগানে গিয়ে শেষ হতো। তাই থেকে এই পথকে বলা হতো **Road to Jorabagan**। পথটা যেখানে গিয়ে শেষ হতো সেখানে ছিল জোড়াবাগান। কালক্রমে লোকে সে কথা ভুলে গিয়ে পথটা যেখান থেকে আরম্ভ হয়েছে সেই জায়গাটাকে বলতে আরম্ভ করল জোড়াবাগান।

গোবিন্দরাম মিত্রের নন্দনবাগানবাসী বংশধরদের মধ্যে কাশীশ্বর মিত্র ছিলেন সব থেকে বিখ্যাত। তিনি ছিলেন প্রিন্সিপাল সদর আমিন ও ছোট আদালতের জজ। আর এক শাখা নন্দনবাগানের বাস তুলে দিয়ে কাশীর চৌখাম্বা মহল্লায় গিয়ে বসে করেন। তাই থেকে তাঁদের পরিচয় 'চৌখাম্বার মিত্র' বলে। তাঁদের মধ্যে বরদা দাস মিত্র, প্রমদা দাস মিত্র প্রভৃতি এক সময়ে কাশীতে খুব সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তিশালী ছিলেন।

গোবিন্দরাম মিত্রের নামে একটা ছড়া আছে :

বনমালি সরকারের বাড়ি,
গোবিন্দরামের ছড়ি,
উমিচাঁদের দাড়ি,
হজুরিমলের কড়ি।

আবার এই ছড়ার রকমফেরও আছে :

নন্দরামের ছড়ি,
উমিচাঁদের দাড়ি,
নকু ধরের কড়ি,
মথুর সেনের বাড়ি।

উমিচাঁদ ও হজুরিমল পাঞ্জাবের লোক ও ধর্মে শিখ ছিলেন। লক্ষ্মীকান্ত ধরের ডাক নাম ছিল নকু ধর। ইনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বেনিয়ান ছিলেন। কেউ কেউ বলেন ক্লাইভের দেওয়ান ছিলেন। ১৭৬২ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানির কাছ থেকে খেলাত পান। ১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে ৯ লক্ষ টাকা ধার দেন। এঁর একমাত্র কন্যা পার্বতী দাসীর সঙ্গে মহানাদের রঘুনাথ রায় (পাল)-এর বিবাহ হয়। তাঁদের পুত্র মহারাজা সুখময় রায় (পাল), পোস্তা রাজবংশের

প্রতিষ্ঠাতা। প্রবাদ, মহারাজা নবকৃষ্ণ প্রথম জীবনে নকু ধরের কাছে চাকরি করতেন। নকু ধরই তাঁকে ক্লাইভের মুন্সি ক'রে দেন।

মথুর সেন বা মথুরামোহন সেন ছিলেন জয়মণি সেনের পুত্র, জাতিতে সুবর্ণ-বণিক। তিনি পেশায় পোদ্দার ছিলেন, ব্যাংক স্থাপন করেছিলেন। তাই লোকে বলত 'ব্যাংকার মথুর সেন'। তিনি ডাভটন (Doveton) নামে এক জেনারেলের খাজাঞ্চি ছিলেন। যশোর জেলায় তাঁর সাতটা নীলের কুঠি ছিল। প্রথম বর্মাযুদ্ধের সময় (১৮২৪-২৬) তিনি গভর্নমেণ্টকে ১৬ লক্ষ টাকা ধার দেন। তিনি নিমতলা ঘাট স্ট্রীটে ১৮০৫ খ্রীস্টাব্দে ৩ লক্ষ টাকা খরচ করে ১৬ বিঘে জমির উপর চার ফটকওয়ালা এক বিরাট প্রাসাদ তৈরি করেন লাট ভবনের অনুকরণে। সেই জন্য ইংরেজ গভর্নমেণ্ট তাঁর উপর চটে যান ও হুকুম দেন একটা গেট সর্বদাই বন্ধ রাখতে। তাঁর বাড়ির সীমানা ছিল উত্তরে গোপীকৃষ্ণ পাল লেন, দক্ষিণে নিমতলা ঘাট স্ট্রীট, পূর্বে গৌর লাহা স্ট্রীট ও পশ্চিমে মথুর সেন গার্ডেন লেন। এই বাড়ি পরে ৺দুলাল মল্লিকের বংশধরদের সম্পত্তি হয়। এখনো তাঁদের সম্পত্তি আছে কিনা আমার জানা নেই। এই বাড়িতে 'ডাফ্ কলেজ' বা 'ফ্রি চার্চ ইনস্টিটিউশন' ১৮৪৪-এর মার্চ থেকে ১৮৫৭-র মার্চ পর্যন্ত মোট ১৩ বছর ছিল। পশ্চিম পাশে নিজস্ব বাড়ি তৈরি হলে কলেজ সেখানে উঠে যায়। ডাফ্ কলেজ উঠে গেলে মথুর সেনের বাড়িতে (৬৮ নম্বর নিমতলা ঘাট স্ট্রীট) কলিকাতা নর্মাল স্কুল ও তার আনুষঙ্গিক কলিকাতা মডেল স্কুল ৮৩ নম্বর আপার চিৎপুর রোড থেকে (যেখানে রবীন্দ্রনাথ কিছুকাল পড়েছিলেন) উঠে আসে ও ১৯০১ সাল পর্যন্ত থাকে। ১৯০১ সালে এইখানে আবাসিক ছাত্রদের মধ্যে প্লেগ দেখা দেয়। একজন ছাত্র প্লেগে মারা যায়। আতঙ্কের জন্য স্কুল কয়েক মাস বন্ধ থাকবার পর ১৯০২ সালের জুন মাসে ২৮ নম্বর কনভেণ্ট রোডে উঠে যায়।

ডাফ্ কলেজের নিজস্ব বাড়িতে (৭৪ নম্বর নিমতলা ঘাট স্ট্রীট) ২৮টা ঘর ছিল। তাতে ১০০০ থেকে ১২০০ ছাত্র বসতে পারত। তা ছাড়া ৩টি হল্ ছিল, দুটি হল্-এ গ্যালারি ছিল, একটা গ্যালারিতে ৪৫০, আর একটা গ্যালারিতে ৭৫০ ছাত্র বসতে পারত। এছাড়া ছিল লাইব্রেরি ও ল্যাবরেটরি। এই বাড়িতে এখন জোড়াবাগান থানা রয়েছে। বনমালি সরকারের বাড়ি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, কিন্তু মথুর সেনের বাড়ি হীনদশায় এখনো দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর বাড়ির কাছেই একটি ঠাকুরবাড়ি ও ফুলের বাগান মথুর সেন তৈরি করেছিলেন। প্রথমটি এখনো আছে, দ্বিতীয়টি নেই, যদিও তার নামটি এখনো বেঁচে আছে— মথুর সেন্স গার্ডেন লেন। এই গলির ৮ নম্বর বাড়িতে মথুর সেনের বংশধর ও রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট বন্ধু ও সাহিত্যিক প্রিয়নাথ সেন বাস করতেন। এখনো সেই বাড়ির উপর লেখা আছে 'প্রিয়নাথ ভবন'।

ইংরেজরা কলকাতা পুনর্দখল করবার পর মাত্র একটি 'জমিদার' কলকাতায় নিযুক্ত হন। তাঁর নাম মিঃ কলেট (Collet)। তিনি ১৭৫৮ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত 'জমিদার' পদে কাজ করেন। তারপরে তার উত্তরাধিকারীর পদের নাম 'জমিদার' না হয়ে হল 'কালেক্টার'। প্রথম কালেক্টার হলেন William F. Frankland। সিরাজের কলকাতা আক্রমণের সময় ১৮ই জুন রাতে যে দুজন ইংরেজ পুরুষ সর্বপ্রথম দুর্গ থেকে পালিয়ে জাহাজে গিয়ে ওঠেন মহিলাদের পৌঁছে দেবার ছুতো ক'রে তাঁদের মধ্যে একজন হলেন এই বীরপুঙ্গব William Frankland। কিন্তু দেখা যায় এই কাপুরুষ তার জন্য কোনো শাস্তি না পেয়ে বরং পুরস্কার পেয়েছিলেন। ১৮৫৮-৫৯ সালে তিনি ফের কলকাতায় কালেক্টারের চাকরিটা শুধু ফিরে পেলেন না, তাঁর পদোন্নতিও হল—তিনি কাউন্সিলের তৃতীয় সদস্য হলেন।

আগে বলা হয়েছে যে গোবিন্দরাম মিত্র প্রবল প্রতাপে কলকাতা শাসন করতেন। প্রশ্ন হওয়া স্বাভাবিক যে গোবিন্দরাম মিত্রের কাজ ছিল খাজনা, কর ইত্যাদি আদায় করা ডেপুটি জমিদার হিসাবে, লোককে শাসন করা নয়, তাহলে তিনি জবরদস্ত শাসনকর্তা হলেন কী ক'রে? তার উত্তর এই যে সেকালে মোগল ফৌজদারের অধীনে প্রত্যেক জমিদারের দুটি ক'রে আদালত থাকত—একটি খাজনা আদায়-তহশিলের কাছারি। কোনো প্রজার খাজনা বা অন্য দেনা বাকি পড়লেই তাকে কাছারিতে ধরে নিয়ে এসে আটক ক'রে রাখা হতো। কিংবা অন্য নানা রকম শারীরিক শাস্তি দেওয়া হতো টাকা আদায় করবার জন্য। দ্বিতীয় কাছারিটি ছিল দেওয়ানি ও ফৌজদারি কাছারি। এই কাছারিতে এদেশীয় প্রজাদের মধ্যে সবরকমের দেওয়ানি মোকদ্দমার বিচার করতেন জমিদার হিন্দু ও মুসলমান আইন অনুসারে। তাছাড়া চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, খুন, জখম ইত্যাদি ফৌজদারি অপরাধেরও বিচার করতেন জমিদার মুসলিম আইন অনুসারে। সেইজন্য জমিদারদের অধীনে আলাদা পুলিশ থাকত। তাদের বলা হতো জমিদারী পুলিশ। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে কোম্পানির সব আদালতেই ফৌজদারি অপরাধের বিচার হয়ে এসেছে মুসলমান আইন অনুসারে। মুসলিম আইন অনুসারে এদেশীয় প্রজাদের ফৌজদারি অপরাধের বিচার শেষ হয়েছে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট নিজের হাতে এদেশের শাসনভার নেবার পর।

১৬৯৮ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর এই তিনটি গ্রামের জমিদারী স্বত্ব অর্থাৎ খাজনা আদায়ের স্বত্ব কিনে নেবার পর বাংলার নবাব অন্যান্য জমিদারের মতো ইংরেজ জমিদারকেও ঐ তিন গ্রামের মধ্যে দুটি কাছারি ও পুলিশ রাখার অনুমতি দেন। কিন্তু যেহেতু ইংরেজ জমিদাররা হিন্দু ও মুসলমানের দেওয়ানি কিংবা ফৌজদারি কোনো আইনই

জানতেন না, তার উপর ঘন ঘন জমিদার বদল হতো, সেই জন্য তাঁরা ডেপুটি জমিদারের উপর সবরকম বিচারের ভার ছেড়ে দিয়েছিলেন। এই কারণেই গোবিন্দরাম মিত্র ডেপুটি জমিদার হিসেবে দেশী প্রজাদের উপর পুরো শাসন-ক্ষমতা পান। কলকাতার জমিদারের এই দুই কাছারি স্থাপিত হবার ২৭।২৮ বছর পরে ১৭২৭ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজার পারায়ানা-বলে কলকাতায় ৪টি দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত স্থাপিত হয়। তার মধ্যে একটা হচ্ছে Mayor's Court দেওয়ানি মামলার জন্য ও আর একটা Court of Quarter Sessions ফৌজদারি মামলার জন্য। তৃতীয় আদালত ছিল ছোট দেওয়ানি আদালত—Court of Requests, পরে এই আদালতের নাম হয় Small Causes Court। চতুর্থ আদালত ছিল আপিল আদালত। এই ৪টি আদালতেই বিচার হতো ইংলণ্ডের দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইন অনুসারে। গোবিন্দরাম মিত্রের নাতি রাধাচরণ মিত্রের দলিল জাল করবার অপরাধে বিচার হয়েছিল Court of Quarter Sessions-এ ও বিলিতি আইনে তাঁর ফাঁসির হুকুম হয়েছিল।

৩. তৃতীয় মন্দির, চিৎপুরে চিত্তেশ্বরী (বা চিত্রেশ্বরী) মন্দির।

অনেকের মতে 'চিত্তেশ্বরী পুর' থেকে 'চিৎপুর' নাম হয়েছে। আর এক কিংবদন্তি যে চিত্তেশ্বরী দেবী 'চিতু' নামে এক ডাকাতের প্রতিষ্ঠিত দেবী। এই 'দেবীর সামনে নাকি নরবলি দেওয়া হতো। বেশির ভাগ লোকেরই ধারণা যে চিৎপুর রোডই আসল চিৎপুর। সেটা ভুল ধারণা। বাগবাজারের খালের উত্তর থেকে চিৎপুর আরম্ভ হয়ে Gun and Shell Factory পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে। আগে চিৎপুর ও কাশীপুর থানা প্রায় পাশাপাশি ছিল। চিৎপুর রোডের পুরো নাম Road to Chitpore—চিৎপুর যাবার রাস্তা।

মনোহর ঘোষ ওরফে মহাদেব ঘোষ চিৎপুরে চিত্তেশ্বরী দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠার তারিখ McCutchion সাহেব ১৫৮৬ খ্রীস্টাব্দ বলে উল্লেখ করেছেন। এ তারিখ তিনি কোথা থেকে পেলেন? মন্দিরের মাথায় লেখা আছে ১৬১০ খ্রীস্টাব্দ। এই তারিখই ঠিক বলে মনে হয়। মনোহর ঘোষ ছিলেন হুগলি জেলার আখনার ঘোষ। ইনি ছিলেন প্রথমে রাজা টোডরমলের গোমস্তা, পরে হন মুহুরি। শেষে সুবর্ণরেখা নদীতীরে বাস করেন। মোগল-পাঠান যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে সুবর্ণরেখা ত্যাগ ক'রে চিৎপুরে এসে বাস করেন। সেই সময়ে চিত্তেশ্বরী দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু কিছুকাল পরে ডাকাতদের অত্যাচারে চিৎপুর ত্যাগ ক'রে ব্যারাকপুরের পাশে চন্দন (চন্দন) পুকুরে গিয়ে বাস করেন। গোবিন্দরাম মিত্রেরও আদিনিবাস এই চন্দনপুকুরে ছিল। রাধাকান্ত ঘোষও (এক মতে ইনি মনোহর ঘোষের পুত্র, অন্য মতে ভ্রাতুষ্পুত্র) চন্দনপুকুরে বাস করতেন।

সে সময়ে চিৎপুর-কাশীপুর অঞ্চলে যে ডাকাতরা থাকত তার প্রমাণ এই যে কাশীপুর রোডের উপর বামনদাস মখুজ্যের ঠাকুরবাড়ির উত্তরে এক বড় বাড়িতে বরানগর বা কাশীপুর থানার অধীন এক পুলিশের ফাঁড়ি ছিল। ঐ ফাঁড়ির রাস্তার দিকের একটি ঘরে এক পাথরের শিবঠাকুর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বাইরে লেখা ছিল 'রঘু ডাকাতের প্রতিষ্ঠিত মহাদেব'। তার চেয়েও বলবৎ প্রমাণ এই যে ৺অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের বন হুগলিতে যে বাগানবাড়ি ছিল সে বাগানবাড়িও রঘু ডাকাতের সম্পত্তি ছিল। এই কথা তাঁর 'ভারতের শিল্প ও আমার কথা' নামক গ্রন্থের ৭২ পৃষ্ঠায় লেখা আছে। আমি এখানে তা থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি: 'আমার পিতামহ ৺অবিনাশচন্দ্র গাঙ্গুলীর পুণ্যেতে আমরা পেয়েছিলাম প্রকাণ্ড একটি বাগান। দশ বিঘা জমির উপরে তিনটি পুকুর ও একটি দোতলা বাড়ি ছিল সে বাগানে। আর ছিল প্রচুর নানারকম ফুল ও ফলের গাছপালা। জায়গাটি হোল ৩১ নম্বর গোপাল লাল ঠাকুর রোড, বন হুগলি, চব্বিশ পরগণা। বরানগরের কাছে।

'দলিলে দেখেছি ক্রেতা অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (আমার পিতামহ), আর বিক্রেতা রঘুনাথ সর্দার অর্থাৎ তখনকার কালের বিখ্যাত 'রোঘো ডাকাত'। শুনেছি বাগান বিক্রির অনেক পরেও তার বংশের ছেলে নাতিরা আমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে আসত। আমরাও ছেলেবেলায় তার এক নাতিকে দেখেছিলাম দীর্ঘাঙ্গ, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, হাতে প্রকাণ্ড লাঠি। আমাদের বাগানের গেট থেকে বাড়ী পর্যন্ত তিনশ' ফুট রাস্তা ঐ লাঠির উপর ভর দিয়ে কয়েকটি লাফেতে অতিক্রম করে সে আসত।'

চিতু ডাকাতের কিংবদন্তির কথা আগেই বলেছি।

মনোহর ঘোষের মৃত্যু হয় ১৬৩৭ খ্রীস্টাব্দে। পূর্বোক্ত রাধাকান্ত ঘোষের পুত্র বারানসী ঘোষ ২৪ পরগনার কালেক্টার Gladwin সাহেবের দেওয়ান ও জোড়াসাঁকোর শান্তিরাম সিংহের জামাই ছিলেন। তিনি জোড়াসাঁকোয় নিজের বাসের জন্য প্রকাণ্ড এক বাড়ি তৈরি করেছিলেন। যে রাস্তায় এ বাড়ি ছিল তার নাম বারানসী ঘোষের ষ্ট্রীট। এ রাস্তাটি পশ্চিমে চিৎপুর রোড থেকে পূর্বে কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এখন আর সমস্ত রাস্তার নাম বারানসী ঘোষ ষ্ট্রীট নয়। চিৎপুর রোড থেকে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ পর্যন্ত পশ্চিমের অংশের নাম এখনো বারানসী ঘোষ ষ্ট্রীট রয়েছে। কিন্তু সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ থেকে কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীট পর্যন্ত পুবের এই অংশের নাম হয়েছে তারক প্রামাণিক রোড। চন্দনপুকুরে থাকতেন বলে বারানসী ঘোষ ব্যারাকপুরের কাছে গঙ্গার স্নানঘাট ও ৬টি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। স্নানঘাটের চাঁদনির গায়ে এক পাথরের ফলকে একথা লেখা আছে।

মনোহর ঘোষের পুত্র রামসন্তোষ ঘোষ পিতার মৃত্যুর পর বর্ধমানে গিয়ে

বাস করেন। তিনি অনেকগুলি ভাষা শিখে ইংরেজ, ফরাসি ও ওলন্দাজ কুঠিতে ৭০ বছর কাজ করেন। এঁর পুত্র বলরাম ঘোষ যাঁর নামে শ্যামপুকুরে রাস্তা আছে। কিন্তু তিনি কস্মিনকালে কলকাতায় বাস করেন নি, চিরকাল চন্দননগরে বাস করেছেন। বাণিজ্যে সংগতিপন্ন হয়ে ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে ৯৪ বছর বয়সে মারা যান।

বলরাম ঘোষের প্রথম দুই পুত্র রামহরি ঘোষ ও শ্রীহরি ঘোষ পিতার মৃত্যুর পর চন্দননগর ছেড়ে শ্যামপুকুরে এসে বাস করেন। প্রায় ২০ বিঘে জমি নিয়ে মস্ত বাড়ি, বাগান ও পুকুর তৈরি করেন।

শ্রীহরি ঘোষ মুঘের দুর্গের দেওয়ান ছিলেন। বহু অর্থ উপার্জন করেন। চাকরি থেকে অবসর নেবার পর কলকাতায় এসে শ্যামপুকুরের বাড়িতে না থেকে আলাদা এক বাড়ি ক'রে বাস করেন। যে রাস্তায় বাড়ি করেন তার নাম এখনো হরি ঘোষ স্ট্রীট। বহু অনাথ, দুঃখী, নিঃসম্বল লোককে, ছাত্র ও আত্মীয়স্বজনকে বাড়িতে আশ্রয় ও অন্নবস্ত্র দিয়ে পুষতেন বলে লোকে তাঁর বাড়িকে 'হরিঘোষের গোয়াল' বলত। তিনি মানুষ মাত্রকেই সহজে বিশ্বাস করতেন। তার ফল হাতেনাতে পেয়েছিলেন। তাঁর বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে তাঁকে ঠকায়। কলকাতার বাড়ি গাঙ্গুলিদের বেচে দিয়ে তিনি শেষজীবনে কাশীবাসী হন ও সেখানে অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে তাঁর দেহান্ত হয়। তাঁর কলকাতার বাড়ি এখনো আছে।

হেঁদোর উত্তর ধারে যে মস্ত বড় মোটা মোটা থামওয়ালা বাড়ি আছে তার মালিক ৺কাশীপ্রসাদ ঘোষ (১৮০৯-৭৩) বলরাম ঘোষের বংশধর। তিনি হিন্দু কলেজে পড়তেন। ইংরেজিতে কবিতা লিখতেন। সেগুলি *Shair and Other Poems* নাম দিয়ে ছাপিয়ে বার করেন। *Hindu Intelligencer* নামে এক ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। সে কাগজ সিপাহি বিদ্রোহের সময় উঠে যায়। তা ছাড়া তিনি প্রায় ৩০০ বাংলা গানও রচনা করেছিলেন।

৪-৫. চতুর্থ ও পঞ্চম মন্দির।

McCutchion সাহেব বলেছেন কালীঘাটে নকুলেশ্বর শিবের মন্দির একজন শিখ ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে তৈরি করিয়ে দেন, আর মধুসূদনের মন্দির উদয়-নারায়ণ মণ্ডল ঐ একই বছরে (১৮৪৩) তৈরি করেন। মধুসূদনের মন্দির যে ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে তৈরি হয়েছিল এ খবর McCutchion সাহেব কোথা থেকে পেলেন? মন্দিরের গায়ে কোনো পাথরে একথা লেখা নেই। আর সেবায়েতরাও জানেন না।

সাহেব মধুসূদনের মন্দির তৈরির তারিখ দিলেন, কিন্তু কাছেই ছিল শ্যাম-রায়ের মন্দির। তার তৈরির তারিখ দেওয়া তো দূরের কথা, উল্লেখমাত্র করলেন

না। কটন সাহেব তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *Calcutta Old and New*-তে লিখেছেন : 'বাঙয়ালির উদয়নারায়ণ মণ্ডল শ্যামচাঁদের মন্দির তৈরি করেন ১৮৪৩ সালে, আর তারা সিং নামে একজন পাঞ্জাবী সওদাগর নকুলেশ্বরের বর্তমান পাথরের মন্দির তৈরি করেন ১৮৫৪ সালে।'—কার কথা সত্য, কটন সাহেবের, না McCutchion সাহেবের ?

৬ ষষ্ঠ মন্দির, বৌবাজারের সিদ্ধেশ্বরী বা ফিরিঙ্গি কালীমন্দির।

কটন সাহেব তাঁর বইতে লিখেছেন : 'শ্রীমন্ত ডোম নামে এক ব্যক্তি এই কালী প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তাঁর সময় পর্যন্ত ৭০ বছর ধরে এই কালীর পূজারীর কাজ করেন। শ্রীমন্ত ডোম এই অঞ্চলের বসন্ত রোগীদের চিকিৎসা করতেন। মন্দিরের ভেতর কালী মূর্তির পাশেই এক শীতলার মূর্তিও রাখা আছে। এই অঞ্চলের ফিরিঙ্গি বাসিন্দাদের মধ্যে শ্রীমন্ত ডোমের খুব খ্যাতি-প্রতিপত্তি হয়। ফিরিঙ্গিরা বসন্ত রোগ থেকে সেরে উঠলে এই কালীর কাছে পুজো পাঠিয়ে দিত। সেই জন্য এই কালীর নাম হয় ফিরিঙ্গি কালী।' অনেকের ধারণা, এ কালী কবিরাজ অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি কিংবা তাঁর ঠাকুর্দা (তাঁরও নাম ছিল অ্যান্টনি, অনেকের ভুল ধারণা তিনি অ্যান্টনি বাগানের মালিক ছিলেন) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—সেইজন্য একে 'ফিরিঙ্গি কালী' বলা হয়। এটা ভুল ধারণা। বর্তমানে কালীর সেবায়েত ব্রাহ্মণ।

McCutchion সাহেব লিখেছেন : 'এই মন্দিরের গায়ে হালের এক পাথরে এর প্রতিষ্ঠার তারিখ ১৪৯৭ খ্রীস্টাব্দ বলে লেখা আছে।' কিন্তু তা লেখা নেই। লেখা আছে ৯০৫ অর্থাৎ ৯০৫ বঙ্গাব্দ। এই বঙ্গাব্দের ইংরেজি সাল হয় ১৪৯৮, ১৪৯৭ নয়।

মন্দিরের বয়সটা একটু বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়। ১৪৯৮ সালে কলকাতা শহরের ও বৌবাজার পাড়ার অস্তিত্ব ছিল কি ? আশ্চর্য, এই তারিখ সম্বন্ধে শ্রীবিনয় ঘোষ কোনো মন্তব্য করেন নি। তাহলে কি বুঝতে হবে মৌনং সম্মতি লক্ষণম্ ? আর সরেজমিনে তদন্ত করলে ১৪৯৭ সালটা যে ভুল এটা কি তাঁর নজরে পড়ত না ?

৭. McCutchion সাহেব লিখেছেন : 'এ. কে. রায়ের *A Short History of Calcutta* অনুসারে বৈষ্ণব দাস শেঠের পুরাতন ঠাকুরবাড়ি (গোবিন্দজীর মন্দির—রা. মি) ১৯০১ সালেও টাকশালের পিছনে বর্তমান ছিল।'

১৯০১ সালে কেন, ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত বর্তমান ছিল। তারপর সে ঠাকুরবাড়ি বিক্রি হয়ে যায়। গোবিন্দজী আর ওখানে নেই। কোথায় আছেন জানতে পারি নি।

৮. McCutchion সাহেব লিখেছেন : 'ঠনঠনিয়ার সাবেক কালীমন্দির ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দে তৈরি হয়।'

কিন্তু বর্তমান মন্দিরের গায়ে এক পাথরে ১১১০ সাল লেখা আছে। অর্থাৎ এই পাথরের প্রমাণে কালীমন্দির তৈরি হয়েছিল ১৭০৩ খ্রীস্টাব্দে, ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দে নয়।

৯. McCutchion সাহেব লিখেছেন : 'টালিগঞ্জে ঘোষবাবুদের তৈরি পাঁচটি আটচালা শিবমন্দিরের মধ্যে চারটি এক জায়গায় আর একটি একটু আলাদা আছে। এই আলাদা মন্দিরটি বলরাম ঘোষ তৈরি করেন।'

কিন্তু মন্দিরের মাথায় পাথরে যে-নাম লেখা আছে তা বলরাম ঘোষ নয়—বারুরাম ঘোষ বা বাবুরাম ঘোষ, যদিও বাবুরামের দ্বিতীয় ব-য়ের তলায় উ-কারের চিহ্ন নেই।

১০. McCutchion সাহেব লিখেছেন : '৭৮ নম্বর টালিগঞ্জ রোডে রাধা-মোহনের মন্দির আছে।'

রাধা-মোহনের মন্দির নেই, রাধা-মদনমোহনের মন্দির আছে।

১১. McCutchion লিখেছেন : '৯৩ নম্বর টালিগঞ্জ রোডে যে গোপাল-জীর ও শিবমন্দির আছে তা বিহারীলাল মণ্ডল ১৮৪৫ সালে তৈরি করেন।'

বিহারীলাল মণ্ডল তৈরি করেন নি, করেছিলেন প্যারীলাল মণ্ডল—১৮৪৫ সালে নয়, ১৮৪৭ সালে।

১২. সাহেব লিখেছেন : '৯৩ নম্বর টালিগঞ্জের প্রায় ১০০ গজ দক্ষিণ-পূর্বে যে আটচালা লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির আছে তা ১৮৪৫ সালের কাছাকাছি ব্যানার্জীবাবুরা তৈরি করেন।'

ব্যানার্জীবাবুরা তৈরি করেন নি। করেছিলেন মণ্ডলবাবুরা। কিন্তু তাঁরা ঐ মন্দিরের মধ্যে কোনো ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করেন নি। ঐ খালি মন্দির ব্যানার্জী-বাবুরা মণ্ডলবাবুদের কাছ থেকে কিনে নেন ও ১৯৪৯ সালে লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ তার ভেতর প্রতিষ্ঠা করেন।

১৩. টালিগঞ্জে ঘোষেদের পাঁচটি আটচালা শিবমন্দিরের সামান্য উত্তর-পশ্চিমে আর একটি ঐ ধরনের বড় শিবমন্দির আছে, সাহেব তার উল্লেখ করেন নি।

১৪. সাহেব লিখেছেন : 'বরিশার বৈষ্ণপাড়ায় আর তিনটি আটচালা শিবমন্দির আছে, তাদের একটা একেবারেই ভেঙে গেছে।'

বরিশার বৈষ্ণপাড়া শখের বাজারের পাশেই। ঐ তিনটি মন্দির বৈষ্ণপাড়ায় নেই, আছে শখের বাজার থেকে প্রায় দেড় মাইল পূর্ব-দক্ষিণে চুয়াবন বা চোঁয়াবন গ্রামে। কাদম্বরী রায় নামে কোনো বৈদ্যজাতীয়া মহিলা ঐ মন্দির তিনটি প্রতিষ্ঠা করেন।

মন্দির সম্পর্কে আলোচনা আপাতত এখানেই শেষ হল॥

যুগান্তর চক্রবর্তী

দিবারাত্রির কাব্য : একটি উপন্যাসের জন্ম

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'দিবারাত্রির কাব্য'র ভূমিকায় জানিয়েছিলেন যে, 'দিবারাত্রির কাব্য' তাঁর 'একুশ বছর বয়সের রচনা', 'কয়েক বছর তাকে তোলা' থাকার পর 'অনেক পরিবর্তন করে' উপন্যাসটি তিনি মাসিক 'বঙ্গশ্রী'-পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এই তথ্য অনুযায়ী, 'দিবারাত্রির কাব্য'র আদি পাণ্ডুলিপির রচনাকাল ১৯২৯, অর্থাৎ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রথম গল্প 'অতসীমামী' প্রকাশের (পৌষ ১৩৩৫, ডিসেম্বর ১৯২৮) অব্যবহিত কিছুকালের মধ্যেই 'দিবারাত্রির কাব্য' রচনায় হাত দেন এবং 'দিবারাত্রির কাব্য' লেখকের প্রথম উপন্যাস। আদি লিখনের চার বছর পর, ১৯৩৪-এর এপ্রিল-মে, বঙ্গাব্দ ১৩৪১ বৈশাখ-সংখ্যা 'বঙ্গশ্রী'-পত্রিকায় উপন্যাসটি শুরু হয় এবং, পর-পর ন'টি সংখ্যায় ধারাবাহিক প্রকাশের পর, পৌষ ১৩৪১-এ সম্পূর্ণ হয়। এরও এক বছর পর, ১৯৩৫-এর ডিসেম্বরে 'দিবারাত্রির কাব্য' প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই বছরেই গ্রন্থকার হিসাবেও লেখকের প্রথম আবির্ভাব, তবে প্রকাশকালের দিক থেকে 'দিবারাত্রির কাব্য' তাঁর প্রথম গ্রন্থ বা উপন্যাস কোনোটাই নয়— তার কিছু আগেই, একই বছরের মার্চ ও অগাস্ট মাসে প্রকাশিত হয়ে যায় যথাক্রমে উপন্যাস 'জননী' ও প্রথম গল্পগ্রন্থ 'অতসীমামী'। প্রকাশকালের দিক থেকে 'দিবারাত্রির কাব্য' তাই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃতীয় গ্রন্থ, দ্বিতীয় উপন্যাস।

এ-সবই তথ্যমাত্র ; প্রয়োজনীয় নিশ্চয়, তবে তেমন-কিছু নূতন বা অজ্ঞাত তথ্য নয়। কিন্তু এইসব তথ্যের বিন্যাস থেকেই ক্রমে দেখা দেয় 'দিবারাত্রির কাব্য'র আদি রচনা ও পরিণত রূপের অন্তর্বর্তী এমন-কিছু ছিন্ন সূত্র, ও সেই সূত্রে কিছু-কিছু জিজ্ঞাসা ও রহস্য, যার ব্যাখ্যা ও মীমাংসা ছাড়া লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর প্রথম বড় লেখার জন্মকাহিনী আমাদের কাছে সম্পূর্ণ হতে পারে না। ছিন্ন সূত্রের সন্ধানে আমাদের তাই পুনরায় তথ্যেরই দ্বারস্থ হতে হয়। তথ্য এবং তথ্যের বারংবার বিন্যাস তথা পুনর্বিন্যাসের মধ্য দিয়েই খুঁজে পাওয়া সম্ভব একজন লেখক এবং তাঁর-প্রধান কোনো রচনার ক্রমপরিণতির বিলুপ্ত চিহ্নগুলি, এবং সেইসব জিজ্ঞাসার উত্তর ও রহস্যের ব্যাখ্যা, যা কোনো বড় লেখকের সমগ্র শিল্পক্রিয়ার প্রকৃতি ও ধারাবাহিক ইতিহাস বুঝে নেবার জন্যেই আমাদের কাছে মূল্যবান। ভুল বা অসম্পূর্ণ তথ্য এক্ষেত্রে কেবলই ভুল সিদ্ধান্তের জন্ম দেয়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই আমাদের জানান যে, 'দিবারাত্রির কাব্য'র আদি লিখনের কয়েক বছর পর, বহুলপরিমাণে পরিবর্তিত রূপে, উপন্যাসটি তিনি 'বঙ্গশ্রী'তে প্রকাশের জন্য দেন। কিন্তু যে-কথা তিনি বলেন না, তা এই যে, 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় প্রকাশিত উপন্যাসের পাঠটিও তিনি গ্রন্থরূপে অবিকল ছাপেন নি—পরিমার্জনা, পরিবর্তন ও পরিবর্জনের চিহ্ন গ্রন্থের অধ্যায়-বিভাগ থেকে শুরু ক'রে আগাগোড়া প্রায় সর্বত্র। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে 'বঙ্গশ্রী'র পাঠ থেকে একটানা দীর্ঘ অংশ প্রচলিত গ্রন্থে বর্জিত হয়েছে, এবং বর্জনের পরিমাণ যে-ক্ষেত্রে একটি বা দু'টিমাত্র শব্দের বেশি নয়, সে-ক্ষেত্রেও একজন সদ্যোজাত লেখকের অতিক্রান্ত বয়ঃপ্রাপ্তির চিহ্ন হিসাবে তা তাৎপর্যপূর্ণ। এইসব পাঠভেদ ও আরো নানাবিধ সংস্কার ছাড়াও, আমরা লক্ষ করি, 'বঙ্গশ্রী' এবং প্রচলিত গ্রন্থের সমাপ্তি সম্পূর্ণই পৃথক। একইভাবে, গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক উহ্য রাখেন যে, 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় উপন্যাসটি শুরু হয় 'একটি দিন'-নামক একটি বড় গল্পের আকারে—পরবর্তী দুই কিস্তি 'একটি সন্ধ্যা', তার পরের দু'টি কিস্তি 'রাত্রি', এবং শেষপর্যন্ত শেষ চার কিস্তি 'দিবারাত্রির কাব্য', এইভাবে গল্পটি পূর্বানুক্রমিক এগোয় এবং সমাপ্ত হয়। পাঠকমাত্রই জানেন, প্রচলিত 'দিবারাত্রির কাব্য' তিন ভাগে বিভক্ত এবং প্রতিটি ভাগই পৃথক শিরোনামযুক্ত—প্রথম ভাগ 'দিনের কবিতা', দ্বিতীয় ভাগ 'রাতের কবিতা', এবং তৃতীয় ভাগ 'দিবারাত্রির কাব্য'। 'বঙ্গশ্রী'র 'একটি দিন' প্রচলিত গ্রন্থে সম্পূর্ণ প্রথম ভাগের রূপ নেয়, 'একটি সন্ধ্যা' ও 'রাত্রি' মিলিয়ে গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ, এবং 'বঙ্গশ্রী'র শেষ চার কিস্তি থেকেই গ্রন্থের তৃতীয় ভাগ ও উপন্যাসের নামকরণ। লেখক জানান না বলেই আরো একটি তথ্য পাঠকের অজানা থাকে—বর্তমান গ্রন্থের তিনটি পৃথক বিভাগের সঙ্গে সংযুক্ত তিনটি ভূমিকাকবিতা 'বঙ্গশ্রী'র পাঠে ছিল না,—গ্রন্থাকারে প্রকাশকালেই কবিতা তিনটি সংযোজিত হয়।

হয়ত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পাঠকদের জানান নি বলেই উপরোক্ত তথ্যগুলি তাঁর গবেষক-সমালোচকগণের কাছেও অজ্ঞাত থেকে যায়; অন্তত, 'দিবারাত্রির কাব্য'র ভিন্ন দু'টি পাঠ ও পাঠান্তর, এবং সেই সূত্রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর প্রথম উপন্যাসের ক্রমপরিণতির ইতিহাস, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো সমালোচকের কাছে এখনো পর্যন্ত প্রয়োজনীয় মনে হয় নি। অথচ লেখক যদিও জানান নি, অন্তত 'বঙ্গশ্রী'র বড় গল্প থেকে সম্পূর্ণ একটি উপন্যাসের জন্মকাহিনী, নিছক কাহিনী হিসাবেই, পাঠকের কাছে পরবর্তীকালে দু'বার উপস্থিত করেন 'বঙ্গশ্রী'র তৎকালীন সম্পাদক স্বর্গত সজনীকান্ত দাস। সজনীকান্ত তাঁর 'আত্মস্মৃতি' ২য় খণ্ডে, 'বঙ্গশ্রী' সম্পাদনার প্রসঙ্গক্রমে, উপরোক্ত কাহিনীর সঙ্গেই অতিরিক্ত একটু তথ্যও যোগ করেন:

'দ্বিতীয় বৎসরে একটি বিচিত্র উপন্যাস হস্তে তাঁহার [মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়] শুভাগমন ঘটিল। এই উপন্যাসের ক্রমপরিণতির কাহিনীও বিচিত্র।··· লেখাটির পরিণতি সম্বন্ধে তখনও অব্যবস্থিতচিত্ত মানিক "একটি দিন" নামীয় একটি সম্পূর্ণ ছোটগল্পের আকারে উপন্যাসটি উপস্থিত করিলেন। পড়িয়াই বলিলাম, করিয়াছ কি? একটা উপন্যাসের সম্ভাবনাকে এমন ভাবে হত্যা করিবে? বিচলিত মানিক বিদায় লইলেন, আমি "একটি দিন" সম্পূর্ণ গল্পাকারেই ছাপিয়া দিলাম (বৈশাখ ১৩৪১)। অনতিবিলম্বে মানিক "একটি দিনে"র উপসংহার "একটি সন্ধ্যা" লইয়া উপস্থিত হইলেন। "একটি সন্ধ্যা"তেই শেষ হইল না, দুই সংখ্যা পরে সন্ধ্যা "রাত্রি"তে গড়াইল এবং আরও দুই সংখ্যা পরে "রাত্রি"—"দিবারাত্রির কাব্য" হইল। এই উপন্যাসের নাম-পরিবর্তনে মানিকের মনের গঠনের ছাপ আছে।'

'আত্মস্মৃতি' থেকে উল্লিখিত অংশটি সজনীকান্ত নিজেই আরেকবার পাঠকের কাছে উদ্ধৃত করেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর, 'পরিচয়'-পত্রিকার বিশেষ স্মৃতি-সংখ্যায় (পৌষ ১৩৬৩) সজনীকান্ত দাস-প্রণীত লেখকের গ্রন্থপঞ্জির আনুষঙ্গিক তথ্য হিসাবে।

আরো একটি তথ্যের উল্লেখ প্রয়োজন। ১৩৪১ বৈশাখ-সংখ্যা 'বঙ্গশ্রী'র সূচিপত্রে 'একটি দিন' গল্প বলেই উল্লেখিত হয় এবং গল্পের শেষে 'ক্রমশঃ' কথাটিরও উল্লেখ ছিল না। কিন্তু একই সংখ্যার সম্পাদকীয় মন্তব্যে পাঠকদের জানানো হয় :

'উদীয়মান কথাশিল্পী শ্রীযুক্ত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'একটি দিন' গল্পটি আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ হইলেও একটি বৃহৎ গল্পের প্রথম অংশ মাত্র। এই জন্য···বৈশাখে স্বতন্ত্র উপন্যাস সুরু হইল না; 'একটি দিনে'র পরবর্তী গল্প-গুলিই পর পর উপন্যাস হিসাবে প্রকাশিত হইবে।'

উপরোক্ত তথ্যাবলীর সূত্র ধরেই ক্রমে আমাদের কাছে ধরা পড়ে 'দিবারাত্রির কাব্য'র ক্রমপরিণতির ইতিহাসে সেই লুপ্ত চিহ্ন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গবেষক-সমালোচকগণ যা এখনো লক্ষ করেন নি—অন্তত, লক্ষ যে করেছেন তার লিখিত প্রমাণ এখনো পর্যন্ত নেই। 'দিবারাত্রির কাব্য'র ইতিহাসে এখান থেকেই দেখা দেয় এক মৌলিক ও জটিল সমস্যা—সমস্যা বস্তুত একটি নয়, একাধিক; বা, সঠিক অর্থে, একটি মূল সমস্যার সঙ্গে জড়িত একাধিক প্রশ্ন। ঘটনা কি তাহলে এই যে, 'দিবারাত্রির কাব্য' আদিতে ছিল নিতান্ত একটি গল্প, এবং সম্পাদকের পরামর্শক্রমেই সম্পূর্ণ গল্পটিকে ধারাবাহিক উপন্যাসের রূপ দেবার সম্ভাবনা লেখকের মনে প্রথম উঁকি দেয়? সম্পাদকের সাক্ষ্য অন্তত সে-কথাই বলে। সম্পাদক সজনীকান্ত নিশ্চয় সম্পূর্ণ একটি গল্পাকারেই লেখাটি প্রকাশের জন্য পান, এবং বিচক্ষণ সম্পাদকের সংগতভাবেই মনে হয়, 'লেখাটির পরিণতি-

সম্বন্ধে তখনও অব্যবস্থিতচিত্ত' লেখক 'একটি উপন্যাসের সম্ভাবনাকে' না-বুঝেই 'হত্যা' করেছেন।

কিন্তু প্রশ্ন এই যে, মাসিক 'বঙ্গশ্রী'র যে-সংখ্যায় সম্পূর্ণ গল্পাকারে 'একটি দিন' ছাপা হয়, সেই একই সংখ্যায় সম্পাদকীয় মন্তব্যে পাঠকদের জানানো হয়, লেখাটি 'একটি বৃহৎ গল্পের প্রথম অংশ মাত্র' এবং 'পরবর্তী গল্পগুলিই পর পর উপন্যাস হিসাবে প্রকাশিত হইবে'। সম্পাদক নিশ্চয় লেখকের সম্মতিক্রমেই ও-কথা জানান। কিন্তু পরবর্তীকালে সজনীকান্ত তাঁর স্মৃতিকথায় বলেন, 'বিচলিত মানিক বিদায় লইলেন, আমি "একটি দিন" সম্পূর্ণ গল্পাকারেই ছাপিয়া দিলাম'। একই সংখ্যার সম্পাদকীয় ঘোষণায় লেখকের সম্মতি জানানোর অবকাশ তাহলে কোথায়? তবে কি লেখকের সম্মতিবিনাই সম্পাদক নিজ দায়িত্বে পাঠকের কাছে ধারাবাহিক উপন্যাসের প্রতিশ্রুতি দেন, প্রতিশ্রুতি-রক্ষার চাপে একজন প্রতিশ্রুতিবান লেখক যাতে তাঁর প্রথম উপন্যাস লেখায় বাধ্য হন? এ-ক্ষেত্রেও প্রশ্ন থাকে। মাসিক 'বঙ্গশ্রী'র পরবর্তী সংখ্যাতেই ছাপা হয়, সম্পাদকের কথা-অনুযায়ী, 'একটি দিন'-এর উপসংহার 'একটি সন্ধ্যা', কিন্তু মনে রাখা দরকার, উল্লিখিত 'উপসংহার' কোনো অর্থেই প্রথম লেখাটির উপসংহার নয়, এমনকি ঠিক পূর্বানুক্রমিক কাহিনী পর্যন্ত নয়—রূপাইকুড়া-পর্ব শেষ ক'রে হেরম্ব তখন পুরীর পটভূমিকায় আনন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত। মাসিক পত্রিকার পর-পর দু'টি সংখ্যার সংক্ষিপ্ত সময়সীমার মধ্যে, কোনো পূর্বপরিকল্পনা বা দীর্ঘতর প্রস্তুতি ছাড়াই, কাহিনীর এই ভিন্নমুখী ধারা কি কল্পনা করা সম্ভব, বিশেষত এমন একজন লেখকের পক্ষে যিনি তাঁর মূল গল্পের পরিণতি-সম্পর্কে একমাস আগেও 'অব্যবস্থিতচিত্ত' ছিলেন এবং সম্পাদকের হাতে সম্পূর্ণ গল্পাকারেই লেখাটি দিয়ে বিচলিতভাবে বিদায় নেন? প্রতিভা অলৌকিক, এই ধারণায় বিশ্বাস থেকেও এমন আকস্মিকতাকে মেনে নেওয়া সহজ হয় না।

এ-সবই প্রশ্ন,—উত্তর যাঁরা দিতে পারতেন তাঁদের দু'জনেই আজ অনুপস্থিত। কিন্তু ঘটনা এই যে, সংশ্লিষ্ট দু'জনের অন্তত একজন, লেখক নিজে, তাঁর নিজস্ব উত্তর বহু আগেই দিয়েছিলেন। যে-কথা আগেই বলা হয়েছে, 'বঙ্গশ্রী'তে প্রকাশের একবছর পর, গ্রন্থাকারে প্রকাশিত 'দিবারাত্রির কাব্য'র ভূমিকায় লেখক জানিয়েছিলেন, 'দিবারাত্রির কাব্য আমার একুশ বছর বয়সের রচনা।··· কয়েক বছর তাকে তোলা ছিল। অনেক পরিবর্তন করে গত বছর (১৩৪১) বঙ্গশ্রীতে প্রকাশ করি।' 'বঙ্গশ্রী'তে প্রকাশিত পাঠের চেয়েও প্রাচীন একটি সম্পূর্ণ উপন্যাসের অস্তিত্ব তাহলে ছিলই! 'একটি দিন'-নামক রচনাটি হাতে পাবার সময় সম্পাদক সজনীকান্তের তা অবশ্যই জানার কথা নয়। কিন্তু গ্রন্থরূপে প্রকাশিত 'দিবারাত্রির কাব্য'র ভূমিকা কি সজনীকান্ত লক্ষ করেন নি? সজনীকান্তের পক্ষে তা এমনিতেই অস্বাভাবিক মনে হয়; উপরন্তু, 'দিবারাত্রির

কাব্য'-প্রসঙ্গে তাঁর 'আত্মস্মৃতি' থেকে উদ্ধৃতাংশের পরেই সজনীকান্ত লিখেছিলেন, 'এই উপন্যাসটি ব্যক্তিগতভাবে আমার খুব প্রিয়, কারণ ইহার মধ্যবর্তীতায় আমি মানিককে জানিয়াছিলাম।' কিন্তু গবেষক-সমালোচক সজনীকান্তের পক্ষে যা আরো-বেশি অস্বাভাবিক তা এই যে, 'দিবারাত্রির কাব্য' যদিও তাঁর প্রিয় উপন্যাস, তবু 'বঙ্গশ্রী'তে প্রকাশিত উপন্যাসটির পাঠের সঙ্গে গ্রন্থরূপের পাঠান্তর, বৈসাদৃশ্য বা বর্জনের পরিমাণ ও প্রকৃতি, উভয় পাঠের ভিন্নরূপ সমাপ্তি, এইসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোনো আলোচনা বা মন্তব্য, এমনকি উল্লেখ পর্যন্ত, তাঁর 'আত্মস্মৃতি' বা অন্য কোনো রচনায় নেই। সম্পাদক সজনীকান্ত কি তবে 'দিবারাত্রির কাব্য' বলতে শুধুমাত্র 'বঙ্গশ্রী'তে প্রকাশিত উপন্যাসের পাঠটিতেই তৃপ্ত ছিলেন, তাঁরই সম্পাদনাধীন 'বঙ্গশ্রী'র পাঠটি তাঁকে এমনই আবিষ্ট করে যে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত উপন্যাসটি আরেকবার দেখা তাঁর কাছে প্রয়োজনীয় মনে হয় নি? তাঁর সম্পাদনা-পর্বের অন্তবছর পর, তাঁর 'আত্মস্মৃতি' রচনাকালেও, 'দিবারাত্রির কাব্য'-প্রসঙ্গে সম্পাদকের স্মৃতিকথাই তাঁর কাছে একমাত্র মূল্যবান ও নির্ভরযোগ্য মনে হয়। এমনকি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর 'পরিচয়'-পত্রিকার স্মৃতি-সংখ্যায়, লেখকের গ্রন্থপঞ্জির তথ্য সংকলনেও সজনীকান্ত এই একবারমাত্র তাঁর গবেষকের ভূমিকাকে উপেক্ষা ক'রে সম্পাদকের স্মৃতিকথাই পুনরায় উদ্ধার করেন। 'দিবারাত্রির কাব্য' উপন্যাসের লেখকের ভূমিকাও একইভাবে উপেক্ষিত থেকে যায়।

এখান থেকেই দেখা দেয় একটি ভিন্নতর সমস্যা। 'দিবারাত্রির কাব্য'র ইতিহাস-প্রসঙ্গে সজনীকান্ত দাস আমাদের যতটুকু জানান, তার চেয়ে বেশি-কিছু যেহেতু আর-কেউ জানান না, সজনীকান্তের বিবরণ-অনুযায়ী তাই এ-কথাই ক্রমে প্রচারিত হতে থাকে, 'এই উপন্যাসের ক্রমপরিণতির কাহিনীও বিচিত্র'। প্রকৃতপক্ষে, 'দিবারাত্রির কাব্য'র ক্রমপরিণতির কাহিনী যে ঠিক সজনীকান্তের বর্ণনামতো ততটাই বিচিত্র নয় কিন্তু ভিন্ন অর্থে বিচিত্রতর, সম্পূর্ণ তথ্যের অভাবে বা অসম্পূর্ণ তথ্যের আড়ালে এই সত্য অন্তদিকে ক্রমেই চাপা পড়ে যেতে থাকে। সজনীকান্ত, অপরপক্ষে, আরেক রকম বিপদ ঘটান। তাঁর কাহিনীটুকুই কখনো-বা এমন এক সিদ্ধান্তের দিকে আমাদের প্ররোচিত করে, যে-সিদ্ধান্ত শুধু 'দিবারাত্রির কাব্য' নয়, সমগ্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পস্বভাব ও সৃষ্টিপ্রক্রিয়া সম্পর্কেই এক সাধারণ সত্যের প্রতিষ্ঠা পায়। অন্তত একজন সমালোচক, শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর 'পরিচয়'-পত্রিকার স্মৃতি-সংখ্যায়, 'দিবারাত্রির কাব্য'র আলোচনা-প্রসঙ্গে সজনীকান্তের সাক্ষ্য মেনেই বলেন :

> 'এ কাহিনীর জন্ম ও বিকাশ, ভাঙা-গড়ার ইতিহাস (শ্রীসজনীকান্ত দাসের 'আত্মস্মৃতি' ২য় খণ্ডে তা লিখিত হয়েছে) জানলে বেশ বুঝা যায়—মানিকের

প্রতিভা তাঁকে আশ্রয় করে কিভাবে এ কাহিনীর কথা-অংশ গড়ে তুলেছে। কিভাবে তার রূপ-রীতি নির্ণীত করে ফেলেছে। মানিকের শিল্পীসত্তা আত্মসচেতন না হয়ে আত্মনিবেদনেই দুর্জয় শক্তির অধিকারী।'

শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার কিন্তু এ-কথাও বলেন যে, 'দিবারাত্রির কাব্য'র 'নিবেদনাংশটুকুকে সযত্নে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন'। তবে বিশ্লেষণ ক'রে তিনি দেখতে পান, 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সচেতনভাবে তাঁর রচনার গোষ্ঠীবিচারে কত অসমর্থ'। তাঁর সিদ্ধান্ত যাতে আমাদের কাছে বোধগম্য মনে হয়, তাই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে তাঁর আলোচ্য রচনার মুখবন্ধে তিনি বলে রাখেন, 'এ প্রতিভা আত্মসচেতন প্রতিভা নয়, আত্মবিচার ও আত্মগঠন এ প্রতিভার ধর্ম নয়'। তাঁর রচনাটির নামও 'মানিক-প্রতিভা'।

মুশকিল এই যে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর 'মানিক-প্রতিভা' নামক কোনো রচনার লেখক নিশ্চয় এ-কথাই বলতে চান যে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একজন বড় লেখক। কিন্তু ঘটনা এই যে, লেখকের উপরোক্ত প্রস্তাব ও পরবর্তী সিদ্ধান্ত, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে, শেষপর্যন্ত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেই চলে যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে সমালোচনার এই দুর্ঘটনা বারংবার ঘটে, তাঁর লেখকজীবনের প্রায় আদি পর্ব থেকেই ঘটে। বঙ্গাব্দ ১৩৪৭-এর 'পরিচয়'-পত্রিকায় স্বর্গত ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত রচনাটি এ-জাতীয় দুর্ঘটনার সম্ভবত প্রথম দৃষ্টান্তস্থল—ধূর্জটিপ্রসাদের নিম্নোক্ত মন্তব্যের মধ্যেই শ্রীযুক্ত গোপাল হালদারের পূর্বোক্ত বক্তব্যের পূর্বাভাস পাওয়া যায় :

'তাঁর কৃতিত্ব অশিক্ষিতপটুতা। অন্য ভাষায়, তাঁর প্রতিভা স্বতঃসিদ্ধ।'

বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিভাবিচার এভাবেই তাঁর আবির্ভাব ও প্রস্থানের দুই প্রান্তে একসূত্রে গ্রথিত হয়।

৩

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস 'দিবারাত্রির কাব্য'র ক্রমপরিণতির কাহিনী-প্রসঙ্গে সজনীকান্ত দাসের স্মৃতিকথা উল্লিখিত দুর্ঘটনারই আরেকবার প্রয়োজনা যোগায়। আকস্মিকভাবেই তাঁর প্রথম গল্প রচনার মতোই, একইরূপ আকস্মিকতার প্রেরণায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রথম উপন্যাসের রচয়িতা হিসাবে আমাদের সমালোচনা-সাহিত্যে এতকাল প্রতিষ্ঠিত থাকেন। কিন্তু যেকোনোপ্রকার আকস্মিকতার ধারণা যেমন, প্রকৃতপক্ষে, আমাদের অসম্পূর্ণ ও অপরিচ্ছন্ন জ্ঞান বা সম্পূর্ণ অজ্ঞানতারই নামান্তর, ইতিহাস যেমন শেষপর্যন্ত ধারাবাহিকতাকেই প্রমাণ করে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেও, যেনবা এইরূপ প্রমাণের প্রয়োজনেই, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ব্যক্তিগত কাগজপত্রের মধ্যে

আবিষ্কৃত হয় 'দিবারাত্রির কাব্য'র কিছু ছিন্নভিন্ন বিক্ষিপ্ত পাণ্ডুলিপি—এই সেই আদিতম লিখনের শোচনীয় অবশেষ, লেখকের একুশ বছর বয়সের সেই প্রাক্তন রচনার লুপ্ত চিহ্ন, তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দিবারাত্রির কাব্য'র ভগ্নাংশপ্রায় প্রথম পাঠ, গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক নিজেই যে আদি উপন্যাসটির উল্লেখ করেছিলেন, কয়েক বছর তাকে তুলে রেখে অনেক পরিমার্জনার পর যা তিনি 'বঙ্গশ্রী'তে প্রকাশের জন্য দেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েরই সৌভাগ্য, তাঁর প্রথম উপন্যাসের জীর্ণপ্রায় আদি পাঠ অতিশয় বিক্ষিপ্তভাবেও অবশেষে আমাদের হাতে আসে—এটুকু প্রমাণের অভাবেই 'দিবারাত্রির কাব্য'র লেখকের ভূমিকা এতকাল আমাদের কাছে লক্ষণীয় মনে হয় নি। বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে এমন প্রমাণেরও প্রয়োজন ঘটে।

শোচনীয় সন্দেহ নেই যে, 'দিবারাত্রির কাব্য'র বর্তমান আদি পাণ্ডুলিপি মূল উপন্যাসটির অতি সামান্য অংশের চেয়ে বেশি কিছু নয়—পাণ্ডুলিপির মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা একচল্লিশ, তা-ও ধারাবাহিকতাহীন, বিক্ষিপ্ত একচল্লিশটি পৃষ্ঠা মাত্র। এরই মধ্যে প্রথম তিনটি পৃষ্ঠা, ২ ও ৫০-৫১ পৃষ্ঠাঙ্কযুক্ত পৃষ্ঠা তিনটি, উপন্যাসটির প্রচলিত পাঠের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তবে এক্ষেত্রেও পাঠভেদ বিস্তর এবং দীর্ঘ একটি অংশ মূল গ্রন্থে নেই। পাণ্ডুলিপির অবশিষ্ট আটত্রিশটি পৃষ্ঠাই, বস্তুত, 'দিবারাত্রির কাব্য'র আদিতম রূপের ভগ্নাবশেষ। আদি উপন্যাসের প্রথমাংশই পাওয়া যায় নি,—পাণ্ডুলিপির প্রথম পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬৭, বাকি পৃষ্ঠাগুলি আদি উপন্যাসের ছিন্নভিন্ন বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন অংশ। 'দিবারাত্রির কাব্য'র এই আদিতম রূপটি পরিচ্ছেদ-সংখ্যার দ্বারা বিন্যস্ত এবং শেষ পরিচ্ছেদ-সংখ্যা, অতিরিক্ত একটি পরিশিষ্ট-সহ,* ত্রয়োদশ। সৌভাগ্যের বিষয়, ১২১-১৩৬ পৃষ্ঠাঙ্কযুক্ত ধারাবাহিক ষোল পৃষ্ঠা-ব্যাপী দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ এবং পরিশিষ্টটি, কাহিনীর সমাপ্তিসহ সম্পূর্ণই বর্তমান। শেষ পৃষ্ঠাঙ্ক অনুসারে বলা চলে, আদি উপন্যাসটি খুব দীর্ঘ ছিল না।

'দিবারাত্রির কাব্যর প্রচলিত রূপের সঙ্গে তার আদি পাঠের একটি বিশেষ পার্থক্য এই যে, আদি উপন্যাসটি সাধু ভাষায় রচিত। পাঠকমাত্রই জানেন, প্রচলিত 'দিবারাত্রির কাব্য' চলিত-ভাষায় লেখা ; জানানো ভালো যে, 'বঙ্গশ্রী'র পাঠটিও তা-ই। আরেকটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য, আদি পাণ্ডুলিপি ও বর্তমান গ্রন্থের সমাপ্তি এক নয়—পাণ্ডুলিপির সমাপ্তিটি বরং 'বঙ্গশ্রী'র পাঠের অনুরূপ। আগেই বলা হয়েছে, 'বঙ্গশ্রী'র পাঠ ও উপন্যাসটির গ্রন্থরূপ, এই উভয়পাঠের সমাপ্তি সম্পূর্ণই ভিন্ন। অপরপক্ষে, পাণ্ডুলিপির সমাপ্তির সঙ্গে 'বঙ্গশ্রী'র পাঠেরও ঈষৎ পার্থক্য দেখা যায়—পাণ্ডুলিপির কাহিনীর অতিরিক্ত পরিশিষ্টটি 'বঙ্গশ্রী'র পাঠে নেই।

প্রচলিত 'দিবারাত্রির কাব্য' তথা 'বঙ্গশ্রী'র পাঠের মূল চরিত্রগুলি আদি

উপন্যাসেও উপস্থিত। লক্ষণীয় শুধু এই যে, প্রচলিত গ্রন্থের সুপ্রিয়া, আদি উপন্যাসে, সরসী। অন্যদিকে, মালতীবৌদি ও অনাথ, আদি কাহিনীতে আগাগোড়াই যথাক্রমে মাতাজী ও স্বামিজী নামে উল্লেখিত; তবে মাতাজীর লাংসারিক নাম যে মালতী, একটিবার তার উল্লেখ আছে। ছোটখাটো দু'-একটি অতিরিক্ত চরিত্র আদি উপন্যাসে দেখা যায়, পরবর্তী দু'টি পাঠে যারা বিদায় নিয়েছে। কাহিনীর বিস্তার ও চরিত্রবিন্যাসেও আদি উপন্যাসের সঙ্গে পরবর্তী দু'টি পাঠেরই পার্থক্য বিস্তর। আদি পাণ্ডুলিপির উপাখ্যান-অংশ অনেক-বেশি প্রাকৃত ও অধিকতর লৌকিক; বাস্তবতার অপেক্ষাকৃত আপাত-স্তরে আদি কাহিনীটি সংস্থাপিত। পাণ্ডুলিপির যেটুকু অংশ পাওয়া যায়, তাতে বর্তমান 'দিবারাত্রির কাব্য'র অনিবার্য রূপক ও অমোঘ প্রতীকতা তখনো পর্যন্ত সুপ্ত থাকে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস 'দিবারাত্রির কাব্য'র স্বতন্ত্র পাঠ তাহলে দু'টি নয়, তিনটি। আদি পাণ্ডুলিপি, 'বঙ্গশ্রী'র পাঠ ও বর্তমান গ্রন্থ—'দিবারাত্রির কাব্য'র ক্রমপরিণতির কাহিনী এই তিনটি স্তরে বিন্যস্ত। এই ক্রমবিবর্তনের লুপ্ত চিহ্নটি খুঁজে পাবার পর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাসের জন্মকাহিনী আজ সম্পূর্ণ হল বলা যায়।

'দিবারাত্রির কাব্য'র প্রথম পাঠের সূত্র ধ'রে আজ অনুমান করা যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর একুশ বছর বয়সে রচিত প্রথম উপন্যাসের আদি পাণ্ডুলিপি চার বছর ফেলে রাখার পর পরিমার্জনায় হাত দিয়ে, সমগ্র উপন্যাস থেকে শুধু 'একটি দিন'-নামীয় অংশটিকে একটি সম্পূর্ণ গল্প হিসাবে প্রকাশের উপযোগী ক'রে ছেঁকে তোলেন—অবশিষ্ট উপন্যাসটি তখনকার মতো তাঁর কাছে নিষ্প্রয়োজনীয় মনে হয়। মনে রাখা দরকার, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখক-জীবনের এই চারবছর, 'দিবারাত্রির কাব্য'র আদি লিখন থেকে 'বঙ্গশ্রী'-পত্রিকায় 'একটি দিন' প্রকাশের মধ্যবর্তী সময়, ১৯২৯ থেকে ১৯৩৪, এরই মধ্যবর্তী চারটি বছর লেখক হিসাবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিক্রান্ত পরিণতির সময়কাল। এই সময়কালের মধ্যেই, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মতো প্রচণ্ড কোনো অভিজ্ঞতার প্রাণান্তক চাপে, তিনি একে-একে রচনা করেন 'সর্পিল','সরীসৃপ', 'আত্মহত্যার অধিকার','প্রাগৈতিহাসিক'—তাঁর প্রথমজীবনের প্রসিদ্ধ গল্পগুলি, এবং 'একটি দিন' যখন 'বঙ্গশ্রী'-পত্রিকার প্রকাশের জন্য প্রস্তুত, 'পদ্মানদীর মাঝি' ততদিনে সম্পূর্ণ হয়ে যায়—১৯৩৪ সালেই মাসিক 'পূর্বাশা'য় 'পদ্মানদীর মাঝি'র ধারাবাহিক প্রকাশ শুরু হয়। অন্যদিকে, 'একটি দিন' প্রকাশিত হবার আগেই নিশ্চয় 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র অন্তত প্রাথমিক রূপটি পরিকল্পিত হয়ে যায়, এবং 'বঙ্গশ্রী'তে 'একটি দিন'-এর পরবর্তী গল্পগুলির প্রকাশকালের মধ্যেই

'পুতুলনাচের ইতিকথা'র চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি অবশ্যই প্রস্তুত হতে বাধ্য, কারণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪১-এর পৌষ-সংখ্যা 'বঙ্গশ্রী'তে 'দিবারাত্রির কাব্য' যেমন সমাপ্ত হয়, একই বছরের পৌষ-সংখ্যা থেকেই 'ভারতবর্ষ'-পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে শুরু হয় 'পুতুলনাচের ইতিকথা'।

মনে রাখা দরকার, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পরিণতির এই পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁর প্রথম উপন্যাসটির সংস্কারকার্যে হাত দেন। 'দিবারাত্রির কাব্য'র আদি পাণ্ডুলিপির যেটুকু অংশ আমাদের হাতে আসে, সেটুকু থেকেই বলা যায় যে, আদি উপন্যাসটিকে সেই আদিম অবস্থাতেই প্রকাশ করা তখন আর তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না—এমনকি, নিছক উপাখ্যান হিসাবে সম্পূর্ণ উপন্যাসটিও তখন আর তাঁর কাছে প্রয়োজনীয় ছিল না। 'দিবারাত্রির কাব্য'র আদি পাণ্ডুলিপি থেকে তাই তিনি সযত্নে আহরণ করেন 'একটি দিন'-নামক একটি পরিশুদ্ধ রূপ, প্রথম উপন্যাসটির আদি কল্পনার সঙ্গে যার সম্পর্ক সুদূর। 'বঙ্গশ্রী'র সম্পাদক হিসাবে সজনীকান্ত দাস যখন 'একটি দিন' প্রকাশের জন্য পান, তখন এতসব তাঁর অবশ্যই জানার কথা নয়। কিন্তু এরই এক বছর পর, গ্রন্থাকারে প্রকাশিত 'দিবারাত্রির কাব্য'র ভূমিকা থেকে অনুমান করা যেত যে, 'একটি দিন' বস্তুত পূর্বাপরসম্বন্ধহীন কোনো স্বয়ম্ভু কাহিনী নয়, প্রাক্তন একটি কাহিনী থেকেই শুদ্ধতার প্রেরণায় তা উৎপন্ন হয়েছিল। সম্পাদক তাই সহজেই গল্পটির মধ্যে একটি উপন্যাসের সম্ভাবনা আবিষ্কার করেন এবং লেখককে জানান। লেখক যদিও বিচলিতচিত্তে বিদায় নেন, তবু তার কারণ এই নয় যে, একটি উপন্যাসের সম্ভাবনাকে তিনি না-বুঝেই হত্যা করেছেন—উপন্যাসটি তো আগে থেকেই ছিল। পরিত্যক্ত উপন্যাসটিকে পুনরায় পরিমার্জনার হাত দিয়ে, 'বঙ্গশ্রী'র পরের সংখ্যায় 'একটি সন্ধ্যা'র আবির্ভাব ঘটানো তাই লেখকের পক্ষে কঠিন হয় না ; সন্ধ্যা অনায়াসে 'রাত্রি'তে গড়ায় এবং 'রাত্রি' অনিবার্যভাবে 'দিবা-রাত্রির কাব্য'র রূপ গ্রহণ করে। কিন্তু সম্পূর্ণ 'দিবারাত্রির কাব্য'র জন্ম তাতেও সম্ভব হয় নি। লেখকের ভূমিকার ইঙ্গিত এড়িয়ে সজনীকান্ত দাস যেমন একদিকে আদি কাহিনীকে উপেক্ষা করেন, অন্যদিকে 'বঙ্গশ্রী'র পাঠ থেকে গ্রন্থের পরিণতি অনুসরণ না-করেই মধ্যপথে থেমে যান। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে-উপন্যাসটিকে সজনীকান্ত তাঁর প্রিয় উপন্যাস মনে করেন, প্রকৃতপক্ষে, তা আমাদের পরিচিত 'দিবারাত্রির কাব্য'র উৎস থেকে উৎসার অবধি এক দীর্ঘ ইতিহাসের মধ্যবর্তী ধারা মাত্র। লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে তখনো তা একপ্রকার অবকাশযাপন—কবিতা ও কাহিনীর দ্বন্দ্বময় দ্বৈতে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম ও অভিনব রূপক কাহিনী রচনার শক্তি ও সাহস তিনি ইতিমধ্যে অর্জন করেন।

দেখা যায়, দিন-রাত্রি-সন্ধ্যার একটি ছায়াপ্রতিম, ক্ষীণ ও অসম্পূর্ণ সময়প্রতীক 'দিবারাত্রির কাব্য'র আদি পাণ্ডুলিপিরও একটি অংশে অস্ফুট রূপকের মতো কাজ করে :

'প্রথমে শেষ অপরাহ্ণ তারপর গোধূলি তারপর সন্ধ্যা এবং রাত্রি। বিশেষভাবে সচেতন থাকিয়াও তিনটি সন্ধিক্ষণের একটিকেও হেরম্ব ধরিতে পারে নাই। গোধূলি যখন আসিল অপরাহ্ণ তখন নাই, সন্ধ্যাকে পাইয়া গোধূলির সন্ধান ভুলিতে হইল। সন্ধ্যাই রাত্রি।

জীবনও নাকি এইপ্রকার। প্রৌঢ় ব্যক্তিরা বলিয়া থাকেন।' (আদি পাণ্ডুলিপি, পৃষ্ঠাঙ্ক ৬৫।)

কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, 'দিবারাত্রির কাব্য'র অসংস্কৃত আদি কাহিনীর আপেক্ষিক আদিমতার মধ্যেই আমাদের কাছে থেকে-থেকে দেখা দেন নির্মল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়—আমাদের সাহিত্যের প্রথম আধুনিক ঔপন্যাসিক, কোনো-কোনো অর্থে বাংলা ভাষার প্রথম ঔপন্যাসিক। অন্তত, কাহিনী যখন প্রায় সমাপ্তির দিকে এগোয়, আমরা স্পষ্টই দেখি :

'রোগটা হেরম্বের এবং অবশ্যই সংক্রামক কিন্তু আনন্দের পক্ষে নয়, তাহার অসুখ-মৌলিক।' (আদি পাণ্ডুলিপি, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।)

বাংলা সাহিত্য এই 'মৌলিক অসুখ' তবে ১৯২৯-এই প্রথম দেখা দেয়, লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বয়স যখন সবেমাত্র এক ! জীবনানন্দের বিপন্ন বিস্ময়ের মতো, এই মৌলিক অসুখ আমাদের অজ্ঞাতসারেই এর পর বহুবার আমাদের চৈতন্যকে আক্রমণ করে। অন্যদিকে, কাম্যু এবং সার্ত্র-এর প্রথম উপন্যাসের যথাক্রমে বারো ও আট বছর আগে একদিন, আমাদের উপন্যাস-সাহিত্যের প্রথম আধুনিক নায়ক হেরম্ব দেখে :

'সন্ধ্যার পর চাঁদ উঠিল। কত অপোগণ্ড শিশু নরনারী এই চাঁদের আলোয় পরস্পরের গালে চুমা দিতেছে কে জানে? মেয়েটির গলায় নকল মুক্তার মালা —তারই চিঠি পাওয়ার আনন্দে সাইকেল হইতে পড়িয়া ছেলেটির হাত ভাঙিয়াছে। হাঁটু কাটিয়া রক্তারক্তি। ওরা বাঁচিয়া থাক্। ওরা সাধারণ ওরা স্বাভাবিক, জগতে ওরা সব চেয়ে দামী। লোহ ব্যবসায়ীর সংঘম ওদের, দৃঢ়, কঠিন, নীরস ; —বছরে একটির বেশী খোকাও নয়, খুকীও নয়।

একটু অধরসুধা খাইয়া আজ ওরা উপবাস করিবে, কারণ আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। না, সেজন্য নয়, ক্ষুধা পায় নাই বলিয়া। কালের জন্য ওদের ভুঁড়িভোজনের ব্যবস্থা।' (আদি পাণ্ডুলিপি, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।)

কিন্তু এ শুধু দেখাই নয়, চূড়ান্ত 'দিবারাত্রির কাব্য'র হেরম্ব যে-কারণে

'সমারোহের সঙ্গে দিনের পর দিন নিজের এই অস্তিত্বহীন অস্তিত্বকে' বহন করে, এ তারই প্রস্তুতি :

'হেরম্বের কপালের একটা শিরা দপ্ দপ্ করিতেছিল—ইঞ্চিখানেক ভিতরে, মগজ ঘেঁষিয়া। বিধবা মেয়ের মত আলোচালের ভাতের সঙ্গে জীবনের সমস্ত রঙ্ সে পেটের মধ্যে চালান করিয়া দিয়াছে, চোখে তাই সব যেন কেমন ঝাপসা ঠেকিতেছে।' (আদি পাণ্ডুলিপি, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।)

এবং এরও কিছু আগে :

'...নিজেকে হেরম্বের বড়ই পুরাতন মনে হইতে লাগিল। বহুকাল কে যেন কি দিয়া তাহাকে ব্যবহার করিয়াছে।' (আদি পাণ্ডুলিপি, পৃষ্ঠাঙ্ক ১১২-১১৬।)

বিশ শতকের মধ্যবিশ দশকের পরবর্তী পৃথিবীর অর্থনৈতিক সংকট এবং বিশ্বাসনাশক দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী শূন্যতায় বাঙালী মধ্যবিত্তের সমাজমানসিক প্রতিক্রিয়া, তার বিপন্ন অস্তিত্ব, হৃদয় ও মস্তিষ্কের মৌলিক বিচ্ছেদ, আমাদের সাহিত্যে এই প্রথম ছায়া ফেলে। 'দিবারাত্রির কাব্য'র পরবর্তী দু'টি পাঠের তুলনায় আদি পাণ্ডুলিপির কাহিনীতে সেই ছায়া একটু বেশি গাঢ় ও অশুভ মনে হয়। বস্তুত, এক অমঙ্গলের ছায়া আদি কাহিনীর সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। সমুদ্রতটের বিপুল উন্মুক্ততায়, প্রাচীর-ঘেরা আশ্রমের নির্জন আবেষ্টনীতে, হেরম্বের চূড়ান্ত অভিজ্ঞতার জগৎ যদিও 'দিবারাত্রির কাব্য'র তিনটি পর্যায়েই মূলত এক, তবু প্রাক্তন কাহিনীর এই জগৎটি ঠিক ততটাই নির্জন বা বিশুদ্ধ নয়, লৌকিক সংসারের যাতায়াত তখনো অক্ষুণ্ণ থাকে, মাতাজীর কাছে শান্তি ও আশ্রয়ভিক্ষায় সশরীরে আসে জাগতিক নশ্বরতার সেইসব প্রতিনিধি, যারা রোগাক্রান্ত, দুঃখময়, নিরুপায়, নিরবলম্ব। রোগাক্রান্ত হেরম্ব নিজেও, এবং রোগটা 'অবশ্যই সংক্রামক'। আনন্দের প্রেমের মৌলিক অসুখ থেকে তার ক্ষয় সম্পূর্ণ হবার আগেই হেরম্ব বোঝে :

'আনন্দের ভয়ও নাই, ভালবাসাও নাই। জীবনে হারাইবার মত কি তাহার আছে? ওর ওই সুন্দর শরীর ঠাণ্ডা, মৃত মাংস দিয়া তৈরী। জন্মের পূর্ব্বেই ওর প্রত্যেকটি তন্তু মাটির অধিকারে।' (আদি পাণ্ডুলিপি, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।)

এমনকি, হেরম্বের স্বেচ্ছা-নির্বাসনের অপেক্ষাকৃত প্রাকৃত জগৎটিও প্রকৃত অর্থেই অ-সুস্থ, অ-স্বাভাবিক। এই অতি-বাস্তব জগতের অধিষ্ঠাত্রী মাতাজী যখন কারণ-পান আরম্ভ করেন, হেরম্ব রীতিমত প্রসাদ পায়। হেরম্ব বলে, 'কারণ অতি উত্তম পদার্থ, মাতাজী।'

'মাতাজী মুখ বাঁকাইয়া বলেন, 'আর মেয়েমানুষ?' 'হা হাঃ, মেয়েমানুষ কি পদার্থ? মেয়েমানুষ—'অর্থাৎ মেয়েমানুষ অপদার্থ, হেরম্ব এই রসিকতাটুকু করিতে চায়, কিন্তু মাতাজী কাপড় তুলিয়া জঙ্ঘা চুলকাইতে আরম্ভ করিয়াছেন দেখিয়া আর সাহস পায় না, ওইখানে ইতি করে। ...মাতাজীর মুখ দিয়া

আজকাল গলগল করিয়া যে গরল বাহির হয়, সে সহ্য করিবার ক্ষমতা হেরম্বের নাই।' (আদি পাণ্ডুলিপি, দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।)

আমাদের পরিচিত 'দিবারাত্রির কাব্য' অভ্যস্ত পাঠকের অভিজ্ঞতা হয়ত আহত হয়, কিন্তু আদি পাণ্ডুলিপির প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকার থেকে এইসব গুহাচিত্র আজ আর আমাদের ততটাই ভীত করে না—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পরবর্তীকালের রচনায় এই অন্ধকার বহুবার স্পর্শ করেন। বরং এমন কথাও হয়ত বলা চলে, আদি পাণ্ডুলিপি থেকে 'বঙ্গশ্রী'র পাঠ, 'বঙ্গশ্রী'র পাঠ থেকে চূড়ান্ত গ্রন্থ, 'দিবারাত্রির কাব্য'র এই পর্যায়ক্রমিক শুদ্ধতার প্রক্রিয়া বিনিময়ে এমন কিছু হারায়, যা চূড়ান্ত গ্রন্থের শিল্পগত সিদ্ধিতেও পূরণ হয় না। অন্তত, আদি 'দিবারাত্রির কাব্য'র শেষ অধ্যায়ে আনন্দের অন্তিম নৃত্যের কল্পনাটি আমাদের কাছে অপূরণীয় মনে হয়। আজ মনে হয়, আদি পাণ্ডুলিপির তুলনায়, মূল গ্রন্থ তথা 'বঙ্গশ্রী'র পাঠের এই নৃত্যকল্পনা অনেকটাই আলংকারিক —শেষোক্ত দু'টি পাঠে আনন্দ নিজেই যে-নৃত্যের নাম দেয় 'পরীনৃত্য'। তুলনামূলক পাঠের সুবিধার জন্য প্রচলিত গ্রন্থ থেকে আমাদের পরিচিত অংশটি প্রথমেই উদ্ধৃত করা প্রয়োজন :

'খানিকক্ষণ আগুনের সান্নিধ্যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে একে একে কাপড়-জামা খুলে আনন্দ অর্ঘ্যের মতো আগুনে সমর্পণ করে দিল। তার গলায় সোনার হারে তাবিজ ছিল, বাহুতে তুলসীর মালা ছিল, হাতে ছিল সোনার চুড়ি। একে একে খুলে তাও সে আগুনে ফেলে দিল। নিরাবরণ ও নিরাভরণ হয়ে সে যে কি নৃত্য আজ দেখাবে হেরম্ব কল্পনা করে উঠতে পারল না।' (লেখাপড়া সংস্করণ, ১৩৭৪। পৃ. ১৭১)

এরই পাশাপাশি, আদি পাণ্ডুলিপির পাঠটি এইরূপ :

'হেরম্বকে ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া আনন্দ তার আলখাল্লা মেরজাই জামিয়া সব খুলিয়া ঘরের কোণে ছুড়িয়া ফেলিল। একটা ডিবরি কাত হইয়া তাহাতে আগুন ধরিয়া গেল কিন্তু সে তাকাইয়াও দেখিল না। কি নাচ সে নাচিবে সেই জানে, নগ্নতার সম্পূর্ণতার জন্য দক্ষিণ বাহুর রুদ্রাক্ষের অনন্তটি পর্য্যন্ত সে গায়ে রাখিল না।'

'একটা ডিবরি কাত হইয়া তাহাতে আগুন ধরিয়া গেল'—আনন্দের পক্ষে তার পরিত্যক্ত পোষাকে পুনরায় প্রবেশ করা এভাবেই অসম্ভব হয়ে পড়ে। এক নূতন পুরাণের জন্ম প্রায় আসন্ন মনে হয়।

'তারপর হেরম্বের মনে হইল আনন্দ যেন একটি বিচ্ছিন্ন অগ্নিশিখা,—সদ্য সদ্য জন্ম লাভ করিয়া জননীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। দুই বাহু বক্ষে ন্যস্ত, সর্ব্বাঙ্গে গতির স্বচ্ছ আবরণ, আগুনে মিশিয়া যাইবে বলিয়া আগুনের দিকেই যেন হেলিয়া রহিয়াছে।'

কিন্তু, 'নাচ থামিল হঠাৎ'। কাহিনী এবার তার অনিবার্য পরিণতির দিকে এগোয়। কিন্তু তারও আগে, আনন্দের নাচের সমারোহের প্রয়োজনে যে-আগুন হেরম্ব নিজ হাতে জ্বালায়, সে-আগুন হেরম্বকেই নেভাতে হয় :

'বালতি বালতি জল নিয়া হেরম্ব দূর হইতে আগুনের মধ্যে ঢালিয়া দিতে লাগিল। আগুন কি সহজে নিভিতে চায়! আগুন গর্জন করে, জল বাষ্পে পরিণত হয়, ছাই ওড়ে আর উৎকট দুর্গন্ধে ঘর ভরিয়া যায়। শেষ শিখাটি যখন পরাজয় মানিল, ঘর শ্মশানের মত কদর্য্য হইয়া উঠিয়াছে।

ছাই কয়লা আর পোড়াকাঠ। পোড়াকাঠ কয়লা আর ছাই।'

পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে, বিশেষত তিরিশের যুগের বাংলা কবিতায়, ওই ছ'ই কয়লা আর পোড়াকাঠ আমাদের চেতনাময় জীবনধারণের বহুদূর সীমা পর্যন্ত তার অধিকার বিস্তার করে। শুধু এই অর্থে নয়, এক সামগ্রিক অর্থেই, 'দিবারাত্রির কাব্য'র আদি পাণ্ডুলিপি আজ আমাদের কাছে এমন এক ভবিষ্যৎবাণী, প্রকাশ্যে উচ্চারিত হবার বহু আগেই যা সফল হয়েছিল বলে এতকাল পরে জানা যায়।

প্রচলিত 'দিবারাত্রির কাব্য'র সমাপ্তিটি আমাদের সকলেরই জানা। 'বঙ্গশ্রী'র পাঠ তথা আদি পাণ্ডুলিপির কাহিনীতে, আগুনের হাতে নয়, অন্ধকার সমুদ্রের জলে আনন্দ নিজেকে সমর্পণ করে। হেরম্ব তাকে অনুসরণ ক'রে সমুদ্রে নেমে যায়। কিন্তু এইখানে, 'বঙ্গশ্রী'র পাঠের সঙ্গে আদি পাণ্ডুলিপির পার্থক্য, ঘটনার দিক থেকে সামান্য হলেও, পরিণামে মৌলিক।

'বঙ্গশ্রী'র পাঠ :

'এমন করে পালিয়ে আসে? চল আনন্দ, এবার ফিরে যাই।'

'তুমি ফিরে যাও। আমার ঘুম পাচ্ছে। কেন বিরক্ত করতে এলে?'

হেরম্ব আনন্দকে ধরবার চেষ্টা করল। আনন্দ ডুব দিয়ে তার হাত ছাড়িয়ে কোথায় যে আবার ভেসে উঠল অন্ধকার উত্তাল সমুদ্রের বুকে হেরম্ব আর সন্ধান করে উঠতে পারল না।'. (সমাপ্ত)

আদি পাণ্ডুলিপি :

'এবার ফিরি চল, আনন্দ।'

আনন্দ আলগোছে ভাসিতেছিল, বলিল, 'আমার বড় ঘুম পাচ্ছে।'

'বাড়ী গিয়ে ঘুমোবে। চলো ফিরে যাই। আমায় ধরো।'

আনন্দ কোন জবাব দিল না। হেরম্ব বড় বিরক্ত [বোধ] করে। তাহার এমন ঘুম পাইয়াছে!

নিঃশব্দে ডুব সাঁতার দিয়া সে দূরে সরিয়া গেল।'

[illegible] অন্ধকার সমুদ্রে সন্ধান রেখে হেরম্বের নিঃশব্দ ডুবসাঁতার

অভাবনীয় মনে হয়, এবং কাহিনীর এই সমাপ্তির পরও আদি পাণ্ডুলিপির অতিরিক্ত পরিশিষ্টটি আজও কোনো অগ্রবর্তী নবীন লেখকের কাছে স্মরণীয় মনে হতে পারে।

আদি পাণ্ডুলিপি থেকে পরিণত রূপ পর্যন্ত 'দিবারাত্রির কাব্য'র শুদ্ধতার প্রক্রিয়া বুঝে নেবার জন্যই 'দিবারাত্রির কাব্য'র আদি পাণ্ডুলিপি আজ আমাদের কাছে একমাত্র প্রয়োজনীয় নয়; সমস্তপ্রকার অসম্পূর্ণতা নিয়েই, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম জীবনের একটি স্বতন্ত্র রচনা হিসাবেও এই পাণ্ডুলিপি আমাদের কাছে মূল্যবান। একইসঙ্গে, 'দিবারাত্রির কাব্য'র তিনটি স্বতন্ত্র পাঠের সামান্য তুলনামূলক আলোচনা থেকে আজ শেষপর্যন্ত আমাদের পক্ষে বুঝে নেওয়া কঠিন হয় না, কেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রথম উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি কয়েক বছর ফেলে রাখেন, কি কারণে পরিমার্জনার হাত দিয়ে পর্যায়ক্রমে তিনি তার শুদ্ধতম রূপটির সন্ধান করেন। অন্যদিকে, 'দিবারাত্রির কাব্য'র ক্রমপরিণতির পর্যায়ক্রমিক ইতিহাস, তিনটি স্বতন্ত্র পর্যায়ের আপেক্ষিক উত্থান-পতনের মধ্য দিয়েই, ধারাবাহিক ও নিরবচ্ছিন্ন। লক্ষণীয় শুধু এই যে, এই পরিণতির ইতিহাস অমন সহজেই সাধিত হয় না। গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক ইঙ্গিত দেন, কিন্তু বলা সম্ভব নয় বলেই বলেন না, কিভাবে সময়প্রবাহে স্থাপিত এক মায়াময় কাহিনী, তার আদিতম নক্সার রেখামাত্র আভাস থেকে, ক্রমে এক বর্ণময় ঘনবদ্ধ ত্রিমাত্রিক চিত্রে অর্পিত হয়, কিভাবে তা শেষপর্যন্ত সংগীত ও ভাস্কর্যের মিলিত মহিমা লাভ করে। আদি পাণ্ডুলিপি থেকে 'বঙ্গশ্রী'র পাঠ এবং 'বঙ্গশ্রী'র পাঠ থেকে বর্তমান গ্রন্থ, সমগ্র 'দিবারাত্রির কাব্য'র এই পরিণতির ত্রিস্তর, বস্তুত, শিল্পক্রিয়ার সেই নক্সার, জাগতিক অভিজ্ঞান মাত্র, যা-ছাড়া অমরতার ধারণা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয় না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখকজীবনে এই অমরতার প্রক্রিয়া এই একবার মাত্র আমরা প্রত্যক্ষ করি—তাঁর অবশিষ্ট জীবনের ক্রমাগত পরীক্ষার লৌকিক চিহ্নগুলি আজ লুপ্তপ্রায় বলা চলে। কিন্তু এই একটিমাত্র দৃষ্টান্তই আমাদের বলে দেয়, কিভাবে একজন লেখক নিরন্তর জন্ম নেন।

আমরা যারা উপন্যাসপাঠক, নামপত্রের পাতা উল্টে গল্পে মন দিই, আমাদের কাছে 'দিবারাত্রির কাব্য' শুধুই একজন নবীন লেখকের যথারীতি প্রথম উপন্যাস।

বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে 'দিবারাত্রির কাব্য' ও তার লেখকের ভূমিকা [illegible]

প্রতি তা অনাস্থার কারণ হতো। অন্তত একজন সমালোচক, অপেক্ষাকৃত বয়ঃ-কনিষ্ঠ শ্রী অশোক মিত্র, সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি আলোচনায় 'দিবারাত্রির কাব্য'-সম্পর্কে প্রায় অপ্রাসঙ্গিকভাবেই বলেন :

> 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'দিবারাত্রির কাব্য'র পাণ্ডুলিপি কয়েকবছর ফেলে রেখেছিলেন। অসমসাহসীরও অন্তত কিছুদিন থমকে থাকবার প্রয়োজন হয়েছিল সেদিন : বাংলা সাহিত্যে সে-বই দিয়ে স্যুররিয়ালিজমের শুরু।' ('চতুরঙ্গ', মাঘ ১৩৫৭।)

বর্তমান লেখকের ধারণায়, উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত বাক্য দু'টিই 'দিবারাত্রির কাব্য'-সম্পর্কে এখনো পর্যন্ত সবচেয়ে সম্মানজনক উক্তি। এ-কারণে নয় যে, 'বাংলা সাহিত্যে সে-বই দিয়ে স্যুররিয়ালিজমের শুরু'—বাংলা সাহিত্যের পরবর্তীকালের অগ্রবর্তী 'স্যুররিয়ালিস্টরা' না-জানি কথাটা কিভাবে নেবেন। তাছাড়া, বাংলা সাহিত্যে 'স্যুররিয়ালিজম' একটিমাত্র বাক্যাংশের বিষয় নয়; আলোচনার জন্য সাহিত্য ও জীবনের দীর্ঘতর পরিপ্রেক্ষিতের প্রয়োজন। এ-কথা অবশ্য ভাবতে ভালো লাগে, উপন্যাস হিসাবে 'দিবারাত্রির কাব্য'র স্বরূপ-ব্যাখ্যায় একজন নিরুপায় সমালোচক, বাংলা সাহিত্যে তুলনীয় কোনো দৃষ্টান্তের অভাবেই, এবং অধিকতর সুখকর বা যথার্থ কোনো সংজ্ঞা খুঁজে না পাওয়ায়, অগত্যা স্যুররিয়ালিজমের কথা বলেন। কিন্তু শ্রী অশোক মিত্রের উক্তিটি আপাতত যে-কারণে শ্রদ্ধেয়, তা এই যে, 'দিবারাত্রির কাব্য'র আদি পাণ্ডুলিপির প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছাড়াই, শুধুমাত্র লেখকের সাক্ষ্য মেনে সমালোচক বুঝেছিলেন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো অসমসাহসীরও থমকে দাঁড়াবার প্রয়োজন হয়। বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিভার অশিক্ষিতপটুতা এবং অসচেতন শিল্পপ্রকৃতির অতি-রটনার বিরুদ্ধে এও এক-প্রকার প্রতিবাদ। আজ 'দিবারাত্রির কাব্য'র আদি পাণ্ডুলিপি হাতে পাবার পর আমাদের পক্ষেও বুঝে নেওয়া সহজ হবে, কি অর্থে তিনি অসমসাহসী, অথচ কি কারণে সেদিন তাঁর থমকে থাকবার প্রয়োজন হয়েছিল। সদ্যোজাত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেদিন থমকে দাঁড়িয়েছিলেন বলেই, শেষপর্যন্ত একজন অসমসাহসীর হাতেই 'দিবারাত্রির কাব্য'র জন্ম সম্ভব হয়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

দিবারাত্রির কাব্য : আদি পাণ্ডুলিপি

সম্পাদনা মৃগান্তর চক্রবর্তী

—

পাঠনির্দেশ

'দিবারাত্রির কাব্য'র আদি পাণ্ডুলিপির মোট একচল্লিশটি পৃষ্ঠা, পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠাক্রম অনুযায়ী, মুদ্রিত হল। পাণ্ডুলিপিটি ধারাবাহিকতাহীন এবং স্পষ্টতই অসম্পূর্ণ—শুরুর অংশ ও মাঝে-মাঝে অনেক পাতাই পাওয়া যায় নি। ধারাবাহিক বা বিচ্ছিন্ন প্রতিটি অংশের ক্ষেত্রেই, মুদ্রিতপাঠের শুরুতে পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠাঙ্ক উল্লেখ করা হয়েছে।

পাণ্ডুলিপির ২-সংখ্যক পৃষ্ঠা এবং ৫০-৫১ পৃষ্ঠার শেষাংশ, প্রচুর পাঠভেদ-সহ, প্রচলিত 'দিবারাত্রির কাব্য'র (লেখাপড়া সংস্করণ : ১৩৭৪) যথাক্রমে ১০৮-১০৯ এবং ৭০-৭১ পৃষ্ঠার প্রাথমিক লিখন। বাকি পৃষ্ঠাগুলি উপন্যাসটির আদি পাঠ। আদি পাণ্ডুলিপি শুরু হয়েছে ৬১-সংখ্যক পৃষ্ঠা থেকে।

পাণ্ডুলিপিটি অতিশয় জীর্ণ—কোনো-কোনো ক্ষেত্রে এমনই জীর্ণ ও ছিন্নভিন্ন যে, পাঠোদ্ধার কঠিন। এরূপ তিনটি ক্ষেত্রে লাইন কয়েক উদ্ধার করা যায় নি। অন্যান্য কয়েকটি ক্ষেত্রে, কিছু-কিছু অস্পষ্ট বা বিলুপ্ত শব্দ, অনুমানের উপর নির্ভর করে, [ ] বন্ধনীর ভিতর দেওয়া হল।

মুদ্রিতপাঠের বানান মূল পাণ্ডুলিপির অনুরূপ। শুধু অর্থবোধের সুবিধার জন্য যতিবিন্যাসের কিছু-কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে।

—

আদি পাণ্ডুলিপি

॥ পৃষ্ঠা ২ ॥

আনন্দ হঠাৎ বেমানান শ্রান্তস্বরে বলে, 'কী বৃষ্টিই নেমেছে। সমুদ্রটা পর্যন্ত বোধ হয় ভিজে গেল।'

হেরম্ব কথা বলে না। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে। বর্ষা নামলে ঘরে যদি মানুষের মন না বসে মন তবে নিরুপায়। অসহযোগী ভিজে কাক [illegible]

আবির্ভাব হয়। সুপ্রিয়ার কাছে যাওয়ার সময় রাঁচি ও হাজারিবাগের মাঝামাঝি পথে পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে সে এক অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখেছিল, একটি অতুল অচঞ্চল মৃত্তিকাসাগর। পথের সেই স্থানটির উচ্চতা কে যেন মেপে ঠিক করে রেখেছিল, দিগন্তপ্রসারী সমতলভূমি এত নীচে নয় যে ধোঁয়াটে দেখাবে, আবার এত কাছেও নয় যে রুক্ষ বন্ধুরতা চোখে পড়বে। সুপ্রিয়ার চেয়ে পথে কুড়ানো সেই পার্থিব রূপের ছবিই হেরম্বের বেশী মনে পড়ে।

কয়েকটি বিশিষ্ট অবসরে সুপ্রিয়ার কথাও সে ভাবে। দৈহিক ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবৃত্তির মত সুপ্রিয়ার চিন্তা মাঝে মাঝে এক বিচিত্র কারণে তার প্রয়োজনীয় মনে হয়। সুপ্রিয়ার কথা মনে পড়ার আগে তার মধ্যে একটা আশ্চর্য্য মানসিক প্রক্রিয়া ঘটে চলে। এই বাড়ী মন্দির ও বাগানের পরিধির ভিতরে সে যতক্ষণ থাকে পর্য্যায়ক্রমে তীব্র সুতীক্ষ্ণ আনন্দ ও মূর্ছাময় গাঢ় বিষাদে ততক্ষণ সে এমনি আচ্ছন্ন থাকে যে তার সমগ্র চেতনা আনন্দ ও আনন্দের সম্পর্কিত ছোট বড় প্রধান অপ্রধান ঘটনাবলীকে সহজে অতিক্রম করে যেতে পারে না। পথে বেরিয়ে অন্যমনে হাঁটতে হাঁটতে সে যখন সহরের প্রান্তবর্তী সাদা বাড়ীটির কাছে পৌঁছায় তখন থেকে সুরু করে তার মন ধীরে ধীরে পার্থিব বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠতে থাকে। সে স্পষ্ট বুঝতে পারে একটা কাল্পনিক রঙীন স্তিমিত আলোর জগত থেকে সে পৃথিবীর দিবালোকে নেমে আসছে। ধূলিময় গেরুয়া রঙের পথ, পথের জনতা, দুদিকের দোকান ও বাড়ীঘর তার কাছে ফোকাস-না-করা দূরবীণের দৃশ্যপট যেমন ঝাপসা হয়ে থাকে তেমনি অস্পষ্ট হয়েছিল, ক্রমে ক্রমে সব উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে। পৃথিবীতে সে যে একা নয়, শোণিত-সুরা সন্তপ্ত হৃদয় নিয়ে জীবনের চিরন্তন ও অনভিনব সুখ দুঃখে বিচলিত হয়ে অসংখ্য নরনারী যে তাকে ঘিরে আছে

[অসম্পূর্ণ বাক্যে পৃষ্ঠাটি শেষ হয়েছে, পরের পৃষ্ঠা পাওয়া যায় নি।]

॥ পৃষ্ঠা ৫০-৫১ ॥

বাইরে। মানুষের স্তর বলতে আমি কি বোঝাতে চাই তোমাকে বুঝিয়ে বলি। আমার সামনে তুমি আছ আর তোমার থাকাটা আছে। তুমি একস্তরের, তোমার অস্তিত্ব আর এক স্তরের। তুমি উঠে চলে গেলেও তুমি যে এই সিঁড়িতে বসেছিলে এটা চিরকাল সত্য হয়ে থাকবে। কিন্তু সেই সঙ্গে আরও একটা সত্যের সৃষ্টি হবে যে তুমি এখানে বসে নেই। এটাও তোমার অস্তিত্বের স্তরের সত্য, কিন্তু বিরুদ্ধধর্মী। এ দুটো সত্যকে তুমি মেলাতে পার?'

'না। আমার মাথা ঘুরছে। তবে আমার মনে হচ্ছে অস্তিত্বের স্তরে যখন স্থান নেই তখন আমার থাকা না থাকাটাকে সিঁড়িতে বসে থাকা না থাকা বলে ধরা চলে না।'

হেরম্ব খুসী হয়ে বলে, 'কে বলে তোমার মাথা ঘুরছে। তুমি ঠিক বুঝতে পারছ। আচ্ছা স্থানকে যদি বাদ দিই? কোথায় কিভাবে এসব বাদ দিয়ে যদি ধরি তুমি আছ আর তুমি নেই এই দুটো সত্যকে?'

'কিন্তু আমি যদি আছি তা হলে আবার না থাকব কি করে?'

'তুমি সত্যই আছ?'

'নিশ্চয়। না থেকে যাব কোথায়?'

'তাই শুনতে চাচ্ছিলাম। কি করে যাবে কোথায় বললে? না থেকে? তোমার না থাকাটাও তা হলে মিথ্যা নয় আনন্দ?'

আনন্দ বিহ্বল হয়ে বলল, 'এ আবার কি হ'ল!'

'হল এই। তোমার থাকা তোমার না থাকার উপরে নির্ভর করে। ওর দুটোই সত্য।'

'তা হলে দুটো একস্তরের সত্য নয়।'

'না। কিন্তু দুটো সত্যই তোমার অস্তিত্বের। তোমার অস্তিত্ব হ'ল তুমি আছ এই সত্যটা—কিন্তু তোমার অস্তিত্বের স্তর ছাড়িয়ে অন্য এক স্তরে তোমার অস্তিত্বেরই একটা সত্য আছে। মানুষেরও তাই আনন্দ। মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য আছে কিন্তু সেটা মানুষের জীবনে নেই। আবার মুস্কিল এই, এই উদ্দেশ্য যেখানে আছে সেখানে মানুষের জীবন নেই। বুঝতে পারলে?'

আনন্দ বলল, 'বুঝতে পারব? চোখে ধোঁয়া দেখছি—মাথা বন বন করে ঘুরছে, বুঝতে পারব কি করে? কোনোদিক দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এনে আপনি মানুষের সর্ব্বনাশ করে ছেড়েছেন এইটুকু শুধু বুঝতে পারছি।'

'তুমি তা হলে কি অন্ততঃ এটা বুঝতে পারছ তো?'

'কি? বোকা? রোমিও জুলিয়েটের প্রেম থেকে আমায় বোকাত্বে এসে পৌঁছেছেন। আর কেন, এইখানেই থেমে যান।'

'বেশ, থামলাম। কিন্তু তুমি আমাকে অবাক করে দিয়েছ আনন্দ। কোন দার্শনিক তত্ত্বের স্তর থেকে আমাকে কোথায় নামিয়ে নিয়ে এলে।'

আনন্দ মৃদু হাসল।

'নামানোই যে আমাদের ধর্ম্ম, তা জানেন না?'

[আনন্দের উল্লিখিত উক্তির সঙ্গেই ছিল নিম্নোক্ত অংশটি—পাণ্ডুলিপির আড়াই লাইন লেখা, নীল পেনসিলের লম্বা দাগ টেনে কেটে দেওয়া :

আকাশের চাঁদ গাছের কোকিল সব কবির মনে নামিয়ে নিয়ে আসি। আবার আমরাই কবিকে মাটিয়ে দিই নরকে। আকাশের চাঁদ আর গাছের কোকিল তা হ'লে কোথায় পৌঁছোলো ভাবুন।

এরপর, পূর্বানুক্রমিক পরবর্তী অনুচ্ছেদ।]

কথা বলার উত্তেজনায় হেরম্বের সাময়িক বিস্মৃতি এসেছিল। শব্দের মোহ তার মন থেকে কিছুক্ষণের জন্য আনন্দের মোহকে স্থানচ্যুত করেছিল। জীবন সম্বন্ধে বক্তব্য শেষ করে পুনরায় আনন্দের সান্নিধ্যকে পূর্ণভাবে অনুভব করে সে এই ভেবে বিস্মিত হয়ে রইল যে শ্রোতা ভিন্ন এতক্ষণ আনন্দ তার কাছে আর কিছুই ছিল না। শ্রবণশক্তি ছাড়া আনন্দের আর কোন বিশেষত্ব সম্বন্ধেই সে সচেতন ছিল না, আনন্দকে এতক্ষণ সে এমনি একটা সাধারণ পর্য্যায়ে অসঙ্গত ভাবে ফেলে রেখেছিল। হেরম্ব এটাও বুঝতে পারে, তার কাছে আনন্দ জীবনের ব্যাখ্যা শুনতে ইচ্ছুক নয়। জীবন কি, জীবনের উদ্দেশ্য আছে কি নেই, এসব তত্ত্বকথায় আনন্দের বিরক্তি বোধ হচ্ছিল। অন্যসময় বিশ্লেষণ ওর ভাল লাগে কি না, জানবার উপায় নেই, কিন্তু আজ সন্ধ্যায় তার মুখের বিশ্লেষণ ওর কাছে শাস্তির মত লাগছে। তাকে থামিয়ে দিয়ে আনন্দ স্বস্তি পেয়েছে। সে জীবনের সুখ-দুঃখের কথা বলুক, প্রেমকে ব্যাখ্যা করুক, আনন্দ মন দিয়ে শুনবে কিন্তু সেইখানেই তার ধৈর্য্যের সীমা। সমস্ত অনুভূতির সমন্বয় করা জীবনের সমগ্রতাকে সে জানতে চায় না, বুঝতে চায় না, ভাবতে চায় না।

তাই হোক। এই ভাল।

[অংশটি শুরু হয়েছে পূর্ববর্তী বাক্যের শেষ শব্দ দিয়ে—আগের পৃষ্ঠাটি নেই। বর্তমান অংশ পর্যন্ত পাণ্ডুলিপির পাঠ প্রচলিত গ্রন্থের সঙ্গে সম্পর্কিত।]

॥ পৃষ্ঠা ৬৫-৬৬ ॥

প্রথমে শেষ অপরাহ্ণ তারপর গোধূলি তারপর সন্ধ্যা এবং রাত্রি। বিশেষ-ভাবে সচেতন থাকিয়াও তিনটি সন্ধিক্ষণের একটিকেও হেরম্ব ধরিতে পারে নাই। গোধূলি যখন আসিল অপরাহ্ণ তখন নাই, সন্ধ্যাকে পাইয়া গোধূলির সন্ধান ভুলিতে হইল। সন্ধ্যাই রাত্রি।

জীবনও নাকি এইপ্রকার। প্রৌঢ় ব্যক্তিরা বলিয়া থাকেন।

এমনকি, পথ সংক্ষেপ করিতে গিয়া পথও শেষ পর্য্যন্ত তাহারা হারাইল। রাত্রিকালে শুধু একটা লণ্ঠন হাতে আকাশের অচেনা তারার নীচে মাঠের আল আর শুকনো ঝরনার জঙ্গল ও পাথর ভরা বুক দিয়া চলিতে চলিতে পালকীর [না, গাড়ীর ?] মালিক আর কেদারের চাপরাসির মত পাকা লোকেরও [?] দিকভ্রম হওয়া আশ্চর্য্য নয়।

[উল্লিখিত অংশের পর, অতিজীর্ণ পৃষ্ঠাটির মার্জিনে লেখা লাইন কয়েক অংশ এমনই অস্পষ্ট যে পাঠোদ্ধার করা যায় নি।]

গাড়ী পাওয়া গেল না। গাড়ী চলিয়া যাওয়ার ঘণ্টাখানেক পরে তাহারা ষ্টেসনে পৌঁছিল।

সকলকে বখশিস দিয়া বিদায় করিয়া হেরম্ব কাঁকর বিছানো নির্জন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াইয়া রহিল। চাপরাসিকে আটকানো যাইত, কিন্তু ও বেচারা মানুষ, আজ সকালেই সে সাত মাইল দূরে একটা গ্রামে সমন জারি করিতে গিয়াছিল, তারপর এই এগার মাইল পথ হাঁটিয়াছে। তাছাড়া রাতারাতি ওয়েটিং রুম তৈয়ারী করিবার ক্ষমতা হাকিমের চাপরাসিরও নাই।

সঙ্গে সতরঞ্চি আছে, ছোট একটা বালিশ আছে, খাবার আছে, জল আছে, আকাশের নীচেই রাতটা একরকম কাটিয়া যাইবে। তাহার ভাবনা কি?

সে আপিসের দুয়ারে গিয়া দাঁড়াইল। পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসর বয়সের একটি শীর্ণকায় যুবক টেবিলের উপর বিছানা বিছাইতেছিল, ফিরিয়া তাকাইল।

'কি চান?'

'আমার চাওয়ার হিসেব শুনলে ভড়কে যাবেন মশায়। তাতে কাজ নেই, এখানে বিড়ি চুরুট কোথায় পাওয়া যায় তাই শুধু আমায় বলে দিন।'

'গ্রামে যান।'

'গ্রাম কতদূর?'

'তা হবে, মাইল দেড়েক হবে।'

'বিড়ি কেনার জন্ত এতরাত্রে অতদূর হেঁটে যাব?'

'আমি তার কি জানি?'

'একটু বসা যাক, কি বলেন?' বলিয়া আহ্বানের অপেক্ষা না করিয়াই সে একটা টুলে বসিয়া পড়িল। বলিল, 'বিপাকে পড়ে বিড়ি খুঁজছি মশায়, নইলে বিড়ি আমি ছুঁই না। অন্ত সময় হলে আপনাকে হাভানা চুরুট খাওয়াতে পারতাম, জামাইবাবুর ক্যাম্পে তিন দিন আটকা পড়ে যাওয়ায় চুরুটগুলি ফুরিয়েছে। জামাইবাবুকে চেনেন বোধ হয়? সোনাবতির হাকিম কেদারবাবু।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, চিনি বৈকি। বিড়ি খাবেন? নিন্।'

হেরম্ব হাসিয়া বলিল, 'একটা? একটাতে কি হবে মশায়—সায়ারাতের খোরাক যে!'

সে গোটাচারেক বিড়ি দান করিয়া ফেলিল। লজ্জিতমুখে বলিল, 'আর নেই। পয়েন্টসম্যান খেতে গেছে, ফিরে এলে আনিয়ে দেব।'

হেরম্ব একটা বিড়ি ধরাইয়া টানিতে লাগিল।

'ভাল নয় বিড়ি।'

'স্থানীয় জিনিষ, যা পাওয়া যায়।'

'কলকাতা গিয়ে আপনাকে এক হাজার মুখপোড়া বিড়ি পাঠিয়ে দেব—খেয়ে দেখবেন, এও বিড়ি, সেও বিড়ি। নামটি বলুনতো—' নোট বুক বাহির করিয়া হেরম্ব নাম টুকিয়া নিল, 'ঠিকানাটা কি হবে? বাবু অবিনাশচন্দ্র রায়, ষ্টেসন মাষ্টার, রাহাইড়া, বি. এন. আর—ব্যস্? গিয়েই পাঠিয়ে দেব।'

অবিনাশ বলিল, 'বিড়ি তবু এখানে পাওয়া যায়, জর্দ্দারই অভাব।'

'জর্দ্দা খান নাকি ?'

'আমি খাই না, ওসব কুঅভ্যাস করি নি। বাড়ীর মধ্যে খান।'

আপিসের পশ্চাদ্‌ভাগটা দেখাইয়া হেরম্ব বলিল, 'ওই বুঝি বাড়ীর মধ্যে ?'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ।'

'কে কে আছেন ?'

'স্ত্রী। বড় সম্বন্ধি এসেছিলেন, তা কাল তিনি চলে গেছেন।'

'সুখেই আছেন, কি বলেন ? অপর্য্যাপ্ত অবসর, নির্জ্জন নিঃশব্দ নীড়, শুধু প্রিয়া আর আপনি—চমৎকার, এঁ্যা ?'

'যাচ্ছেতাই।' বলিয়া অবিনাশ ফস্ করিয়া একটা বিড়ি ধরাইয়া ফেলিল।

'বাপের বাড়ী যাবেন মশায়, বাপের বাড়ী ! এখানে ওর মন টেকে না। এসেছেন এদিকে সাতদিনও হয় নি।'

রাগে অবিনাশ গজ গজ করিতে লাগিল, 'এখানে কি সাধে বিছানা পাতছি, এই শক্ত টেবিলের ওপোর ? দিনরাত ফোঁস ফোঁস করে কান্না আর সহ্য হয় না।'

'তা দিন না বাপের বাড়ী পাঠিয়ে ? ছেলেমানুষ—'

'খুকী মশায় খুকী—কচি পটোল। ষোল বছর বয়েস তো হয়েছে এদিকে ? আপনাকে কি আর বলব দাদা, আমার অসহ্য হয়েছে।'

বোঝা গেল কলহটা টাটকা, সম্ভবতঃ গাড়ী আসার আগেই ঘটিয়াছিল, এ গাড়ীতেই হয়ত বৌটির বাপের বাড়ী যাইতে হয়, গাড়ীর শব্দে বুকের মধ্যে কেমন করিয়া ওঠায় কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিয়াছিল খেয়াল থাকে নাই—অবিনাশ বড়ই অপমান বোধ করিয়াছে। গাড়ী পাশ করাইতে তাহাকে তখন প্ল্যাটফর্ম্মে আসিতে হইয়াছিল, সুতরাং ঝগড়াটা না মিটিয়া অভিমানে পরিণত হইয়াছে। তাই আপিস ঘরে বিরহশয়নের ব্যবস্থা।

হেরম্ব বলিল, 'দেখুন, ওই বয়সে মেয়েদের বাপের বাড়ীর দিকেই টানটা বেশী থাকে। আমার বৌএর কথাই ধরুন, আমি বলি ভালবাসার কথা, সে তার বাপের

[অসম্পূর্ণ বাক্যের মধ্যেই অংশটি এখানে শেষ হয়।]

॥ পৃষ্ঠা ৮৪ ॥

হেরম্ব দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাহার গলা কাঁপিয়া গেল।

'তোমায় নিয়ে গিয়ে ওরা কি করেছিল ?'

'নিয়ে তো যেতে পারে নি। মুখের কাপড়টা সরে যেতেই আমি চেঁচিয়ে

উঠলাম। মাঠ দিয়ে দুজন লোক যাচ্ছিল, তারা ছুটে এল। আমায় দড়াম করে ফেলে ডাকাতগুলি পালিয়ে গেল।'

হেরম্ব নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'তাই বল! অমন করে বলতে আছে? বুকের রক্ত শুকিয়ে উঠেছিল।'

আনন্দ এই ভালবাসা বুঝিতে পারে। সে চুপ করিয়া রহিল।

হেরম্ব বলিল, 'তারপর কি হ'ল?'

'সেই দুজন লোক বাবার ভক্ত। ডাকাতদের একজনকে তারা চিনতে পেরেছিল, পুলিশে খবর দেবার জন্ত বাবাকে তারা কত বল্লে, বাবা রাজী হল না। বলল, আমরা সন্ন্যাসী মানুষ, বিবাদ করা আমাদের উচিত নয়।'

'কিন্তু ওকি বিবাদ আনন্দ?'

'বাবা বড় শান্ত মানুষ, জামাকে বড় ভরান।'

সোজা প্রান্তর অতিক্রম করিয়া তাহারা চলিতেছিল, পাশাপাশি, বন্ধুর মত, আত্মীয়ের মত :—একজন শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত সহরে ভদ্রসন্তান, অন্তজন কুলত্যাগিনী বিধবার ছেলে অথবা মেয়ে অথবা দুয়েরি সমন্বয়, কিশোর সন্ন্যাসী, একান্ত ছেলেমানুষ। হেরম্বের মন কেমন করিতে লাগিল। তার দিকের উন্মত্ত আবেগ অপরদিকে কোন সাড়াই যে জাগায় নাই হঠাৎ এটা তাহার খেয়াল হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে একতরফা প্রেমের দাম কমিয়াছে, আবেগে মন্দা পড়িয়াছে,—ঘোর স্বার্থপর মানুষের মন। সমস্ত জগৎ যাহাকে সেরা পাগলামী বলিয়া কীর্তন করিবে এতক্ষণ অবাধে তাহাকে প্রশ্রয় দিয়া তাহার তবে এইটুকু লাভ হইল যে তাহার উপস্থিতির সুযোগে আনন্দ মধ্যরাত্রে ঝরনার ধারে বেড়ানোর আনন্দ সংগ্রহ করিয়া নিল মাত্র, কাল তাহাকে স্মরণ রাখার প্রয়োজনও আর ওর থাকিবে না? কেনই বা থাকিবে? যাযাবরের জীবন যাপন করিতে করিতে তাহার মত কত মানুষের সঙ্গেই তাহার ভাব হইয়াছে—তাহার মত মুগ্ধ হইয়াছে সকলেই। তাহাকে আনন্দ বিশেষভাবে গ্রহণ করিবে কেন? হয়ত তাহার সঙ্গেই আনন্দ প্রথম মাঝরাত্রে ঝরনা দেখিতে চলিয়াছে, কিন্তু সেজন্ত কিছু আসিয়া যায় না। এজন্ত সে বড়জোর কেবল 'বেশ লোক', তার বেশী আর কিছুই নয়।

॥ পৃষ্ঠা ৮৬-৯৪ ॥

ওকে বুঝিতে হইবে।

'আমি মরে গেলে তুমি কি কর আনন্দ?'

'আমি? আমি একটু কাঁদি।' এই বলিয়া আনন্দ হাসিয়া যোগ দিল,

'মিছিমিছি মরার কথা কেন বলছেন? কপালে লেখা না থাকলে কেউ মরে না!'

'কপালে লেখা আছে কি নেই কি করে জানলে?'

একটু ভাবিয়া আনন্দ আশ্চর্য্য হইয়া গেল,—'ঠিক্ তো!'

ঝরনার পরিষ্কার অংশে তাহারা নামিয়াছিল, কিছুদূর হাঁটিবার পর ঝোঁপ জঙ্গল আরম্ভ হইল, আর খানিক দূরে গাছের ডালে আর লতায় ঝরনাকে ঢাকিয়া দিয়াছে।

'আর গিয়ে কাজ নেই আনন্দ।'

'আরও! ওর মধ্যে নিশ্চয় ভূত আছে!'

যেখানে নামিয়াছিল সেইখানে তাহারা ফিরিয়া আসিল। উপরে উঠিয়া আনন্দ বলিল, 'উঃ, পায়ে কাঁটা ফুটল!'

'দেখি?'

আনন্দ কাঁকরের উপর বসিলে দেশলাই জ্বালিয়া হেরম্ব তাহার পায়ে কাঁটা খুঁজিতে লাগিল। আনন্দকে স্পর্শ করামাত্র তাহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

[পাণ্ডুলিপি দেখে বোঝা যায়, পৃষ্ঠাটি অষ্টম পরিচ্ছেদের শেষ পাতা।]

নবম পরিচ্ছেদ

বেলা সাতটার আগে হেরম্বের ঘুম ভাঙ্গিল না। তাহার ঘুম কেহ ভাঙ্গাইয়াও দিল না।

রাঁচির গাড়ী চলিয়া গিয়াছে।

চোখ মেলিবার আগেই হেরম্ব টের পাইল লোকজন অনেক আসিয়া জুটিয়াছে। এবং রীতিমত রোদ উঠিয়াছে।

নির্ব্বাপিত ধুনীর সামনে মাতাজী ব্যাঘ্র চর্ম্মে আসীনা, পুণ্যস্তিমিত দুই আঁখি, মুখে অভয়-হাস্য। সম্মুখে অর্দ্ধচক্রাকারে উপবিষ্ট কুড়ি বাইশটি নরনারী। আনন্দ সেই পাথরটাতে চুপচাপ বসিয়া আছে। সে নবোদিত সূর্য্যকে দেখিতেছে, না মাতাজীর ছাই ও মাদুলি বিতরণ দেখিতেছে বুঝিবার উপায় নাই।

হেরম্বকে উঠিয়া বসিতে দেখিয়া আনন্দ তাড়াতাড়ি কাছে আসিল। চুপিচুপি বলিল, 'আপনি মার ভক্ত। সকলের আগে মাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করুন।'

'যদি না করি?'

'মা ভীষণ রাগ করবে।'

'এখনি প্রণাম করব?'

'হ্যাঁ। ভোরে উঠেই গুরুমাকে প্রণাম করতে হয়।'

'রোজ?'

'লোকজন থাকলে রোজ, নইলে ইচ্ছা হল করলেন, ইচ্ছা না হল না করলেন, কিছু আসে যায় না।'

'ওঁ' বলিয়া উঠিয়া গিয়া হেরম্ব মাতাজীর পায়ের কাছে উপুর হইয়া পড়িল। মাতাজী মধুর কণ্ঠে বলিলেন, 'শুভ হোক। একরাত্রির সাধনায় শ্রমেই বেলা পর্য্যন্ত ঘুমোলি বাবা? যাক্ যাক্, যেতে দে, ক্রমে সহ্য হবে। বেদের চতুর্থ অধ্যায়টা আজ শেষ করতে হবে বাবা।'

বেদের চতুর্থ অধ্যায় আছে নাকি?

হেরম্ব সোজা হইয়া বলিল, 'যেমন আজ্ঞা করেন।'

ভক্তমণ্ডলীর দিকে চাহিয়া মাতাজী বলিলেন, 'বড় সুধীর, বড় ভক্তিমান। অল্পদিনে সাধনমার্গে অনেকদূর এগিয়ে যাবে।'

বর্ষীয়সী এক রমণী কহিল, 'পাচটা পাশ করা ছেলে! কোন ভাগ্যিমানীর বুক পুড়িয়ে নবীন সন্ন্যেসী হতে এসেছে কে জানে মা!'

'বৌটা চোখের জলে ভাসছে।'

একটি যুবতী বধূ পরপুরুষকে এতটুকু লজ্জা না করিয়া ছয়মাসের এক হৃষ্টপুষ্ট শিশুকে হেরম্বের পায়ের কাছে শোয়াইয়া দিয়া ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহার দুটি ছেলে হইয়াছিল, একবছরের বেশী বাঁচে নাই। এই ছেলেটির জীবিত অবস্থাতেও সে তাই প্রতিনিয়ত তিন পুত্রের পুত্রশোক ভোগ করিতেছে —এতো মরিল বলিয়া। এখন, সাধু সন্ন্যাসীর আশীর্ব্বাদ কুড়াইয়া যদি বাঁচে।

মাতাজী বলিলেন, 'আশীর্ব্বাদ কর বাবা।'

হেরম্ব ছেলেটিকে কুড়াইয়া নিল। নাড়িয়া চাড়িয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিবার ভান করিয়া বলিল, 'তোর এ ছেলে মরবে না যদি এক কাজ করিস।'

বৌটি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'কি কাজ বাবা?'

'রোজ তেল মেখে স্নান করাবি, কমকম দুধ খাওয়াবি আর বেশী কোলে নিবি না।'

সে শিহরিয়া বলিল, 'অযত্ন করব বাবা?'

হেরম্ব তাহার চোখের উপরে ভ্রূকুটি করিয়া ছেলে নামাইয়া রাখিয়া ষ্টেশনের দিকে চলিতে আরম্ভ করিল।

খানিকদূর গিয়াছে, পিছনে ডাক শুনিয়া ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল আনন্দ ছুটিয়া আসিতেছে।

আনন্দের ছুটিবার ভঙ্গিটি বড় সুন্দর। পা যেন মাটিতে পড়ে না, হাত দুটি তালে তালে দোল খায়, রুক্ষ বাবরি চুল উড়িতে থাকে, সে যেন একটা কাঞ্চন চাঞ্চল্য, একটা গতি। কাছে আসিয়া আনন্দ হাঁপাইতে লাগিল। তার মুখখানি লাল হইয়া উঠিয়াছে।

একটু দম নিয়া একসঙ্গে হেরম্বকে সে অনেক কথা বলিল।

'এদিকে যাচ্ছেন কোথা ? ঝরনায় মুখ ধুতে যাবেন বলে হাঁ করে বসে আছি, —সঙ্গে যেতাম,—আপনি এদিকে পালাচ্ছেন। আপনার গাড়ী তো চলে গেছে ! যদি যেতে চান তো কাল সেই ভোরে ! আমরা রাত্রের গাড়ীতে পুরী যাব।' বলিয়া প্রথম প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করিল, 'কোথায় যাচ্ছেন ?'

হেরম্ব বলিল, 'যাচ্ছি একবার ষ্টেসনে। কাপড় জামা নিয়ে আসি।'

'মা বলছিল স্নান করে একেবারে গেরুয়া কাপড় পরবেন।'

হেরম্ব সবিস্ময়ে বলিল, 'তোমার মা কি আমাকে দলে ভেড়াতে চান নাকি ?'

'আমি কি জানি ?'

মাতাজীর অভিলাষ হেরম্ব কিছু কিছু টের পায় নাই এমন নয়। স্বামিজী কিছুই স্থাখেন না, আপনার জপতপ নিয়া থাকেন, যত পাকা মেয়েমানুষই হন মাতাজী মেয়েমানুষই বটে। তাহাকে নানা প্রকার অসুবিধায় পড়িতে হয়। আনন্দ একান্ত শিশু, তাছাড়া যে কারণেই হোক তাহাকে মাতাজী এবং স্বামিজী পক্ষীশাবকের মত পক্ষপুটের আড়ালেই রাখিতে চান, বহির্জগতের সম্পর্কে সন্তানকে আসিতে দিতে তাহাদের যথেষ্ট আপত্তি। হেরম্বের মত একজন যুবককে সঙ্গী পাইলে মাতাজীর অনেক সুবিধা হইবে।

মাতাজী বোকা নন, তিনি ভাল করিয়াই জানেন সাধারণ ধর্ম্ম ভক্তিমান শিষ্যের মত হেরম্বকে পাওয়া যাইবে না, ধর্ম্মের খাতিরে কাহারো চেলা হইবার পাত্র সে নয়। আপনার লোকের মত, সঙ্গীর মত সে সঙ্গে থাকিতে পারে এইমাত্র। আনন্দ এবং উন্মুক্ত আকাশের নীচে এই যাযাবর জীবন যদি তাহাকে আকর্ষণ করিয়া রাখিতে পারে তবেই সে থাকিবে, নহিলে কিছুই তাহাকে আটকাইয়া রাখিতে পারিবে না।

এ সমস্তই হেরম্ব অনুমান করিয়াছিল। মাতাজীর মত ঝানু মেয়েমানুষ যে অকারণে সহসা তাহাকে ভালবাসিয়া ফেলিবেন নিজের স্নেহ আকর্ষণী শক্তি সম্বন্ধে হেরম্বের অতখানি ভুল ধারণা ছিল না। কালরাত্রে শুইয়া শুইয়া সে ভাবিয়া দেখিয়াছে, ইহাদের ত্যাগ করিয়া যাওয়া অসম্ভব। মাতাজীর পাশে আনন্দ শুইয়াছিল, যতবার হেরম্ব চোখ মেলিয়া তাহাকে দেখিয়াছে, ততবারই তাহার মনে হইয়াছে যাওয়া সম্ভব নয়। কেনই বা যাইবে ? কি আছে কলিকাতায় ? মাতাজী যখন সঙ্গে রাখিতে চান, থাকাই সঙ্গত।

কিন্তু গেরুয়া সমস্যা তাহার মনে উদিত হয় নাই। মাতাজী যে আজই তাহাকে গেরুয়া পরাইতে চাহিবেন ইহা সে কল্পনাও করে নাই। গেরুয়ার চমৎকার লজ্জা নিবারণ নয় [হয় ?], রঙটাও স্নিগ্ধ, কিন্তু পুরোপুরি সন্ন্যাসী সাজা তাহার পক্ষে একটু কঠিন। যদি পরিচিত কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইয়া যায় ? যদি কলিকাতায় একটি বিশিষ্ট পরিবারে খবর পৌঁছে যে হেরম্ব বিবাগী হইয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কিছুই আসিয়া যায় না অবশ্য, তবু—

গৃহী-ভক্ত হিসাবে সঙ্গে রাখিতে মাতাজীর আপত্তি হইবে ? সঙ্গে থাকার কথা উঠিলে বলিয়া দেখা যাইবে। মাতাজীর আপত্তি হওয়ার কারণ তো কিছু ভাবিয়া পাওয়া যায় না।

'আমার সঙ্গে ট্রেনে যাবে আনন্দ ?'

'মাকে বলে আসি নি। যদি বকে ?'

'বকবেন না। এসো।'

অবিনাশ খাতায় কি লিখিতেছিল, শশব্যস্তে উঠিয়া টিপ করিয়া আনন্দের পায়ের কাছে প্রণাম করিল। আনন্দ নমস্কার করিয়া বলিল, 'শুভমস্তু। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।'

হেরম্ব অনুমান করিল এটুকু মাতাজীর শিক্ষা।

অবিনাশ বলিল, 'কাজটুকু সেরেই মাতাজীকে প্রণাম করতে যাচ্ছিলাম, ছোট ঠাকুর।—একেবারে অব্যর্থ ওষুধ দিয়েছেন! একেবারে অব্যর্থ!' হেরম্বের দিকে চাহিয়া 'জানেন দাদা, জানেন ? রাত্রে বৌ কি বললে জানেন ?'

হেরম্ব হাসি চাপিয়া বলিল, 'কি বললেন ?'

'বললে, আর তোমায় মনে কষ্ট দেব না, আর কাঁদব না, তুমি যা বলবে শুনব। শুধু তাই নয় দাদা! মাপ চাইল! বলল, আমার মাপ কর!'

'বলল নাকি ? আশ্চর্য্য তো!'

'প্রত্যয় হয় না মশায় সহজে! মাতাজীর মাদুলি—একেবারে অব্যর্থ! হাত জোর করে কাঁদ কাঁদ হয়ে কি করেই যে বললে দাদা, আমি বড্ড অপরাধ করেছি, আমায় মাপ কর, শুনলে থ হয়ে যেতেন!'

নারী নতি স্বীকার করিয়াছে তাহারি আনন্দে লোকটা ভরপুর! যেন ভয়ানক একটা কিছু কাণ্ড হইয়াছে! বৌ হাত জোর করিয়া মাপ চাহিয়াছে, স্বর্গ একেবারে হাতের মুঠায়!

বেশী বয়সে বিবাহ করিলে লোকে হাস্যকর রকম স্ত্রৈণ হয়, সেই হীন মনোবৃত্তি ইহার। ভালবাসা ও স্নেহের নামে নিজের বিকৃত পৌরুষের এ যে কি শ্রীহীন পরিচয় সে সংবাদ ইহারা রাখে না। খেলা নাই, হাসি নাই, জোরালো দাবী নাই, অন্নে বিদ্রোহ নাই, ব্যথা দিবার ও সহিবার ক্ষমতার মধ্যে প্রেমকে মধুর করিবার ধৈর্য্য নাই, শুধু আছে দাসত্ব! দুইটি নারী যেন স্বামীস্ত্রী হইয়াছে। একপক্ষ দয়া করিয়া ভালবাসিলেই অপর পক্ষ আত্মহারা!

যাহার স্নেহমন জয় করিয়া না নিলে কিছুই পাওয়া যায় না, তাহারি কাছে হাত পাতিয়া ভিক্ষা করা। ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ।

অতএব ক্ষমাপ্রার্থী স্ত্রীর গর্ব্বিত স্বামী অবিনাশের প্রতি হেরম্বের কিছুমাত্র শ্রদ্ধার উদয় হইল না। এ যদি বলিত বর্ষণক্লান্ত ভিজা আকাশে সূর্য্যের আলো

ফুটিয়া ওঠার মত আমার চুম্বনে বৌএর চোখের জলে হাসি ফুটিয়াছিল, হেরম্ব খুসী হইত, ভাবিত, না, লোকটা নেহাৎ অপদার্থ নয়।

পরস্পরের হৃদয় জয় না করাটা [এক] শ্রেণীর স্বামীস্ত্রীর গর্ব্বের বিষয়। তা, সকলের কি হৃদয় থাকে ?

আনন্দ বোধ হয় আজ পর্য্যন্ত ষ্টেসনের আপিসে ঢোকে নাই, তার কত বিস্ময়, কত প্রশ্ন। টেলিগ্রাফে কেমন করিয়া সংবাদ আসে ? সংবাদ যখন আসে অবিনাশ যদি তখন ঘুমাইয়া থাকে তাহা হইলে নিশ্চয় কলিশন হয় ? তাহার ঘুম ভাঙ্গাইয়া খবর না দিয়া আগের ষ্টেসন হইতে গাড়ী ছাড়ে না ? আশ্চর্য্য তো ! আচ্ছা, টিকিট কোথায় ছাপা হয় ? টিকিট যদি ফুরাইয়া যায় ? টিকিটে তারিখের ছাপ দিবার যন্ত্রটা আনন্দ বুঝিয়া নিল। এত সহজ !

অবিনাশ গর্ব্বে আর বাচে না। যন্ত্রগুলি সেই যেন উদ্ভাবন করিয়াছে।

'মর্স এর কোডগুলি, জান ছোটঠাকুর, বড্ড কঠিন শেখা। কথ টথ কিছু নেই—শুধু ড্যাস্ আর ডট্ !···আরেক ষ্টেসনে ড্যাস্ আর ডট্ দিচ্ছে, আমি শুনে লিখে যাচ্ছি, ব্যাস্।···'

ফিরিবার পথে হেরম্ব বলিল, 'বলে গেলেই হল ! কিছু জানে না লোকটা। কি হয় জান ? টেলিগ্রাফের তার দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ বয়, ওই যে যন্ত্র দেখলে টিকটিক করছিল ?—ওর সঙ্গে বিদ্যুতের তারের যোগ আছে—'

রোদের তেজ বাড়িয়াছে। কিন্তু মাতাজীর কাছে লোকের ভীড় কমে নাই। হেরম্ব ঝরনায় গিয়া স্নান করিয়া আসিল। আনন্দ সঙ্গে গেল কিন্তু স্নান করিল না।

'আমি শেষরাত্রে স্নান করেছি।'

'অতরাত্রে শুয়ে শেষরাত্রে উঠেছিলে ?'

'সন্ন্যাসীর চারটের সময় উঠতে হয়।'

'ঝরনায় এসেছিলে ?'

'না, তাঁবুর মধ্যে। রাত্রে গ্রামের লোক জল দিয়ে গিয়েছিল।'

হেরম্ব সমস্যায় পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কিসে জল দিয়ে গেল ?'

'কেন, আমাদের বড় বড় দুটো বালতি আছে, স্থাখেন নি ?'

বড় বড় দুটা বালতি আবার সম্পত্তি ! ঝরনার স্রোতের মধ্যে বসিয়া মাথায় জল দিয়া দিয়া হেরম্বের মাথা ঠাণ্ডা হইয়াছিল, আনন্দের জন্য টানটা আবার সতেজ হইয়াছে।

'বালতির জলে কি ভাল স্নান হয় আনন্দ ?'

'মার সঙ্গে আবার স্নান করব যে !'

বালির উপরে কি যেন আনন্দ লিখিতেছিল, হয়ত নিজের নাম, হয়ত হিজি-বিজি দাগ। হেরম্বের পকেট হাতড়াইয়া পেন্সিল বাহির করিয়া সে লেখনী করিয়াছে। সহসা হেরম্বের খুসীর সীমা রহিল না। কাল হইতে আনন্দ যে বাচিয়া সারাক্ষণ তাহার সঙ্গে থাকিয়াছে এ তো সে খেয়াল করে নাই!

তাহাকে আনন্দের ভাল লাগে, আনন্দ তাহার সঙ্গ চায়, আনন্দ তাহার অনুগত! শুধু তাই নয়, সকলের চোখের আড়ালেই তাহাকে আনন্দর বেশী ভাল লাগে—তাহার সঙ্গে ঝরনায় আসিবে বলিয়া সে প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়াছিল সারাটি সকাল!

মানুষ বলিয়া এমনি ঝরনার মত সঙ্কীর্ণ তাহার জীবন, তীরের বালুকায় আনন্দ আপন মনে খেলা জুড়িয়াছে। চোখ বুজিয়া এই গাঢ় নিশ্বাসরোধী সম্ভাবনাকে উপভোগ করা যায়। অন্তর আজ সৌখীন,—বিলাসী। আকাশে রৌদ্রে বায়ুস্তরে প্রান্তরে রসজ্ঞ উৎপল শয্যায় একি মাধুর্য্য!

হেরম্ব বলিল, 'আনন্দ, তুমি এত স্বতন্ত্র কেন?'

'আমি কি?'

সে বুঝিতে পারে না। কতগুলি স্বাভাবিক অনুভূতি তাহার নাই—কতগুলি শব্দ তাহার কাছে মৃত, অর্থহীন।

আস্তানায় ফিরিলে প্রসাদ মিলিল। এই মাঠের মধ্যে কোন দেবতা মাতাজীর পূজা গ্রহণ করিয়াছেন কে জানে, কিন্তু প্রসাদ অতি উত্তম। খাঁটি দুধ খাঁটি ক্ষীর, পাকা ফল, ঘৃতপক্ক লুচি।

স্বামিজীকে দেখা গেল না। কোন গাছতলায় তিনি ধ্যানে বসিয়া গিয়াছেন কে জানে!

দশটা এগারটা অবধি মাতাজীর কাছে লোকজনের যাতায়াত চলিল, তারপর স্থানটি নির্জ্জন হইলে হেরম্বকে ডাকিয়া মাতাজী বলিলেন, 'চারখানা পুরীর টিকিটে কত লাগবে বাবা?'

হেরম্বকে ধরিয়া চারখানা টিকিটই লাগিবে বটে, মাতাজীর বুদ্ধি কম তীক্ষ্ণ নয়! হেরম্ব যে তাহাদের সঙ্গে পুরী যাইবে ইহাকে স্বতঃসিদ্ধের মত ধরিয়া নিয়া হেরম্বের যাওয়াটা বৎপরোনাস্তি সহজ করিয়া দিলেন।

'বলতে পারি না মাতাজী। ষ্টেসনে জানা যাবে।'

'থাক গে, ষ্টেসনে গিয়ে একেবারে কিনলেই হবে। গাড়ী তো নটায়।'

'একটা নিবেদন আছে মাতাজী।'

মাতাজী খেঁকাইয়া উঠিলেন, 'নিবেদন আছে! নিবেদন আছে! বলতে পারিস না?'

হেরম্ব হাসিয়া বলিল, 'গেরুয়া না পরলে চলে না?'

'গেরুয়া না পরলে আমার ভৈরব হবি কি করে?'

'রাম রাম।'

'শালার নিষ্ঠা স্থাখো! আচ্ছা যা গেরুয়া ধারণ করতে হবে না—তুই আমার গুপ্ত ভক্ত।'

হেরম্ব খুসী হইয়া বলিল, 'মাতাজী লোক ভাল,—কেবল গালাগালিটা একটু কম দিলে—'

'ময় মুখপোড়া, সাধু সন্ন্যাসী গাল দেয়? তুই আমার ছেলে তুই আমার বাপ তুই আমার ভাতার—তুই আমার শালা!—তুই আমার কেউ নস্।'

'বটে মাতাজী?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ গো কর্ত্তা! দেহ তো কাদা রে—জল মাটি! দেহের সম্পর্ক আবার সম্পর্ক কিসের? দশমাস দেহের মধ্যে ছিল বলে ছেলে ছেলে হয় না বাপ আমার—ছেলে আছে মনের বাৎসল্যে। নিবি আমার দেহটা?'

'সংসারী মানুষ, আমায় ওসব বলবেন [না] মাতাজী। আমার মন খারাপ হয়ে যায়।'

'কথাটা বোঝ্ তাহলে। তোরা দেহধর্ম্মী মানুষ—দেহই তোদের ভগবান! তোদের আত্মার চারিদিকে রক্তমাংসের বেড়া। এমনি করে কি ভাল থাকতে হয় রে মাণিক আমার? এ তো মন্দ থাকার বাড়া! ভোগ আর ত্যাগ যেদিন ইচ্ছাধীন করতে পারবি সেইদিন জানবি একটু মনুষ্যত্ব জন্মেছে! সন্ধ্যা রাতটা যুবতী মেয়েকে নিয়ে দেহটা তোর লম্পট হয়ে রইল, বাকী রাতটা সেই মেয়ের বুকে শুয়ে নির্ব্বিকার চিত্তে ঈশ্বরকে ডাকলি, তবে না তুই মানুষ! খিদের জ্বালায় ছটফটাস্, পেটটি ভরল তো খাবার কথা কে ভাবে? তোরা তাও ভাবিস্! পেটে জায়গা নেই—ঘাঁটো সব খাবারগুলি—আঘ্রাণ নেও। মেয়ে-মানুষ দিবারাত্রি নিজের কথা ভাবছে, তোরা কেন চব্বিশ ঘণ্টা মেয়েমানুষের কথা ভাবিস্?'

'কৈ, ভাবি না তো মাতাজী?'

'ভাবিস কি না তুই তার কি জানবি মুখ্যু? সকালবেলা সেই সুন্দরী বৌটার দিকে একটিবারও তুই তবে তাকাস নি কেন? ওরে আমার আঁখি, তুমি সব দিকে তাকাও বাছা কিন্তু খবর্দ্দার ওদিকে তাকিও না, ওদিকে একটা সুন্দর মেয়েমানুষ আছে!' মাতাজী হাসিয়া উঠিলেন।

হেরম্ব বলিল, 'তা নয় মাতাজী। মেয়েটি কিছু মনে করবে বলে আমি তাকাই নি।'

'আমিও তো তাই বলছি রে! মেয়েটি মনে করবে, তার আত্মীয় মনে করবে, পাড়াপ্রতিবেশী মনে করবে, সংসারের সব লোক মনে করবে। শুধু তাকানো নয় বাবা, আরও হাজার খুটিনাটিতে বিশ্রী কিছু মনে করবে বলে সংসারের লোক ওৎ পেতে আছে। মেয়েপুরুষের সম্পর্ক ওদের ধর্ম্মকর্ম্ম ধ্যান

ধারণা—সদাই সচেতন হয়ে আছে, ভুলতে আর পারে না এক মিনিটের জন্যে। দূর দূর, সংসারে আবার ভদ্রলোকে থাকে!'

'কিন্তু মাতাজী, কি নিয়ে মানুষ তবে সংসারে থাকবে?

সংসার সম্বন্ধে স্থূল কথাটা মাতাজী মোটামুটি বোঝেন, এ প্রশ্নের সদুত্তর দিবার সাধ্য তাহার নাই। কতগুলি বাজে বকিলেন মাত্র। স্বামিজী হয়ত কিছু বলিতে পারিতেন।

॥ পৃষ্ঠা ৯৯-১০১ ॥

মাতাজী বলিলেন, 'পঞ্জিকায় শুধু সপ্তমী লিখেছে—আমাদের মতে কাল ছিল দিব্য-সপ্তমী। চতুর্দ্দশ ভুবন থেকে চতুর্দ্দশ দেবতা সাতটি জোড় বেঁধে ওইদিন মর্ত্ত্যে আসেন। ভুবন চতুর্দ্দশাৎ দেবতাঃ চতুর্দ্দশঃ মর্ত্ত্যমভিরম্যতে দিব্যসপ্তম্যাং তিথৌ। চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া অনূঢ়া কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে অমন দিনে বাড়ীর বার হলে কি রক্ষা আছে? কি হয়? —না, চতুর্দ্দশী কন্যাযুতা গৃহহীনস্য বিনাশঃ। বাড়ী ছেড়ে বার হওয়া গৃহহীন হওয়া ছাড়া কি মা!'

গৃহিণী সভয়ে বলিলেন, 'কি সর্ব্বনাশ! আর করালী নচ্ছার পাঁজি দেখে বললে যাত্রা শুভ!'

কর্ত্তা বলিলেন, 'শুধু করালী কেন—আমিও দেখেছি, কাল আর আজ যাত্রা শুভ।'

গৃহিণী বলিলেন, 'তবে? পকেট পাঁজি নয়—আট আনা দামের ডিকটরি পাঁজি, তাতে কি মিথ্যা লিখবে?'

মাতাজী মৃদু মৃদু হাসিলেন, বলিলেন, 'পাঁজিতে মিথ্যে লিখবে কেন বাছা? কাল আর আজ যাত্রা প্রশস্ত—কিন্তু সবাইএর পক্ষে কি? তা নয়! চোদ্দ-বছরের আইবুড়ো মেয়ে সঙ্গে নিয়ে কাল যারা বাড়ী ছেড়ে বেরিয়েছে তাদের একটা ভয়ানক বিপদ ঘটবেই। কি যোগাযোগ কি সংঘটন হয় সব কি পাঁজিতে লেখা থাকে? জানবে কোত্থেকে! অনেক তপস্যায় ও বিষয়ে দিব্যজ্ঞান জন্মে মা, অনেক লুপ্ত শাস্ত্র উদ্ধার করে অধ্যয়ন করতে হয়। পাঁজিতে লেখা শুভদিনে যাত্রা করে কতলোকের কত বিপদ ঘটেছে! সে কি অমনি ঘটে? কি কারণে কার পক্ষে শুভদিনও দারুণ অশুভদিনে দাঁড়াতে পারে কে তা বলতে পারে! তা না হলে সংসারে এত শোকতাপ কেন? দৈবশক্তির কাছে অজ্ঞান মানুষ বড় দুর্ব্বল বড় অসহায়। ভাল ভেবে মানুষ কাজ করে, কোথা থেকে মন্দ এসে পড়ে।'

গৃহিণী কয়টা শোক পাইয়াছিলেন কে জানে, শোকে অভিভূত হইয়া বলিলেন, 'তা সত্যি মা।'

একটি অল্পবয়সী বিধবা মেয়ে উদাস নয়নে জানালার বাহিরে চাহিয়া বসিয়াছিল, তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মাতাজী কতক্ষণ স্তব্ধ রহিলেন, শেষে বলিলেন, 'আহারে, এই বয়সে মায়ের আমার কপাল পুড়েছে! কি তুচ্ছ ত্রুটিতেই এমন দাগা তুই দিলি তারা? অজ্ঞান অবোধ সন্তানের সঙ্গে এ তোর কেমন খেলা জননী?' দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মাতাজী একেবারে ধ্যানস্থ হইয়া পড়িবার উপক্রম করিলেন।

গৃহিণী কাঁদিয়া বলিলেন, 'কি ত্রুটি হয়েছিল মা? কি জন্যে বাছার আমার এমন দশা হল?'

মাতাজীর দুই স্তিমিত নয়নে বিশ্বের করুণা জড়ো হইয়াছে,—সে খাঁটি জিনিষ, ছলনার সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই।

'হ্যাঁ মা, কুষ্ঠি মেলালি, শুভ লগ্নে কন্যা পাত্রস্থ করলি, এতই যদি করলি উত্তরে বাতাসটুকুকে আটকালি না কেন মা? যে দৈবী মায়ার নাড়ীনক্ষত্র জানে কেন তার কাছ থেকে মাদুলি এনে মেয়েকে ধারণ করালি না? আজ তোর মেয়ে স্বামী সোহাগিনী হয়ে থাকত!'

গৃহিণী বিহ্বলের মত বলিলেন, 'শ্রাবণ মাসে উত্তুরে বাতাস কোথা থেকে এল মা? আমরা অজ্ঞান অন্ধ, বুঝিয়ে দিন মা আমাদের। আপনি সব জানেন —' বলিয়া গৃহিণী টিপ করিয়া মাতাজীর পায়ে প্রণাম করিলেন। কর্ত্তা বুড়ামানুষ, উত্তেজনায় তিনি কাঁপিতে লাগিলেন।

মাতাজী বলিলেন, 'শীতকালে যে উত্তরে বাতাস আসে সে দোষের নয় বাছা। হিমাদ্রিশিখরাসীনা পার্ব্বতী পরমেশ্বরো, বাবা মহাদেবের রাজ্য থেকে যে বাতাস আসে তাতে কি কারো অমঙ্গল হয়? বর্ষাকালে বাতাস 'মেঘ-সংস্পর্শী'—সে বাতাসের কোন দিক নেই। উত্তরদিকের 'গবাক্ষ' কিনা জানালা হোক দরজা হোক, তাই দিয়ে যখন এ বাতাস দক্ষিণাভিমুখী গতি প্রাপ্ত হয়ে ঘরে ঢোকে তখনি গৃহস্থের অমঙ্গল হয়।'

'মাগো! উত্তরদিকের একটা জানালা তো খোলাই ছিল! গরম বলে শ্রীনাথ সেই জানালার ধারেই তো বসে ছিল অনেকক্ষণ!'

হেরম্ব সভয়ে ভাবিল, কন্যার বৈধব্যের অপরাধ শেষে ইহাদের ঘাড়ে না চাপিয়া বসে মাতাজীর কল্যাণে!

মাতাজী বলিলেন, 'যজ্ঞের কাঠ বেছে দিস নি কেন মা? অশ্বত্থের ডাল পুড়লে যে যজ্ঞের আগুন চিতা হয়ে যায়!'

হেরম্ব ভর্ৎসনার সুরে বলিল, 'সে কি মাতাজী?'

'শাস্ত্রে অশ্বত্থকে জীব বলে মেনেছে জানিস? অশ্বত্থের ডালের সঙ্গে জীবিত প্রাণীর বিচ্যুত অঙ্গের কোন তফাৎ নেই। মৃত অঙ্গ যে আগুনে পোড়ে তাকেই চিতানল বলে।'

হেরম্ব চুপি চুপি বলিল, 'আর নয় মাতাজী—তিনটে প্রাণীর বুক ফেটে যাবে।'

খড়্গপুরে নামিবার পূর্ব্বে মাতাজীর তিনটি মাদুলি পনের টাকায় বিক্রয় হইল। আর ভয় নাই। উত্তুরে বাতাস আসুক, যজ্ঞের আগুনে অশ্বত্থের ডাল পুড়ুক আর অজ্ঞাতসারে নির্ম্মম দেবতাদের কাছে যত অচিন্ত্যনীয় অপরাধ সংঘটিত হোক, মাদুলির গুণে সব দোষ কাটিয়া যাইবে।

'বুড়োবুড়ীকে চরণে ঠাঁই দিতে হবে মা।'

সুতরাং একজোড়া শিষ্যও মাতাজীর সংগ্রহ হইল।

স্বামিজী আনমনে বলিলেন, 'সাবাস মালতী। দিন দিন তোমার মাথা সাফ হচ্ছে।'

'নইলে খেতে কি? সকালবেলা তো দশদশটা টাকা দাতব্য করে এলে। তুমি আর আমার টাকা পয়সায় হাত দিও না বাবু।'

'আমি তবে দেশে ফিরে যাই?'

মাতাজী আর কথা কহিলেন না।

মাতাজীর একজন শিষ্য আসিয়াছিলেন, নাম অমৃতবাবু। গৃহে পদার্পণের জন্য তিনি কাকুতি মিনতি করিলেন।

'রাত্রের একসপ্রেসে হুস্ করে পুরী পৌঁছে যাবেন মা। কষ্ট করে দরকার কি?'

'তাই যাওয়া যাবে। বৌমা কেমন আছে বাবা?'

অমৃত বিমর্ষ হইয়া বলিলেন, 'অম্বলের অসুখটা সারছে না।'

'আচ্ছা, আনিস একবার সঙ্গে।'

'বাড়ী যাবেন না মা?'

'ওরে অমৃত, আমরা লোকালয়ে থাকি না এর মধ্যে ভুলে গেছিস বাবা!'

'ভুলি নি মা! সহরের বাইরে বাড়ী যে—মাঠের মধ্যে। খালি পড়ে ছিল, আপনাদের জন্য ঠিক করে রেখেছি মা। বাড়ীর মালিক হচ্ছেন সুরেনবাবু, ইঞ্জিনিয়ার—ধার্ম্মিক লোক।'

'বাড়ীতে কেউ থাকে না তো?'

'না:, চাকরবাকর দু'একজন আছে।'

'চল তবে।'

আনন্দ একটু তফাতে হেরম্বের কাছে দাঁড়াইয়া হাই তুলিতেছিল। তাহারা যে গাড়ীতে আসিয়াছে অল্পক্ষণের মধ্যে তাহা ছাড়িয়া যাইবে। সম্মুখে একটা খালি ফার্ষ্টক্লাস কামরা, গাড়ী ছাড়ামাত্র নিদ্রাতুর আনন্দের হাত ধরিয়া

[শেষ বাক্যটি অসম্পূর্ণ—অংশটি এখানেই শেষ হয়।]

॥ পৃষ্ঠা ১০৫ ॥

[কিছু]ক্ষণের জন্ত পুকুরঘাটে গিয়া হেরম্ব অবাক। মচা আনন্দে আনন্দ সমবয়সী একটি ছেলের সঙ্গে হাত কাড়াকাড়ি করিতেছে।

রাগ চাপিয়া হেরম্ব বলিল, 'কি করছ তোমরা ?'

আনন্দ বলিল, 'আমরা পাঞ্জা লড়ছি।'

'এই ছোকরাটি কে ?'

'ও ছোকরা নয়। ভাই অমৃতবাবুর ছেলে।'

বোঝা গেল পুরাতন বন্ধু। হেরম্ব ক্ষুব্ধ হইয়া ভাবিল, তাইত, আনন্দের জীবনের কুড়ি একুশটা বছর যে তাহার আয়ত্তে ছিল না। কতলোকের সঙ্গে ও বন্ধুত্ব করিয়াছে কে জানে। ছেলেমানুষ পাইয়া কত লোক হয়ত এমনি পাঞ্জা লড়ার ফিকিরে ওর সঙ্গে হাত কাড়াকাড়ি করিয়াছে। এমনি কত সমবয়সী যুবকের সঙ্গে হয়ত ওর ভালবাসা হইতেও বাকী থাকে নাই।

হেরম্বের আবির্ভাব দুই বন্ধু পছন্দ করে নাই। অথবা হয়ত ঘাটের খেলা তাহাদের শেষ হইয়াছিল। বৃহৎ বাগানের কোথায় যে তাহারা লুকাইয়া পড়িল হেরম্ব বুঝিতে পারিল না।

দুত্তোর, মরীচিকার পিছনে আর সে ছুটিবে না। খাইয়া উঠিয়া ষ্টেসনে হাজির হইবে, তারপর প্রথম যে গাড়ী পাইবে তাহাতেই একদম কলিকাতা। কলিকাতায় বন্ধু আছে, কাজ আছে, সিনেমা আছে থিয়েটার আছে। সহজ সরল সুন্দর জীবন সেখানে। সকলেই পর, হৃদয়ের তাই অবাধ বিশ্রাম।

[পাণ্ডুলিপি অনুসারে, বর্তমান পরিচ্ছেদের শেষ পৃষ্ঠা।]

॥ পৃষ্ঠা ১১২-১১৩ ॥

হেরম্ব হাত জোড় করিল। মনে মনে বলিল :

হে ঈশ্বর, হে জগতপতি, হে আদিম কল্পনা অনাদি হৃদয়রহস্ত, সর্বাঙ্গে শীতল চন্দন লেপন করিয়া যে আগ্নেয়গিরি শীতল হইতে চায়, তাহার ধ্বংসের তুমি সীমা রাখিও না। তোমার আকাশে যেমন করিয়া সূর্য্যের চেয়ে বৃহৎ তারকা নৈসর্গিক বিপর্য্যয়ে উল্কাবৃষ্টির মধ্যে নিভিয়া যায়, যেমন করিয়া তোমার ধূমকেতু আসিয়া চলিয়া যায়, আমার সমাপ্তিতে তুমি তেমনি বিপুলতা দান কর। মৃত্যুকে আজীবন আস্বাদ করিতে করিতে আমি যেন মরিতে পারি।

হেরম্বের চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। মন কিন্তু খানিক হাল্কা হইয়াছে। কার উপরে যেন দারুণ অভিমান হইয়াছিল, ঈশ্বরের কাছে এমন করিয়া প্রার্থনা নিবেদন করিয়া কাঁদিয়া সে অভিমান অনেকখানি গলিয়া গেল। এখন আনন্দের মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দৃষ্টি ক্লান্ত করিয়া ফেলাও বোধ হয়

সহিবে। নাভিগন্ধে পাগল হইয়া যে মৃগ ছুটিয়া আসিয়াছিল দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান হারাইয়া, পুষ্পগন্ধে খানিক বিশ্রাম পাইয়া সে অনেকটা সুস্থ হইয়াছে।

প্রাঙ্গণে নামিয়া পাথর বাঁধানো উঁচু চত্বরে বসিয়া নিজেকে হেরম্বের বড়ই পুরাতন মনে হইতে লাগিল। বহুকাল কে যেন কি দিয়া তাহাকে ব্যবহার করিয়াছে। আনন্দের সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক আছে কি না হেরম্ব তাহাই ভাবিয়া দেখিতেছিল, সরসী আসিয়া কাছেই বসিল।

'এই যে আপনি।'

'বাঃ, আপনাকেই আমি খুঁজছিলাম।'

মিথ্যা বলা হইল নাকি, আনন্দ সামনে নাই বলিয়া? কিন্তু হঠাৎ সরসীকে দেখিয়া সত্যই হেরম্বের মনে হইয়াছিল সে বাঁচিয়াছে। বিদেশে দুঃখের দিনে পরমাত্মীয়ার দেখাই যেন মিলিয়া গেল।

সরসী বিশেষ খুসী হইল না। এরকম খোঁজা সে বুঝিতে পারে না।

'আমি ছিলাম রূপাইকুড়া, এখানে আমায় খুঁজছিলেন কি রকম?'

হেরম্ব সবিস্ময়ে বলিল, 'রূপাইকুড়ায় ছিলেন তো এখানে এলেন কি করে?'

সরসী অস্ফুটস্বরে বলিল, 'কথার ভটচায্যি।'

একাদশ পরিচ্ছেদ

সেখানে বসিয়া কথা বলিতে সরসী রাজী হইল না। তাহার শ্বশুরবাড়ীর সম্পর্কের একটি পরিবার পুরীতে আসিয়া আছেন, বৌকে এরকম দায় তার সঙ্গে গল্প করিতে দেখিলে তাহারা কি বলিবেন?

সরসীর চাকর গাড়ী ঠিক করিয়া খবর দিল। তাহারা মন্দিরের বাহিরে আসিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

সরসী বলিল,'তিন দিন হল এসেছি। অনেকদিন পুরী বেড়িয়ে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল, ওঁকে বলে ক'য়ে চলে এলাম। আপনাকে পুরীতে দেখতে পাব ভাবি নি।'

কথাটা অবশ্যই মিথ্যা। সরসীর আবার বেড়ানোর সখ। তার যা কিছু সম্পত্তি সমস্তই আগেভাগে দাম দিয়া ফেলিয়া সে বলে আপশোষে মরিয়া যাইতেছিল—একটা কানাকড়ির জিনিষও বেচায়া পায় নাই।

কেদারের চাপরাসি পার্সেল নিতে আসিয়াছিল অবিনাশের ষ্টেসনে। অবিনাশ তাহার কাছে হাকিমবাবুর শালার সন্ন্যাসীর দলে ভিড়িয়া পুরী যাওয়ার গল্প বলিতে ছাড়ে নাই। হেরম্ব কলিকাতা গেলে তার একহাজার মুখপোড়া বিড়ি ছুটিত।

'বুঝলে চাপরাসি, মাতাজী হলেন সন্ন্যাসী ভৈরবী মানুষ, ওঁদের এতে কোন দোষ হয় না। বলতে কি, সাধনার জন্য এসব ওঁদের দরকারই হয়। কিন্তু হেরম্ববাবুর একি কীর্ত্তি বলত! ওর দিদিমার বয়সী যে!'

চাপরাসির কাছে খবর শুনিয়া দিদি ভাবিয়া আকুল। সে তখন মাতাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া সম্বন্ধে সরসীর কাছে পত্র লিখিয়া পাঠাইবে বলিয়া রাখিয়া দিয়াছে। পত্র খুলিয়া পুনশ্চ দিয়া লিখিল :

'হেরম্ব এখান থেকে কলকাতা চলে যাবে জানতে, তা না গিয়ে সে মাতাজীর সঙ্গে সন্ন্যাসী হয়ে পুরী চলে গেছে। বৌ আর খোকা মারা যাবার পর থেকে ও কিরকম হয়ে গিয়েছিল সেসব তোমায় বলেছি। কিন্তু ও যে এমন করে সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে যাবে একথা স্বপ্নেও ভাবি নি। এমন [ভাগ্য ?] করে জন্মেছিলাম যে আমার একটি মাত্র ভাই…'

পত্র পাইয়া মনে মনে সরসীর সে কি রাগ! বটে? সন্ন্যাসী হইয়া যাওয়া হইল আর এখানে বাবু দু'টা দিন থাকিতে পারিলেন না।

সেদিন সে গরুর দুধও জ্বাল দিল না, অশোককে ভাল করিয়া খাওয়াইলও না। পড়িয়া পড়িয়া খুব একচোট কাঁদিল।

অশোক বলিল, 'আরে! কাঁদ কেন?'

'এখানে থাকলে আমি মরে যাব।'

'কোথায় যাবে?'

'পুরী।'

'পুরী কি জন্ত?'

'আমি সমুদ্র দেখব।'

অশোক চিন্তিত হইয়া বলিল, 'এখন কি ছুটি পাব? মাসখানেক পরে গেলে হবে না?'

সরসী বিছানায় উঠিয়া বসিল। বিবাহের পর আজ প্রথম তাহার মেজাজ খারাপ হইয়াছে।

'কাল যদি আমায় তুমি পুরী না নিয়ে যাও—'

পরদিন হইল না, তার পরের দিন যাওয়া হইল। একদিন দেরী করিতেও সরসীর ভয় হইতেছিল কিন্তু কি করে, অশোকের চাকরী যাওয়াটাও কম ভয়ের কথা নয়।

পুরী পৌঁছিয়া সরসী কিন্তু মাতাজীর ওখানে গিয়া উপস্থিত হইতে পারিল না, একটা খবরও পাঠাইতে পারিল না। এতদূর আসিয়া এইটুকু যাইতে তাহার লজ্জা করিতে লাগিল। মেয়েমানুষ কি অত সস্তা করিতে পারে নিজেকে?

সরসী সকাল বিকাল মন্দিরে হত্যা দিয়া রহিল, মন্দিরে না আসিয়া হেরম্ব যাইবে কোথায়? কিন্তু আকাশ ভাঙ্গিয়া বৃষ্টিই শুধু আসে, হেরম্ব আসে না। বৃষ্টির মধ্যে গাড়ী করিয়া সরসী দুইবেলা মন্দিরে আসে, প্রবেশপথের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, আর মনে মনে বর্ষাকে অভিশাপ দেয়।

দেবতার দিকে পিছন ফিরিয়া বেলা কাটাইতে সরসী ভয় পায় না।

দুইদিকেই তার জ্বালা। হেরম্বের দেখা মেলে না, অশোকের কষ্টের সীমা থাকে না। একদিন সরসীর সঙ্গে মন্দিরে আসিয়াই অশোকের সর্দ্দিজ্বর হইয়া গিয়াছে, সে না পায় একটু সেবাযত্ন, না পায় সময়মত পথ্য।

অশোক বাড়ীতে শুইয়া থাকে, মন্দিরে তার জন্য সরসীর মন কাঁদে। তিনটা দিন তার বড় দুঃখেই কাটিয়াছে।

গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলে সরসী বলিল, 'কই, সন্ন্যাসী হবার তো কোন লক্ষণ দেখছি না।'

'কে বললে আমি সন্ন্যাসী হয়েছি?'

'দিদি কেঁদে কেটে আমায় এই এত বড় এক চিঠি লিখেছেন। আপনি নাকি সন্ন্যাসী হয়ে কলকেতার বদলে পুরী চলে এসেছেন!'

'সন্ন্যাসী হতে যাব কোন দুঃখে? আমি এখানে বেড়াতে এসেছি।'

'বোনকে একখানা চিঠিও তো লিখতে হয়?'

আনন্দকে ভালবাসিবার হিড়িকে হেরম্বের নাওয়া খাওয়া ছিল না, বোনকে চিঠি লেখা! কিন্তু কত বড় অন্যায় হইয়া গিয়াছে কাজটা?

হেরম্ব লজ্জিত হইয়া বলিল, 'লিখি লিখি করে হয়ে ওঠে নি। এইবার লিখব।'

'আর লিখেছেন। আমি আপনার নাম দিয়ে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিয়েছি যে এখানে বেড়াতে এসেছিলেন, বিকালের গাড়ীতে কলকাতা ফিরছেন। বাবা, ওইটুকু ইংরেজীতে লিখতে একেবারে গলদঘর্ম্ম! বিদ্যে কত! ভুল যে কত করেছি—'

লিখিতে গলদঘর্ম্মই হোক আর যাই হোক সে যে ইংরাজী জানে হেরম্বকে এ খবরটা দিতে সরসীর বেশ লাগিতেছিল, খুব খানিকটা হাসিয়া নিয়া সে বলিতে লাগিল, 'আপনার নামটাই ভুল হয়ে গেছে! হেরম্বতে এইচ ই আর এ এম্ বি এ হতে তো? আমি লিখেছি এইচ এ—হরম্ব হয়ে গেছে!'

হেরম্ব ক্ষুব্ধ হইয়া বলিল, 'আপনি ও কথা লিখতে গেলেন কেন?'

'তাতে কি! ওরা মনে করবে পোষ্টাপিসের কেরানী ভুল করেছে।'

'সেজন্য নয়। দিদির সঙ্গে আমি ছুয়াচুরি করি না।'

'অন্যসকলের সঙ্গে করেন?'

গাড়ী বাড়ী নয় বলিয়া সরসী বেশ কথা কহিতেছে। রূপাইকুড়ায় সে কি এমনভাবে আলাপ করিতে পারিত? তাহাদের সম্পর্ক হয়ত এতদিনে ওর মনের মধ্যে সহজ হইয়া আসিয়াছে। প্রেমালাপে তাই এত বাস্তবতার আমদানী।

॥ পৃষ্ঠা ১১৯ ॥

কে যেন আঁচল ধরিয়া টানিয়া রাখিতে চায়। সে অশোকের মুখের দিকে তাকাইবে। অশোক ঘুমাইয়া আছে। কি সুন্দর ওর ঘুমন্ত মুখখানি! ও তার

স্বামী, ও তার সর্ব্বস্ব ! চাহিয়া থাকিতে থাকিতে সরসী দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়াছে, বুকে তার অসহ্য যন্ত্রণা হইতেছে। সরসী গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জ্জন দিতেছে, সরসী স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যাইতেছে, আজ সরসীর জহরব্রতের সূচনা। কাঁপিতে কাঁপিতে সরসী তাহার ঘরে আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সেমিজ খুলিবে।

অশোকের বাড়ীতে থাকিয়া তার বৌকে কাঁদানো চলে না।

শুনিয়া সরসী কাঁদিবার উপক্রম করিয়া বলিল, 'কেন, থাকবেন না কেন ?'

'থাকা কি উচিত ?'

'উচিত তো সবই ! কি করে কি হবে তা হলে ?'

হেরম্ব তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহিল, 'বাড়ীতে অতিথি হওয়া ছাড়া আপনি যা বলবেন আমি তাই করব !'

চোখের জলের মধ্যে সরসী হাসিল।

বাড়ী পৌঁছিয়া তাহারা দেখিল অশোকের জ্বর ভয়ানক বাড়িয়া গিয়াছে। তার চোখ ভারি লাল, সে ছটফট করিতেছে। জ্বরের ঘোরে সে বোধ হয় নাকের নীচে ব্রণটা চুলকাইয়াছিল, চিবুক পর্য্যন্ত একটি রক্তের রেখা শুকাইয়া আছে।

সরসী যেন আধমরা হইয়া গেল। একমুহূর্ত্তে তার মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গিয়াছে, তার যেন দাঁড়াইবার ক্ষমতা নাই।

'ওগো, তোমার কি হল গো ?' বলিয়া সে ধপ করিয়া বিছানায় বসিয়া পড়িল, 'তোমায় যে ভাল দেখে আমি মন্দিরে গিয়েছিলাম !'

আহা, দুঃখী মেয়েটির রকম দেখিলে চোখে জল আসে। এই কপালে বুকে হাত দিয়া জ্বর দেখিয়া শিহরিয়া উঠিতেছে, এই নিজের পরিচয় দিয়া ব্যাকুল-ভাবে স্বামীকে ডাকিতেছে, পরক্ষণে হতাশভাবে মাথা নাড়িয়া বলিতেছে, 'পোড়াকপালীকে উনি আর চিনবেন না গো, চিনবেন না ?'

তারপর রাগিয়া বলিতেছে—

'এখনো ডাক্তার এল না ? কি করচেন আপনারা !'

বলিয়া অশ্রুপ্লাবিত মুখ তুলিয়া হেরম্বের দিকে চাহিয়া দাঁত দিয়া ঠোঁট কামড়াইয়া ধরিতেছে।

হেরম্ব বিশ্রী মুখভঙ্গি করিয়া বলিতেছে, 'আসছে ডাক্তার—আসছে।'

[একাদশ পরিচ্ছেদের শেষ হতে আর একটি পৃষ্ঠাই বাকি ছিল।]

॥ পৃষ্ঠা ১২১-১৩৬ ॥

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

অশোক না হয় মরিবে, তাই বলিয়া প্রেমিককে অমন মরণাধিক অপমান সরসী কি বলিয়া করিল ? হেরম্ব ভালবাসে না বলিয়া রক্ষা, ভালবাসিলে এ

আঘাত কি সে সামলাইতে পারিত ? সরসী অমন বুদ্ধিমতী মেয়ে হইয়া এ করিল কী ? একটি সন্ধ্যায় সরসী যে তার অচেনা লক্ষ লক্ষ সাধারণ মেয়ের ভিড়ে হারাইয়া গেল ইহার উপায় সরসী কি করিবে ?

আজ তিনদিন হেরম্ব আনন্দের মায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া আছে, তার অঙ্গ অবসন্ন, মন নিরুৎসাহ, সারাদিন তার হাই তোলা আর আলস্য। আনন্দ বেড়াইতে যাইতে চায়, হেরম্বকে কাকুতিমিনতি করে, কিন্তু বাহিরের পৃথিবীর ও পার্থিব জনতার সংস্পর্শে নেশা টুটিয়া যাইবার ভয়ে হেরম্ব ঘর ছাড়িয়া নড়ে না।

আনন্দর একাকী বাহিরে যাওয়া নিষেধ, সে অনুযোগ করিয়া বলে, 'এই বুঝি আমাকে আপনি ভালবাসেন ?'

হেরম্ব বলে, 'তুমি যাও না আনন্দ, সমুদ্রের ধারে বালিতে গিয়ে খেলা কর। আমি জানালা দিয়ে তোমায় তাকিয়ে দেখব।'

'দূরে—অনেকদূরে,—'আনন্দর চোখ ছলছল করে, 'খুব দূরে যেতে না পারলে ভারি বেড়ানো ! আমি যাব না।'

'না, যাও। লক্ষ্মী।'

'একা যেতে আমার ভাল লাগে না।'

'যাও, আমি কাল যাব। তুমি সমুদ্রের ধারে দাঁড়ালে জানালা দিয়ে দেখতে আমার বড় ভাল লাগে !'

শুনিয়া কপাল চাপড়াইয়া মাতাজী বলেন, 'যতো পাগল কি জোটে এসে আমার ভাগ্যে !'

স্বামিজী এখনো ফেরেন নাই। মাতাজীর বিশ্বাস, মিশে ভাগিয়াছে, আর আসিবে না। তিনি আবার অন্নবিস্তর কারণ পান আরম্ভ করিয়াছেন,—হেরম্ব রীতিমত প্রসাদ পাইতেছে।

'কারণ অতি উত্তম পদার্থ, মাতাজী।'

মাতাজী মুখ বাঁকাইয়া বলেন, 'আর মেয়েমানুষ ?'

'হা হাঃ, মেয়েমানুষ কি পদার্থ ? মেয়েমানুষ—' অর্থাৎ মেয়েমানুষ অপদার্থ, হেরম্ব এই রসিকতাটুকু করিতে চায়, কিন্তু মাতাজী কাপড় তুলিয়া জঙ্ঘা চুলকাইতে আরম্ভ করিয়াছেন দেখিয়া আর সাহস পায় না, ওইখানে ইতি করে। স্বামিজীর অনুপস্থিতির চাপে মাতাজীর মুখ দিয়া আজকাল গলগল করিয়া যে গরল বাহির হয়, সে সহ্য করিবার ক্ষমতা হেরম্বের নাই।

বলেন, 'তুই তো একনম্বর লম্পট, তোর আবার লজ্জা কি ?'

হেরম্ব ভাবে, জীবনে শুধু যে একরাত্রির জন্য তাহার পদস্খলন হইয়াছিল সে বার্তা মাতাজীকে শুনাইয়া দিবে নাকি ? কিন্তু মাতাজী[র] বক্তব্য যে বাক্যের অর্থে নয় এইটুকু বুঝিবার উদারতায় কিছু না বলাই সে সঙ্গত মনে করে।

স্বামিজীর বিরহে মাতাজীর খেপিয়া যাওয়ার অধিক বিলম্ব নাই। একটি সুন্দরী বৌ স্বামীর সঙ্গে দীক্ষা নিতে আসিয়াছিল দিন দুই আগে, কারণের পাত্র নামাইয়া মাতাজী বলিয়াছিলেন :

'দীক্ষা নিবি ? দূর ! দূর !'

'অনেক আশা করে এসেছি মা, নিরাশ করবেন না।'

'মরণ তোদের আশার।'

'চরণে ঠাঁই দিতেই হবে মা।'

মাতাজীর সেকি রাগ !

'চিতায় ঠাঁই নিবি যা। দীক্ষা যে নিবি শালী, পরস্পরকে না ছুঁয়ে থাকতে পারবি তোরা ? ভগবানের নাম নিয়ে বলতে পারবি স্বামীকে ছুঁলে আমি যেন বিধবা হই ?'

মেয়েটি স্বামীর হাত ধরিয়া চলিয়া গেলে মাতাজী গম্ভীর গলায় বলিলেন, 'জানিস হেরম্ব, ও মেয়েটার কপালে শীগগির বৈধব্য আছে !'

মেয়েটির আহত মুখভঙ্গি দেখিয়া মাতাজীর উপর হেরম্ব বিশেষ খুসী হয় নাই।

সে বলিল, 'একি মাতাজীর মনস্কামনা না ভবিষ্যৎ দৃষ্টি মাতাজী ?'

শুনিয়া মাতাজী চটিয়া লাল !

'বেরো তুই আমার বাড়ী থেকে। দূর হ'। আমার বাড়ী বসে আমাকে তুই গাল দিবি হারামজাদা ?'

তখন যে মধুর ব্যাপার ঘটিল হেরম্ব জীবনে তাহা ভুলিবে না। বার কয়েক ঠোঁট ফুলাইয়া আনন্দ কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

মাতাজী সবিস্ময়ে বলিলেন, 'তুই কাঁদিস কেন লো ছুঁড়ি ?'

না,

'ওকে বোকো না মা, উনি চলে যাবেন।'

সেখানে ইতি নয়, সেইখানে আদি। মাতাজীর ইঙ্গিত ছাড়াই হেরম্ব পান-পাত্র তুলিয়া নিয়া ঢকঢক করিয়া সমস্তটুকুই গিলিয়া ফেলিল, গলায় আগুন লাগিলে, বুক পুড়িয়া গেলে, মাথা ঘুরিয়া উঠিলেও এখন তার আরাম। মাতাজীর কড়া মদ কি আর আনন্দের দেওয়া আনন্দের চেয়ে কড়া !

অথচ, হেরম্ব আগাগোড়াই জানে আনন্দের পক্ষে প্রেম অসম্ভব, অপ্রকৃত। এমন অনৈসর্গিক সম্ভাবনাকে স্বীকার করিয়া নিতে বাধিল না বলিয়া সে কিন্তু কিছুমাত্র বিস্মিত হইল না। সে যদি পাথরকে এমন ভাবে ভালবাসিত, পাথরও যেন প্রতিদান দিত। আনন্দ পাথর নয়।

পাথরের চেয়ে নীরস হওয়াই অবশ্য আনন্দের পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু হেরম্বের প্রেমের দাপটে স্বভাবকে অতিক্রম না করিয়া বেচারা পারে নাই।

বৃষ্টিবাদল শেষ হইয়া গিয়াছে, দুইবেলা সমুদ্রতীর নরনারীতে ভরিয়া যায়। ছোট ছেলেমেয়েরা ঝিনুক কুড়ায়, আর ঝিনুক কুড়ায় বৌ আর যুবতী মেয়েরা। তাহারা সকলেই ঝিনুক কুড়ায়। সমুদ্র এখন প্রশান্ত। ঢেউয়ের তালে নাচিতে নাচিতে ভেসে ডিঙ্গিগুলি তীরের আর দূরের মধ্যে আনাগোনা করে, তীরের কাছে ভীরু বাঙ্গালী মেয়ে স্নানের ছলে বালি মাখে, যারা একটু সাহসী, দুলিয়ার হাত ধরিয়া তারা খানিক আগাইয়া যায় এবং বড় ঢেউ আসিলে সঙ্গীকে সবলে জড়াইয়া ধরে।

জড়াইয়া ধরিবার শিক্ষাটা ওদের পুরাপুরিই হইয়া আছে।

সমুদ্রস্নান করিতে আনন্দ বড় ভালবাসে। নৃত্যের মত সাঁতারেও তার যেন স্বাভাবিক প্রতিভা আছে। সোনালী চিকন জলদেবতার মত স্বচ্ছ সুনীল জলে সে ডুব দেয়, তার পায়ের তলে সমুদ্রতলের বালি ঝিকমিক করে, ছোট মাছের ঝাঁক তাহাকে অতিক্রম করিয়া যায়। উপরে ভাসিতে ভাসিতে হেরম্ব নিশ্বাস রোধ করিয়া চাহিয়া থাকে।

ভাসিয়া উঠিয়া হাঁপ ছাড়িয়া আনন্দ বলে, 'তলা ছুঁতে পারলাম না, দম আটকে এল।'

হাত পা ছুঁড়িয়া মনের আনন্দে সে জল ছিটায়, লোনা জল মুখে গেলে ওয়াক্ ওয়াক্ করিয়া অত্যন্ত হাসে।

'ধরুন তো ?' বলিয়া তরতর করিয়া সাঁতার দিয়া সে পালায়, হেরম্ব শত চেষ্টাতেও তার নাগাল পায় না।

তারপর হাত পা এলাইয়া দিয়া আনন্দ হাঁ করিয়া হাঁপায়, সে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। বলে, 'কতদূর চলে এসেছি ! ফিরব কি করে ?'

হেরম্ব একঢোঁক লোনা জল গিলিয়া বলে, 'আমায় ধরে বিশ্রাম কর।'

'ইস্ ! ধরুন তো ?'

আনন্দ তীরের দিকে সাঁতার দিতে আরম্ভ করে, কিন্তু শ্রান্ত শরীরে আর জোরে যাইতে পারে না। হেরম্ব পাশে পাশে তাহার সঙ্গে চলে। সে ভাল সাঁতার জানে না, হাত পা যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতে চায়। তবু সে বলে, 'আমায় ধর না আনন্দ ?'

আনন্দ ম্লান হাসিয়া বলে, 'আপনি যে ছুঁতে বারণ করেছিলেন ?'

সে যেন ঐতিহাসিক, তিনদিনের পুরানো কথা ভোলে নাই। ব্যাপারটা খুবই সাধারণ। হেরম্ব ঘরে শুইয়া ছিল, এমনি সময় চটাপট চটাপট শব্দে বাহিরে শিল পড়িতে আরম্ভ হওয়ায় আনন্দ আর আনন্দে আপনাকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। ছুটিয়া ঘরে গিয়া হেরম্বের বুকে উপুর হইয়া পড়িয়াছিল।

তার বুকের চাপ লাগিয়াছিল হেরম্বের বুকে।

হেরম্ব বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। আকস্মিক তীব্র [বেদনার ?] আনন্দকে সে কি বলিয়াছিল তার স্মরণ নাই।

[এরপর আড়াই লাইন অংশ এমনই ছিন্নভিন্ন যে পাঠোদ্ধার অসম্ভব। পরের বাক্যটিও তাই মাঝখান থেকে শুরু হয়েছে।]

…চেয়ে তার আর বড় প্রমাণ কিছু হয় না। এ স্মৃতি আনন্দের হৃদয়ের নয়, মস্তিষ্কের ; এ প্রতিক্রিয়া অনুভূতির নয়, বুদ্ধির।

তারপর বিকালে সরসী আসিল। রাত জাগিয়া কাঁদিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া সে সারা হইয়া গিয়াছে। রুক্ষ চুলে জটা বাঁধিয়াছে, চোখের কোলে কালো দাগ পড়িয়াছে, ঠোঁট শুকাইয়া ফাটিয়া গিয়াছে।

বলিল, 'একজন অসহায়া মেয়েমানুষের হাতে অমন একটা রোগীকে ফেলে কি করে আপনি ডুব মেরে রইলেন হেরম্ব বাবু ?'

লজ্জায় হেরম্ব মাথা হেঁট করিয়া রহিল।

'পরেও অমন করতে পারত না।'

হেরম্ব যেন তার পর নয়।

হেরম্ব ভয়ে ভয়ে বলিল, 'অশোক একটু ভাল আছেন না ?'

'কই আর আছেন ?'

'চলুন, দেখে আসি।' বলিয়া আকস্মিক উৎসাহে হেরম্ব উঠিতে গেল। তাহাকে দমাইয়া দিয়া সরসী বলিল, 'আর দরকার নেই। ঢের লোক এসে গিয়েছে। আমার দাদা এসেছে, ওঁর ভাই এসেছে,—আপনি গিয়ে কি করবেন ? কেউ যখন ছিল না তখন যদি একবার দু'বার দয়া করে যেতেন—'

কিছুতেই রেহাই দিবে না। হেরম্ব যে লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়াছে তাহাতে সরসীর তৃপ্তি নাই। হেরম্ব নাকে খত দিলেও সে খুসী হইত কিনা সন্দেহ।

কারণ, হেরম্বের অপরাধের মার্জ্জনা নাই। তাহার মরণাপন্ন স্বামীর জীবন-রক্ষার জন্য হেরম্ব কোন চেষ্টা করে নাই, সে যদি এজন্য সমস্ত জীবন ধরিয়া অনুতাপ করে তবু সরসী তাহাকে ক্ষমা করিবে না।

সমস্ত সময় ওই কথা নিয়া অনুযোগ দিয়া সরসী আধঘণ্টা খানেক রহিল। আনন্দকে পরিহাস করিয়া বলিল, 'ছোট ঠাকুরের রূপ যে দিন দিন উথলে উঠছে !'

ঈর্ষায় সরসীর মন জ্বালা করিতেছিল। সে আবার বলিল, 'ছোট ঠাকুর আজকাল মস্ত সন্ন্যেসী। বিদ্বান বড়লোক শিষ্য দিবারাত্রি চরণে লুটিয়ে থাকে।'

আনন্দ অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে সরসীর অঙ্গভঙ্গি লক্ষ্য করিতেছিল, সরসীকে সে পূর্ব্বেও দেখিয়াছে কিন্তু তাহার অপূর্ব্ব যৌবন আজই প্রথম তাহার চোখে

পড়িল। তাহার অনমিত উদ্ধত স্তনভার, তাহার ক্ষীণ কটি, তাহার স্থূল গম্ভীর অনুঅঙ্গ সমস্ত আশ্চর্য্য, অতি আশ্চর্য্য!

যাওয়ার আগে সরসী মাতাজীকে প্রণাম করিল।

'যা বাছা তুই। আশীর্বাদ আমার।'

'ওর বড্ড অসুখ মা।'

মাতাজী স্তিমিত হইলেন।

'কার রে?'

'ওর মা। বাঁচবার আশা নেই।'

মাতাজী সরসীর চিবুক ধরিয়া মুখ উঁচু করিয়া বলিলেন, 'কে তোকে এমন নিরাশ করেছে মা যে চোখের জলে বুক ভাসছে?'

'ডাক্তার বলেছে মা।'

'ডাক্তার ছাই জানে।'

মাতাজীর পায়ে লুটাইয়া সরসী ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।—'আপনি ওঁকে বাঁচান মা, ওঁকে আপনি বাঁচান।'

কারণ খাইয়া সমস্ত রাত্রি মাতাজী বেহুশ হইয়া পড়িয়া রহিলেন। আনন্দ কাঁদিয়া বলিল, 'মা মরে যাবে।'

হেরম্ব বলিল, 'কেঁদো না আনন্দ।'

'মা মরে যাবে।'

'মরবেন কেন? কেঁদো না। তোমার পায়ে পড়ছি, তুমি কেঁদো না আনন্দ।'

'আমার মা মরে যাবে। ওগো, আমার মা মরে যাবে।'

'আঃ, তুমি বড় অবাধ্য।'

না,

'আপনি ওঁকে বাঁচান, ওঁকে আপনি বাঁচান।'

হা হা, আনন্দ পরিহাস করিতেছে। বাঃ! মাতাজীর জন্য আনন্দের স্নেহও যে শুধু অভ্যাস এতদিনে তাহা বেশ বোঝা গেল। ইহার কাছে কি আশা করা যায়?

শুধু অকৃত্রিম ছলনা। হায়, প্রকৃতি!

সকালে উঠিয়া মাতাজীর খুব ব্যস্ততা দেখা গেল। হুড়হুড় করিয়া জল ঢালিয়া তিনি স্নান করিলেন, তারপর বাহিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

আনন্দ বলিল, 'কোথায় যাচ্ছ মা?'

'মন্দিরে যাচ্ছি।'

হেরম্ব সন্দিগ্ধভাবে বলিল, 'হঠাৎ?'

মাতাজী কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিলেন, 'মন্দিরে যাব তার আবার হঠাৎ ফিরে ছোড়া ?'

আনন্দ বলিল, 'আমি তোমার সঙ্গে যাব মা।'

'না, তুমি বাড়ীতে থাকো, সোনা আমার।'

এই বলিয়া মাতাজী চটপট বাহির হইয়া গেলেন।

হেরম্ব সঙ্গে বাহির হইয়া বলিল, 'মন্দিরে পৌঁছে দেব মাতাজী ?'

'কেন, আমি যেতে জানি না ?'

'তবু—'

'ফিরে যা হেরম্ব, ফিরে যা। আমার স্বাধীন চলাফেরায় বাধা দিলে এমন শাস্তি পাবি, জন্মে ভুলবি না।'

'কি শাস্তি দেবেন মাতাজী ?'

'আনন্দকে সঙ্গে নিয়ে যাব, তোকে নেব না। চোখের দেখাও দেখতে পাবি না।'

'মাতাজী, আর দুটো দিন থেকে যান। এ বড় আকস্মিক হল।'

মাতাজী হাসিয়া বলিলেন, 'হ্যাঁরে মুখ্যু, তুই না ভালবাসিস ?'

হেরম্ব চুপ করিল এবং দাঁড়াইল। মাতাজী অগ্রসর হইয়া গেলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

পুরীতে আসিয়াই মাতাজী যে ধনী ভক্তটিকে আয়ত্ত করিয়াছিলেন, তার নাম অক্ষয়। বৈকালে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তিনি উপস্থিত হইলেন।

'সর্ব্বনাশের কথা, মাতাজী কোথায় গেলেন আজ হঠাৎ ?'

'কোথায় ?'

'আমি তো তাই জিজ্ঞাসা করছি। কাল আমার বাড়ী হোম করবেন, আর আজ উনি চলে গেলেন ? ছোট শালাকে তুলে দিতে ষ্টেসনে গিয়েছিলাম, দেখি মাতাজী সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় বসে আছেন। সঙ্গে মোটাসোটা একজন সন্ন্যাসী—'

স্বামিজী রোগা।

হেরম্ব বলিল, 'তারপর ?'

'কোথায় যাচ্ছেন জিজ্ঞাসা করতে মাতাজী একেবারে খেঁকিয়ে, মানে, ধমকে উঠলেন। তা ধমকান্, সন্তানের তাতে দুঃখ নেই, কিন্তু আমি এখন কি করি ? ছ'সাত শ' টাকার জিনিষপত্র কিনেছি, সব নষ্ট হবে নাকি ?'

'মাতাজী ফিরে এলে হোম হতে পারবে।'

'অসম্ভব। এ যা হোম, কাল ছাড়া বারো বছরের মধ্যে আর দিন নেই।'

'অন্য কাউকে দিয়ে করান না ?'

'মাতাজীর হোম অন্তে পারবে কেন ?'

চারিদিকেই মাতাজী আঁটঘাঁট বাঁধিয়া গিয়াছেন। কি একখানা ব্রেন!

উঠিবার আগে অক্ষয় বলিলেন, 'মাতাজী দুশো টাকা আগায় দক্ষিণা নিয়েছেন, তা নিন্, সেজন্য দুঃখ নেই, বরং আনন্দেরই কথা—সৌভাগ্য। কিন্তু হোম হবে না, বড় দাগা লাগল প্রাণে।'

আনন্দ সবিস্ময়ে বলিল, 'হোম না হলে প্রাণে দাগা লাগবে কেন ?'

হেরম্ব বুঝাইয়া বলিল, 'মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক এমন ঘনিষ্ঠ যে একজনের প্রাণে দাগা লাগলে অনেকের প্রাণে দাগা লাগে।'

'দাগা কি ?'

'দাগা ? দাগা হচ্ছে দাগ—পুড়ে গেলে যে দাগ থাকে তাই।'

আনন্দ বুঝিতে পারিল না কিন্তু গম্ভীর হইয়া বলিল, 'আগুনে পুড়লে ভীষণ জ্বালা করে—প্রাণে দাগা লাগলে প্রাণও বুঝি জ্বালা করে ?'

'হ্যাঁ গো, করে। আগুনে পোড়ার চেয়েও বেশী জ্বালা করে।'

'সত্যি ?'

আনন্দের আজ বেড়ানোর সাধ নাই। ঘরে বসিয়া থাকিতে আজ তাহার ভাল লাগিতেছে। রোগটা হেরম্বের এবং অবশ্যই সংক্রামক কিন্তু আনন্দের পক্ষে নয়, তাহার অসুখ মৌলিক।

সন্ধ্যার পর চাঁদ উঠিল। কত অপোগণ্ড শিশু নরনারী এই চাঁদের আলোয় পরস্পরের গালে চুমা দিতেছে কে জানে ? মেয়েটির গলায় নকল মুক্তার মালা —তারই চিঠি পাওয়ার আনন্দে সাইকেল হইতে পড়িয়া ছেলেটির হাত ভাঙ্গিয়াছে। হাঁটু কাটিয়া রক্তারক্তি। ওরা বাঁচিয়া থাক্। ওরা সাধারণ ওরা স্বাভাবিক, জগতে ওরা সব চেয়ে দামী। লৌহ ব্যবসায়ীর সংযম ওদের, দৃঢ়, কঠিন, নীরস ;—বছরে একটির বেশী খোকাও নয়, খুকীও নয়।

একটু অধরসুধা খাইয়া আজ ওরা উপবাস করিবে, কারণ আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। না, সেজন্য নয়, ক্ষুধা পায় নাই বলিয়া। কালের জন্য ওদের ভুঁড়ি-ভোজনের ব্যবস্থা।

হেরম্বের কপালের একটা শিরা দপ্ দপ্ করিতেছিল—ইঞ্চিখানেক ভিতরে, মগজ ঘেঁষিয়া। বিধবা মেয়ের মত আলোচালের ভাতের সঙ্গে জীবনের সমস্ত রঙ্ সে পেটের মধ্যে চালান করিয়া দিয়াছে, চোখে তাই সব যেন কেমন ঝাপসা ঠেকিতেছে।

একটা অবিশ্বাস্য সন্দেহজনক সঙ্কোচের সঙ্গে হেরম্ব ঘরে গিয়া আনন্দের কাছে বসিল। লণ্ঠনের লালাভ আলোয় আনন্দকে দেখা তাহার সহিল না। আলোটা সে কমাইয়া দিল।

আনন্দ বলিল, 'আচ্ছা, মা বাপ কখনো ছেলেমেয়ে ফেলে পালায় ?'

'পালায় না বলেই এতদিন জানা ছিল।'

'আমার ছেলেমেয়ের মধ্যে গণ্য করা যায় না। আমি কি করে জন্মালাম জানতে বড় ইচ্ছা করে।'

হেরম্ব সভয়ে চুপ করিয়া রহিল। আনন্দের ইঙ্গিতটাই এমন Vulgar যে তাহার গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল।

'আমি নিজে যেমন খাপছাড়া আমার মা বাপও তেমনি। আমি যে সত্যি সত্যি কি, মানুষের মধ্যে আমার স্থান যে কোথায় ভেবে ভেবে, এইখানে'—আনন্দ নিজের বুক দেখাইয়া দিল, একদিন হেরম্বের গায়ে যে বুকের চাপ পড়িয়াছিল!—'এইখানে মাঝে মাঝে এমন যন্ত্রণা হয় কি বলব। মনে হয় কে যেন ফুটবলের মত আমায় পাম্প করছে।'

'মানুষের মধ্যে তোমার স্থান যদি নাই থাকে আনন্দ, সেজন্য কখনো তুমি ব্যথা পেও না। আমি মানুষ, আমার বুকে তোমার স্থান অক্ষয় হয়ে রইল।'

আনন্দ চুপ করিয়া রহিল।

হেরম্ব ব্যগ্রভাবে বলিল, 'আমার সান্ত্বনায় তোমার কি একবিন্দু শান্তিও লাভ হল না আনন্দ?'

'শান্তি কাকে বলে আমি জানি না।'

'আমিও জানি না। তবু মোটামুটি যে অর্থে কথাটা ব্যবহার করি তাও কি বোঝ না আনন্দ?'

'বুঝি, শান্তি মানে স্ফূর্তির মত কিছু একটা হবে। না?'

হেরম্ব মাথা নাড়িল, বলিল, 'না। কিন্তু শান্তি চুলোয় যাক। আমাকে দিয়ে তোমার জীবনের ক্ষতি পূরণ হতে পারে না? আমায় নিয়ে বুকের যন্ত্রণাটা ভুলে থাকতে পার না আনন্দ?'

'কি করে ভুলব? যন্ত্রণা যে আপনি হয়।'

হেরম্ব ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিল।

'আজও কি তোমার তেমনি যন্ত্রণা হচ্ছে?'

'কি জানি।'

'বুঝতে পারছ না?'

'না।'

'কি করলে তোমার আজ স্ফূর্তি হবে আনন্দ?'

'তা তো জানি না।'

'একটু কারণ খাবে?'

'দিন না?'

গুঁড়ে করিয়া অল্প একটু কারণ দিতেই সে এক নিশ্বাসে গিলিয়া ফেলিল।

'আরো দিন্।'

'আরও ?'

আরও খানিকটা কড়া মদ খাইয়া আনন্দ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

তারপর মাতালের মত হঠাৎ—

'আপনি খেলেন না ?'

'আমার আজ দরকার নেই।'

'দরকার নেই কেন ? আপনার আজ কি হয়েছে ?'

'আমার ? আমার কথা আর বলো কেন ?'

আনন্দ দুচোখ বড় বড় করিয়া বলিল, 'আমাকে নিয়ে আজ রাত্রে আপনি কি যেন করবেন। কি করবেন বলুন না ?'

হেরম্ব সাগ্রহে বলিল, আমার কাছে একা থাকতে তোমার ভয় করছে নাকি আনন্দ ?'

'না'

'একটুও না ?'

'না। কি করে ভয় করবে ? ভয় কাকে বলে আমি তা জানিই না।'

তা বটে। আনন্দের ভয়ও নাই, ভালবাসাও নাই। জীবনে হারাইবার মত কি তাহার আছে ? ওর ওই সুন্দর শরীর ঠাণ্ডা, মৃত মাংস দিয়া তৈরী। জন্মের পূর্ব্বেই ওর প্রত্যেকটি তন্তু মাটির অধিকারে। শ্বাস টানিয়া হেরম্ব আবার ঝিমাইয়া পড়িল। প্রেম বিষ নয়, মৃত্যু। মাতাজী জন্মের মত ইহাকে তাহার হাতে সঁপিয়া দিয়া গিয়াছেন, সৌভাগ্য সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার ভার বহিয়া ও ইহাকে সহিয়া কতদিন বাঁচা যাইবে তাহাই ভাবনা।

'আনন্দ, আজ নাচবে ?'

'নাচব ?—হ্যাঁ, নাচব।'

'বোসো তবে, আলোর ব্যবস্থা করি।'

কোথায় আলো ? তিনটা লণ্ঠন, একটা টেবল ল্যাম্প, পাঁচটি মোমবাতি, দুটি ডিবরি, ও একটি মাটির প্রদীপ। সমস্ত বাড়ী খুঁজিয়া এতগুলি আলো আনিয়া ঘরের চারিদিকে জ্বালাইয়া দিয়া হেরম্ব চোখ মিট মিট করিয়া বলিল, 'ভালো আলো হল না।'

'বেশ হয়েছে। আর কত আলো চাই ?'

না,

'দাঁড়াও, ধুনি জ্বালব।'

'ধুনি ? এই ঘরের মধ্যে ?'

'দোষ কি ?'

রান্নাঘরের রোয়াকে কাঠ জমা করা ছিল, একবোঝা বহিয়া আনিয়া হেরম্ব

বলিল, 'চারিদিকে আলো জলছে, মাঝখানে ধুনি জ্বাললেই ভাল দেখাত। কিন্তু তাতে নাচের জায়গা থাকবে না।'

'খুব জায়গা থাকবে। কত জায়গা চাই ?'

নাচ আরম্ভ করার জন্ত আনন্দ অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। নাচ পাইয়াছে, নাচিতে আরম্ভ করিয়া দিলেই হয়, এত তার আয়োজন কিসের ? সর্ব্বাঙ্গ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, হাত পা অকারণেই কাঁপে।

মেঝের মাঝখানে চিতার মত [করিয়া ?] কাঠগুলি হেরম্ব সাজাইয়া দিল। কিন্তু শুধু কাঠ কতক্ষণে ধরিবে ? ধুনিতে [?] তেল ঢালা নিষেধ, ঢালিলে ধুনি আর ধুনি থাকিবে না, চুল্লি হইয়া যাইবে।

আনন্দ এদিকে তাড়া দিতেছে, 'চটপট ধুনি [জ্বালান] না ? কতক্ষণ লাগাবেন ? কখন নাচব ?'

'এই হল।'

আধটিন ঘি আনিয়া হেরম্ব কাঠের [উপর] ঢালিয়া দিল।

'বাবা, অত ঘি ঢাললেন ? ভয়ানক আগুন হবে যে ?'

'হোক না !'

আগুন ধরাইয়া দিতে ঘিয়ে ভেজা কাঠগুলি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। এতক্ষণে হেরম্বের তৃপ্তি হইয়াছে। এমন না হইলে আগুন ! এমন না হইলে আলো ! ঘরের দেয়ালগুলি পর্য্যন্ত জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

'নাচো, আনন্দ।'

'নাচি।'

এত আগুন, এত উত্তাপ, এমন সমারোহ ! আনন্দ আজ তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাচ নাচিবে। যে নাচ কারো সামনে নাচিতে বারণ, যে সর্ব্বনাশা নাচের পর সে আধমরা হইয়া যায়, সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করে আর ঘুম পায়।

হেরম্বকে ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া আনন্দ তার আলখাল্লা মেরজাই জাঙ্গিয়া সব খুলিয়া ঘরের কোণে ছুড়িয়া ফেলিল। একটা ডিবরি কাত হইয়া তাহাতে আগুন ধরিয়া গেল কিন্তু সে তাকাইয়াও দেখিল না। কি নাচ সে নাচিবে সেই জানে, নগ্নতার সম্পূর্ণতার জন্ত দক্ষিণ বাহুর রুদ্রাক্ষের অনন্তটি পর্য্যন্ত সে গায়ে রাখিল না।

হেরম্ব তাত্ত্বিক করিয়া বলিল, 'তুমি যে এত সুন্দর, তোমায় ভালবেসেও এতদিন আমি তা ধারণা করতে পারি নি আনন্দ। আমি ভেবেছিলাম আমার অনুভূতির সীমা তুমি ছাড়িয়ে যাও নি, এখন দেখছি তোমার রূপ আমাকে যতখানি উন্মত্ততা দিতে পারে, [আমি] তার সিকিও নিতে পারি নি। এইখানে এই মুহূর্ত্তে আমি যদি মরে যেতাম [শুধু] তাতে প্রমাণ হত তোমার রূপের কাছে আমার হৃদয় ছোট হয়ে যায় নি। আমি কিন্তু নালিশ করি না।

আমার হৃদয় তৈরী করেছি আমি নিজে, তোমার রূপ দিয়েছেন কে ? ভগবান ! তোমায় দেখে আজ আমার ভগবানকে দেখার কাজ হয়ে যেত, যদি না—যদি না—'

'আঃ, চুপ করুন।'

আনন্দ নাচ আরম্ভ করিল। এমন অদ্ভুত আরম্ভ হেরম্ব কখনো স্বাধে নাই। সেই নির্জ্জন নিঃশব্দ প্রান্তরে ধূনির স্তিমিত আলোয় ইহাকে একবার সে নাচ আরম্ভ করিতে দেখিয়াছিল, স্তব্ধ নিষ্কম্প হইয়া দাঁড়ানোর পর কখন কোথা হইতে অতি ধীরে আনন্দের নাচ আরম্ভ হইয়াছিল বুঝিতেই পারা যায় নাই, এবার সে যেন আরম্ভ করিল নৃত্যের ক্লাইম্যাক্স হইতে, চিত্তের উদ্দাম অশান্ত প্রকাশ যেখানে নিষ্ঠুর, অনাচারী, অসংযত। নিজেকে কেন্দ্র করিয়া পাক খাইতে খাইতে সে দ্রুতবেগে আগুনের চারিদিকে ঘুরিতেছে,—পৃথিবী যেভাবে সূর্য্যের চারিদিকে ঘোরে।

তারপর হেরম্বের মনে হইল আনন্দ যেন একটি বিচ্ছিন্ন অগ্নিশিখা,—সদ্য সদ্য জন্ম লাভ করিয়া জননীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। দুই বাহু বক্ষে ন্যস্ত, সর্ব্বাঙ্গে গতির স্বচ্ছ আবরণ, আগুনে মিশিয়া যাইবে বলিয়া আগুনের দিকেই সে হেলিয়া রহিয়াছে। হেরম্বের চোখে ধাঁধা লাগিয়া গেল, তার মস্তিষ্ক অসাড় হইয়া আসিতেছে।

নাচ থামিল হঠাৎ। আনন্দের আহ্নিক ও বৃত্তিক গতি উভয়ই দ্রুত মন্দীভূত হইয়া আসিল। শেষে গতি আছে কি না বোঝা গেল না। হাঁটু পাতিয়া বসিয়া আনন্দ দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফেলিল। আগুনের খুব কাছেই। বাতাসে অগ্নিশিখা এদিকে হেলিতেই তাহার রুক্ষ বাবরি চুল ঝলসাইয়া গেল। কিন্তু সে তাহা অনুভব করিতে পারিল কি না বোঝা গেল না।

তাহাকে বুকে তুলিয়া নিয়া হেরম্ব উঠানে খোলা আকাশের নীচে গিয়া দাঁড়াইল। আনন্দ কি হাল্কা ! ফুলের মত কি আশ্চর্য্য কোমল তার স্পর্শ। আহা, বেচারা নিশ্বাসের জন্য হাঁপাইতেছে।

'এমন হল কেন আনন্দ ?'

'কি জানি, আমি নাচতে ভুলে গেছি। কিছুতেই অনুদ্যমে নামতে পারলাম না। উঃ, উঃ, মাগো।'

'খুব কষ্ট হচ্ছে ?'

'হুঁ। সমস্ত শরীর আগুনের মত জ্বালা করছে।'

'আগুনের তাতে এরকম হয়েছে।'

'তা কেন হবে ? ভেতর থেকে জ্বলছে যে—হাড়ের মধ্যে।'

'হাড়ের মধ্যে জ্বলছে ?'

'হুঁ, সইতে পারছি না। বাবা বলতেন আমার হাড়ের মধ্যে মজ্জা নেই,

বিষ আছে। নাচলেই সে বিষের ক্রিয়া আরম্ভ হয়। কি করব, কিসে কমবে ?'

তাহাকে বুকে নিয়া উঠানের ধূলার উপরে হেরম্ব বসিয়া রহিল। আনন্দ কিছুই বোঝে না। এ বিষ নয়, নাচিতে না পারার আপশোষ, আনন্দের পক্ষে যাহা মরণাধিক যন্ত্রণা। আর একবার নাচিতে পারিলেই তার সব আলা কমিয়া যাইবে।

'আর একবার চেষ্টা করে দেখবে আনন্দ ?'

'আর পারব না।'

হেরম্ব নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'তবে ধুনি নিভিয়ে দিই ?'

'দিন্।'

'অতগুলি আলো রেখেই বা কি হবে ?'

'সব নিভিয়ে দিন।'

আনন্দ নিজেই ধূলায় নামিয়া গেল। তার ঘামে হেরম্বের বুক ভিজিয়া উঠিয়াছে।

বালতি বালতি জল নিয়া হেরম্ব দূর হইতে আগুনের মধ্যে ঢালিয়া দিতে লাগিল। আগুন কি সহজে নিভিতে চায়! আগুন গর্জ্জন করে, জল বাষ্পে পরিণত হয়, ছাই ওড়ে আর উৎকট দুর্গন্ধে ঘর ভরিয়া যায়। শেষ শিখাটি যখন পরাজয় মানিল, ঘর শ্মশানের মত কদর্য্য হইয়া উঠিয়াছে।

ছাই করলা আর পোড়াকাঠ। পোড়াকাঠ করলা আর ছাই।

বাহিরে আসিয়া হেরম্ব আনন্দকে দেখিতে পাইল না।

সে সভয়ে হাঁকিল, 'আনন্দ !'

আনন্দ সাড়া দিতে সে ছুটিয়া বাড়ীর বাহিরে গেল।

'কোথায় যাচ্ছ আনন্দ ?'

'সমুদ্রে যাচ্ছি,—স্নান করব।'

'এত রাত্রে সমুদ্রস্নান চলে না আনন্দ। ফিরে এসো। বাড়ীতে ঠাণ্ডা মিষ্টি জল আছে তাতে স্নান করলে তৃপ্তি হবে। এসো, মানিক আমার, কথা শোনো।

'ওইটুকু জলে আমার স্নান হবে না।'

'তুমি যত জল চাও তুলে দেব। ঘরের নালা বন্ধ করে তোমার জন্য পুকুর তৈরী করে দেব। ফিরে এসো।'

'না। আমি সমুদ্রেই স্নান করব।'

'দাঁড়াও, তোমার আলখাল্লাটা গায়ে দিয়ে যাও।'

'আলখাল্লা দিয়ে কি হবে ? ও গায়ে দিয়ে সাঁতার কাটা যায় না।'

'বেশ, কিছুই না নেও, আমি তোমার সঙ্গে যাব।'

'আসুন।'

সমস্ত আকাশ ইতিমধ্যে মেঘে ঢাকিয়া গিয়াছে। বর্ষাকাল, কদিন যে বৃষ্টি হয় নাই ইহাই আশ্চর্য্য। অন্ধকার বেশ গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে। এই অন্ধকারে তাহারা সমুদ্রে নামিয়া গেল। ব্রেকার পার হইতে হেরম্ব অনেক পিছাইয়া পড়িল। আনন্দের সঙ্গ সে যখন পাইল তীর হইতে তাহারা কতদূর চলিয়া গিয়াছে তাহার ঠিক নাই।

'এবার ফিরি চল, আনন্দ।'

আনন্দ আলগোছে ভাসিতেছিল, বলিল, 'আমার বড় ঘুম পাচ্ছে।'

'বাড়ী গিয়ে ঘুমোবে। চলো ফিরে যাই। আমায় ধরো।'

আনন্দ কোন জবাব দিল না। হেরম্ব বড় বিরক্ত [বোধ] করে। তাহার এমন ঘুম পাইয়াছে!

নিঃশব্দে ডুব সাঁতার দিয়া সে দূরে সরিয়া গেল।

পরিশিষ্ট

পরদিন বিকালে সমুদ্রতীরে দাঁড়াইয়া হেরম্ব সমুদ্রের দিকে চাহিয়া ছিল, এমন সময় বিধবার বেশে সরসী তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

'কাল উনি মারা গেছেন। রাত্রে লোক পাঠিয়েছিলাম, আপনাকে বাড়ীতে পায় নি। কোথায় গিয়েছিলেন কাল?'

'কাল সমস্ত রাত সমুদ্রস্নান করেছি।'

'মাগো, বলেন কি! সমস্ত রাত?'

'প্রায় সমস্ত রাত। শেষরাত্রে ঘণ্টা দুই এখানে ঘুমিয়েছিলাম।'

'জলের ধারে এই বালিতে?'

'হাঁ।'

'কেন হেরম্ববাবু, কাল আপনার কি হয়েছিল?'

[এর পর পাণ্ডুলিপির শেষ পাতা, মাথার দিকটা কিছুটা ছেঁড়া—একটি লাইন, হেরম্বের উত্তর, বাদ গিয়েছে মনে হয়, যদিও বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না।]

সরসী হেরম্বের একখানা হাত আয়ত্ত করিল।

কাঁদিয়া বলিল, 'কাল সত্যি একটা ভয়ঙ্কর রাত্রি গিয়েছে,—আমার সর্ব্বনাশ হয়ে গেল। ও হেরম্ববাবু, কেন আমি ময়তে পুরী এসেছিলাম?'

সরসী ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। অসহ্য শোকে তাহার ভিতরটা পুড়িয়া যাইতেছিল, সে গৃহস্থ মেয়ে, সে সংসারী মেয়ে। তাহার অশ্রুর ছোঁয়াচ লাগিয়া হেরম্বের চোখ দিয়াও টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। আনন্দকে না দেখিয়া সে বাঁচিবে কেমন করিয়া?

অতঃপর এই দু'জন বিরহী ও বিরহিণী সমুদ্রের ধারে ধারে বহুদূর হাঁটিয়া গিয়া একান্ত নির্জ্জন ও অপেক্ষাকৃত গোপন একটি স্থান বাছিয়া নিয়া বসিল,—সরসীর আত্মীয়েরা খুঁজিতে আসিলে মুস্কিল হইবে। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাহারা সেখানে রহিল। সরসী অবশ্য তাহার গহনা ও অন্যান্য দু'একটি দামী জিনিষ আনিতে একবার বাড়ী যাইবে, বাকী জীবনটা তাহারা অবশ্য স্বামীস্ত্রীর মতই বাস করিবে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে তাহাদের যে শুধু কান্না পাইবে তাহা নয়, একের অগোচরে অপরজন ছটফট করিয়া কাঁদিবেও।

যদি তাহারা বাঁচিয়া থাকে।

কিন্তু মরিয়া আর কি সুখ রহিল যে তাহারা বাঁচিয়া থাকিবে না? দুঃখে মানুষের পরমায়ু বাড়ে। দুঃখী মানুষ সংসার না চাক, স্ত্রী ও সন্তান চায়। পৃথিবীর কোথাও ইহার অন্যথা নাই।

আনন্দ বাঁচিয়া থাকিলে হেরম্ব বাঁচিত না। আনন্দের মৃত্যুতে তার মরণের নেশা টুটিয়া গিয়াছে। কাল যে সে আনন্দের সঙ্গে ডুবিয়া মরে নাই তাহার কারণও তাই। আনন্দ ও ভাবে মরিবে জানিলে সে আগেই আত্মহত্যা করিত। কিন্তু আনন্দকে ডাকিয়া সাড়া না পাইয়া সে যে অকথ্য যন্ত্রণা পাইয়াছিল তারপর তার নিজে নিজে মরা চলে না।

সরসীর কথা আলাদা। সে নারী মাত্র।

—

আদি পাণ্ডুলিপি সমাপ্ত

সন্তোষকুমার বসু

ত্রৈলোক্যনাথ : একটি অবহেলিত অধ্যায়

সাধারণভাবে সাহিত্যকর্মের জন্যই ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়কে স্মরণ করা হয়। কিন্তু তাঁর কর্মজীবনের জন্য যে অপেক্ষাকৃত অবহেলিত দিক রয়েছে সে সম্পর্কে আমরা আজ অনেকেই সচেতন নই। উনিশ শতকের শেষার্ধে সমগ্র ভারতের প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট সম্পদের বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও সমীক্ষণের প্রয়াসে তাঁর নিষ্ঠা ও দান কোনোক্রমেই বিস্মৃত হবার নয়। এই দিক থেকে ত্রৈলোক্যনাথের পরিচয় গ্রহণ ও মূল্যায়নের বিশেষ সার্থকতা আছে।

একথা অবশ্য ঠিক যে ইংরেজ শাসকদের এদেশে শাসন ও শোষণের সুবিধার জন্যই সেযুগে এই পর্যবেক্ষণ ও সমীক্ষণের প্রয়োজন ছিল। আর তখনকার রীতি অনুসারে ত্রৈলোক্যনাথের কৃতিত্ব অনেকটাই চাপা পড়ে গিয়েছে ইংরেজ শাসকদের নামের আড়ালে। আবার ঔপনিবেশিক শিক্ষাধারায় পুষ্ট, তেজী ইংরেজিয়ানায় অভ্যস্ত তথাকথিত শিক্ষিত সমাজে সমীক্ষক-গবেষক ত্রৈলোক্যনাথের বাংলা ও ইংরেজিতে লিখিত নিবন্ধগুলি অনেককালই বিস্মৃত ও অবহেলিত। সম্প্রতি বাংলায় লেখা তাঁর রচনাবলি পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু তাঁর ইংরেজি রচনাবলি আজও আমাদের নজর এড়িয়ে রয়েছে। এইসব ইংরেজি রচনার মধ্যে অত্যন্ত মূল্যবান তথ্যাদি রয়ে গেছে, যা আজ পুনঃপ্রকাশের যোগ্য। ত্রৈলোক্যনাথের কর্মজীবনের এই অবহেলিত অধ্যায়টির কিছুটা পরিচয় নেবার প্রয়াসেই বর্তমানে আলোচনার অবতারণা।

এই প্রসঙ্গে ত্রৈলোক্যনাথের কর্মকালকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম, ১৮৬৬ থেকে ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। এই সময়ে তাঁকে গ্রাম্য বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও উড়িষ্যার কটক জিলায় পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর রূপে দেখা যায়। কটক কাছারির সামনে সুবিখ্যাত উইলিয়ম হাণ্টারের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় হয় এই সময়। দ্বিতীয়, ১৮৭০ থেকে ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। এই বিস্তৃত সময়কালের প্রথম পাঁচ বছর বেঙ্গল গেজেটিয়ার সংকলনের দপ্তরে তাঁর কর্মদক্ষতার কিছু পরিচয় হাণ্টারের নামাঙ্কিত 'স্ট্যাটিসটিকাল অ্যাকাউন্টস অব বেঙ্গল' ও 'বেঙ্গল রেকর্ডস' গ্রন্থদ্বয়ে আংশিকভাবে স্বীকৃত হয়েছিল। এর মধ্যেই ১৮৭৫ থেকে ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সময় ত্রৈলোক্যনাথ তদানীন্তন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যা, অর্থাৎ মূলত বর্তমান উত্তরপ্রদেশের কৃষি ও বাণিজ্য বিভাগে কাজ করেন। 'উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ গেজেটিয়ারে'ও তাঁর কর্মকুশলতার পরিচয় পাওয়া

যায়। ১৮৮১ থেকে ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ত্রৈলোক্যনাথ তদানীন্তন ভারত সরকারের রাজস্ব ও কৃষি দপ্তরে কাজ করেছিলেন। এই দপ্তরে 'প্রদর্শনী বিভাগটি'র তিনি ছিলেন মুখ্য-পরিচালক। এই সময়ে তিনি স্বদেশে ও ইয়োরোপে একাধিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী সংগঠন করেন ও ঐ সব প্রদর্শনীর জন্য উপযুক্ত নিদর্শন সংগ্রহে বিশেষ সাফল্য অর্জন করেন। এই সূত্রে তাঁর ভারতের বহু জায়গায় সরেজমিনে অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ হয়। ১৮৮১-৮২তে ভারতীয় কারুশিল্পের এক তালিকা তিনি প্রণয়ন করেছিলেন। ১৮৮৩-৮৪তে অনুষ্ঠিত 'ক্যালকাটা ইন্টারন্যাশনাল একজিবিশন'-এর জন্য কারুশিল্প-নিদর্শন সংগ্রহের কাজটিও তাঁর দ্বারাই সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়। একাধিক বস্ত্র বয়নোপযোগী আঁশ বার করার যন্ত্রের পরীক্ষা তাঁর পরিচালনাতেই সম্ভব হয়। বয়নের উপযোগী সুতো-কলের ও অন্যান্য শিল্পদ্রব্যের মান নির্ণয়ের দায়িত্ব এই সময়ে তিনি দক্ষতার সঙ্গে পালন করেন। কলকাতা তথা বাংলার কারুশিল্পের তালিকা ও উৎপন্ন দ্রব্যাদির বিবরণ রচনার কাজও এই সময়েরই।

১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে ত্রৈলোক্যনাথ কলকাতার অন্যতম প্রাচীন সংগ্রহশালা 'বেঙ্গল ইকনমিক মিউজিয়মে'র সহকারী অধ্যক্ষের কাজ করেন। ভারত সরকারের নির্দেশে তাঁকে ইটালি, ফ্রান্স, বেলজিয়ম, জার্মানি, অস্ট্রিয়া, রাশিয়া এবং অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন সংগ্রহশালা ও সরকারী দপ্তরে ভারতীয় উৎপন্ন দ্রব্য ও কারুশিল্পের সংগ্রাহকরূপে কাজ করতে হয়েছিল। তিনি ভারতের উৎপাদনের একটা সামগ্রিক 'নাম-তালিকা'ও তখন প্রণয়ন করেন। ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি লণ্ডনে অনুষ্ঠিতব্য 'কোলোনিয়াল অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়ান একজিবিশনে'র জন্য অর্থকরী দ্রব্যাদির সংগ্রহ গড়ে তোলেন এবং বিলেতে ঐ প্রদর্শনীর 'রেফারেন্স অফিসার' হিসেবে কাজ করেন। বিলেতে যাবার সময়ে ত্রৈলোক্যনাথ অধ্যাপক মোনিয়ার উইলিয়ম্স-এর বিশেষ অনুরোধে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ইণ্ডিয়ান ইন্সটিট্যুট মিউজিয়মে'র নিদর্শন-সম্ভারকে সুবিন্যস্ত বর্গে ভাগ ক'রে উপযুক্ত প্রদর্শনীর উপযোগী নিদর্শন-তালিকা প্রণয়ন ক'রে দিয়েছিলেন।

তৃতীয়, অর্থাৎ ত্রৈলোক্যনাথের কর্মজীবনের শেষ অধ্যায় ১৮৮৭ থেকে ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত। বর্তমানের 'ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে'র সঙ্গে যুক্ত 'বেঙ্গল ইকনমিক অ্যাণ্ড আর্ট মিউজিয়মের' সহ-আগারিক রূপে এবার তাঁকে দেখা যায়। দ্বিতীয় দফায় ত্রৈলোক্যনাথকে বিলেত যেতেও হয়েছিল। ইয়োরোপ থেকে ফিরে তিনি 'গ্লাসগো ইণ্টারন্যাশনাল একজিবিশনে'র নিদর্শন সংগ্রহ করতে থাকেন এবং তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'আর্ট ম্যানুফাকচার্স অব ইণ্ডিয়া' গ্লাসগো আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর সুবৃহৎ তালিকারূপে কলকাতা থেকে ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে মুদ্রিত হয়। এই বর্ণনামূলক তালিকা কারুকলা ও সংগ্রহশালার ক্ষেত্রে এক

উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ত্রৈলোক্যনাথ ফরাসী বিপ্লবের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিখ্যাত নৃ-বিজ্ঞানী রিজ্‌লে-র অনুরোধে প্যারিস শহরের জন্য নৃতত্ত্বের এক ব্যাপক সংগ্রহ গড়ে তোলেন, কিন্তু সরকারী অনুমোদন লাভ না করায় তা ভারতের বাইরে পাঠানো যায় নি। কিন্তু কোথায় গেল এই সুবিশাল সংগ্রহ? এটি পরবর্তী কালে 'ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে'র নৃতত্ত্ব বিভাগে যুক্ত হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে অনুসন্ধান প্রয়োজন। ত্রৈলোক্যনাথ বিলেতের ইম্পিরিয়াল ইন্সটিট্যুটে'র সংগ্রহও গড়ে দেন। কলকাতার 'ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে'র কাগজপত্র ও সমসাময়িককালের বাৎসরিক প্রতিবেদন অনুসন্ধান করলে ভারতীয় সংগ্রহ-শালার ক্ষেত্রে অর্থাৎ মিউজিয়মের প্রদর্শন-পদ্ধতি, তালিকা প্রণয়ন প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর দান সম্পর্কে একাধিক অবহেলিত কিন্তু অমূল্য উপাদান লাভ করা যাবে বলে আশা করা যেতে পারে। তবে এটুকু নিশ্চিতভাবে অনুমান করা যায় যে ভারতীয় সংগ্রহশালা বা 'ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে'র 'ইকনমিক অ্যাণ্ড আর্ট সেকসন'টির প্রথমদিকের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ত্রৈলোক্যনাথের দ্বারাই সুসম্পন্ন হয়েছিল। ভারতীয় সংগ্রহশালা বা 'ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে'র বিভিন্ন বাৎসরিক কার্যবিবরণীতে এর খানিকটা পরিচয় পাওয়া যায়।

ত্রৈলোক্যনাথের ইংরেজিভাষায় লিখিত গ্রন্থ, প্রবন্ধ, প্রতিবেদন, বর্ণনামূলক তালিকা ইত্যাদি আমাদের স্তম্ভিত ক'রে দিতে পারে। বাংলার কাঁসা ও তামার কাজ, মৃৎপাত্র এবং কাচের কাজ সম্পর্কে তিনি একাধিক বিবরণ তৈরি করেছিলেন। শিল্প-সমীক্ষার প্রয়োজনে রচিত তাঁর প্রবন্ধাবলি ইংলণ্ড থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত 'জর্নাল অব ইণ্ডিয়ান আর্ট' নামক সুপরিচিত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ত্রৈলোক্যনাথ-প্রবর্তিত ভারতীয় কারুশিল্পের বর্গীকরণ ও ব্যাখ্যানমূলক শ্রেণী-বিভাজন পদ্ধতি যুগপৎ সরকারী প্রশাসক এবং ভারতচর্চার ছাত্র-গবেষকের কাছে স্বীকৃতিলাভ করেছিল। তাঁর বহু প্রবন্ধ ও সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'আর্ট ম্যানুফ্যাকচার্স অব ইণ্ডিয়া'র বিভিন্ন অংশ হিন্দি-সমেত নানা ভারতীয় ভাষায় অনুবাদের মধ্যে দিয়ে প্রচারিত হয়। 'এড়ি' বা 'এণ্ডি'র গুটি-পোকার চাষ নিয়ে তাঁর রচনা হিন্দিতে প্রকাশিত হওয়ার কথা জানা যায়।

'আর্ট ম্যানুফ্যাকচার্স অব ইণ্ডিয়া' ত্রৈলোক্যনাথের একটি মহামূল্যবান গ্রন্থ। এতে টি. এন. মুখার্জীকে (ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়কে) কলিকাতার 'ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে'র কর্মচারী এবং গ্লাসগো আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর ভারতস্থিত কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এর সূচিপত্র থেকে জানতে পারা যায় যে চোদ্দটি অধ্যায় নিয়ে এই গ্রন্থে বিভিন্ন কারুশিল্পের আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমে আছে চিত্রাঙ্কন, রেখাঙ্কন, ভিত্তিচিত্র, তৈলচিত্র প্রভৃতির রীতি-প্রকৃতি, কাগজ, কাচ, চামড়া, হস্তীদন্ত, 'ট্যাল্‌ক' পাথর ইত্যাদিতে উৎকীর্ণ চিত্র

পুঁথি-চিত্রণ, সূক্ষ্ম খোদাই, পাথরের থেকে মুদ্রিত ছবি, আলোকচিত্র, ভাস্কর্য এবং মুখোশ প্রভৃতির কথা। সুকুমার কলা বা 'ফাইন আর্টস' এই অধ্যায়ের নাম। দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'ডেকোরেটিভ আর্ট' অর্থাৎ কাঠ ও পাথরের স্থাপত্য-মূলক নক্সা, পলেস্তারার কাজ, কুটির নির্মাণ পদ্ধতি, জমাট চুনের কাজ, গৃহকর্মে ব্যবহৃত তৈজসাদির নক্সা ও কর্দম-নির্মিত প্রতিরূপ প্রভৃতি স্থান পেয়েছে। তৃতীয় অধ্যায় বা বিভাগটিতে আছে বাস্তুসজ্জাদির বিবরণ। অলংকরণ শিল্প সম্পর্কীয় বিবরণ আছে চতুর্থ অধ্যায়ে। ধাতু থেকে নির্মিত সকল প্রকার কারু-কর্মের কথা আছে পঞ্চম অধ্যায়ে। ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায় কাঠ ও পাথরের কারু-কার্যের আলোচনায় নিয়োজিত। মণিমুক্তা বসানোর কারিগরী এবং হস্তীদন্ত, শৃঙ্গ ও শঙ্খ-ঝিনুকাদির কারুকর্ম যথাক্রমে অষ্টম ও নবম অধ্যায়ের অন্তর্গত। মৃৎপাত্রাদির নির্মাণের কথা, কাচশিল্প, চর্মশিল্প, বুননের (ঝুড়ি বুনবার মতো) কাজ, বস্ত্রশিল্প প্রভৃতির বর্ণনা পর-পর বইটির পাঁচটি অন্তিম অধ্যায়ে দেওয়া আছে। সুতরাং এই বিষয়ে গ্রন্থটিকে পথিকৃতের মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে।

'আর্ট ম্যানুফ্যাকচার্স অব ইণ্ডিয়ার' সামগ্রিক ও পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দিতে একটা বহুবিস্তৃত আলোচনার সম্ভাবনা দেখা দেয়। তবে এখানে তেমন প্রয়াসের বদলে ত্রৈলোক্যনাথের কর্মপদ্ধতি ও গভীর বিশ্লেষণী মনোভাবের পরিচয় কয়েকটি বিশেষ দিককে তুলে ধরে দেখিয়ে দেবার চেষ্টা আপাতত যুক্তিযুক্ত। বইটি আড়াগোড়া খুঁটিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে গ্রন্থকার ভারতীয় কারুশিল্পের সুপ্রাচীন ও অপেক্ষাকৃত নবীন—এই উভয় দিককেই সমান যত্নের সঙ্গে উপস্থিত করেছেন। প্রথমেই আমরা দেখছি লেখক এই বইটিতে ভারতীয় কারিগরীতে ব্যবহৃত অকৃত্রিম পারিভাষিক শব্দ যথাযথভাবে গ্রন্থের মধ্যে যুক্ত ক'রে দিয়েছেন। এই পদ্ধতিতে আমরা দেশীয় কারিগরদের কাজ করার পদ্ধতি ও কলাকৌশলকে সঠিকভাবে অনুসরণ করতে সমর্থ হই। 'আর্ট ম্যানুফ্যাকচার্স'-এর ৩৯৯ থেকে ৪৭১ পৃষ্ঠাব্যাপী সুবৃহৎ নির্ঘণ্ট অনুধাবন করলে ত্রৈলোক্য-নাথের সমীক্ষাটির দেশজ ব্যাপকতা এবং এদেশীয় কারিগরী বৈচিত্র্যের প্রকৃতি বোঝা যাবে।

ভারতে সুপ্রচলিত বহু কারুপদ্ধতি আজ চিরতরে বিনষ্ট হয়েছে। এই সমস্ত কাজের কিছু-কিছু নিদর্শন ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের মিউজিয়মে রক্ষিত। কিন্তু এই সম্পদকে যথাযথভাবে চিনে নেবার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে ত্রৈলোক্যনাথের এই অমূল্য পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করা ছাড়া মিউজিয়ম-কর্মী ও কারুশিল্প-সমীক্ষকদের কাছে অন্য কোনো পথ খোলা নেই। একেবারে আধুনিক কালেও ত্রৈলোক্যনাথের এই মহাগ্রন্থকে অতিক্রম ক'রে কোনো কিছু রচনা করা প্রায় অসম্ভব প্রয়াস বলে আমরা ধরে নিতে পারি। ভারতীয় সুকুমার শিল্প ও

কারুকলা সম্পর্কে সমস্ত অধুনাপ্রচলিত প্রামাণ্য বই এই গ্রন্থের অবদানকে স্বীকার ক'রে নিয়েছে।

ত্রৈলোক্যনাথের সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় 'আর্ট ম্যানুফাকচার্স'-এর বিভিন্ন অধ্যায়ে ছড়ান আছে। এখানে তার কয়েকটি বিষয়ের অবতারণা করা গেল। একেবারে সাম্প্রতিক কালে আমরা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত কুটির-প্রাচীরের লোকচিত্রকলার সম্পর্কে সচেতন হয়েছি। কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথ প্রায় নব্বুই বছর আগে আমাদের লাল্‌চে গেরিমাটি দিয়ে আঁকা অত্যাশ্চর্য মানুষ, সশস্ত্র সৈন্য, বাঘ, হাতি ও জ্যামিতিক চিত্রাবলির কথা উল্লেখ করেছেন [পৃ ১৩]। পুরনো কাপড়ে মাটি দিয়ে মাজা জমিতে উড়িষ্যার লোকচিত্রের আলোচনা এবং বাংলার পটুয়াদের সম্পর্কেও উল্লেখ করেছেন ত্রৈলোক্যনাথ। পটুয়াদের সম্পর্কে দেখিয়েছেন কীভাবে 'ক্যালকাটা স্কুল অব আর্ট' পূর্বতন ছাত্রদের করা দেব-দেবীর লিথোগ্রাফে মুদ্রিত ছবি অপেক্ষাকৃত সস্তাদামে বিক্রি করার ফলে পটুয়াদের করা ছবি ধীরে ধীরে বাজার থেকে অপসৃত হয়েছে। আজকের দিনে পট ও পটুয়াদের সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার অন্ত নেই। কিন্তু একটি ক্ষুদ্র চিত্র-তালিকাসহ ত্রৈলোক্যনাথ এঁদের সৃষ্ট পৌরাণিক ও সমসাময়িক ভারতীয় জীবনের সম্পর্কে ব্যাঙ্গাত্মক চিত্রের কথা জানিয়েছেন তখনই [পৃ ২০]। ভারতের চিত্রালোচনার ক্ষেত্রে মুঘল আমলের শেষ পর্যায়ের চিত্রকলা একটি দুরূহ অধ্যায়রূপে বিবেচিত হয়। এই মুঘল ও প্রাদেশিক-মুঘল ঐতিহ্যবাহী চিত্রীরা ইংরেজ আমলের শহরে গঞ্জে জীবিকার সন্ধানে ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। কলকাতা, পাটনা, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, লাহোর প্রভৃতি স্থানের হস্তীদন্ত ফলকের উপর পার্শ্বগত 'এক চশ্‌ম্' ও তিন-চতুর্থাংশ পার্শ্বগত অথবা ঋজ্বগত অথবা সম্মুখদৃষ্ট-সমেত 'দো-চশ্‌ম্' ধারার চিত্রকলার কথা ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থে আছে [পৃ ২৩]। দক্ষিণভারতের কুম্ভাপার বৃত্তাকার চর্ম-চিত্রণ, ত্রিচিনপল্লীর ট্যালক্ পাথরে উৎকীর্ণ চিত্রের কথাও এখানে উল্লিখিত। ভারতের সুবিখ্যাত পুঁথি-চিত্রের কথা, জয়পুরের 'রজ্‌ম্‌নামা', উড়িষ্যার তালপত্রে খোদিত রেখাঙ্কন ও বর্ণানুলেপনের পুঁথি প্রভৃতির প্রতি ত্রৈলোক্যনাথ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কী ক'রে সুতীক্ষ্ণ লৌহ-শলাকার সাহায্যে খোদিত রেখাপাতের উপর অতিমসৃণ কাঠকয়লার গুঁড়ো ঘষে রেখাপাতের খোদিত নিম্নাংশকে ভরাট ক'রে 'গীতগোবিন্দ' (চতুর্দশ শতক) পুঁথির চিত্র সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল তার বিবরণ এখানে আছে [পৃ ২৮]।

গোপালচন্দ্র কর্মকার-কৃত সুন্দর তেঁতুলকাঠ ও অন্যান্য কাঠের ছাপার 'ব্লক' তৈরির কথা বলতে গিয়ে ত্রৈলোক্যনাথ পঞ্জিকার ও গ্রাম্য বিদ্যালয়ের পুস্তক চিত্রণের কথা জানিয়েছেন। তাঁর বিবরণ থেকেই আমরা জানতে পারছি

যে 'ক্যালকাটা স্কুল অব আর্ট'-এর অনেক ছাত্র এই রকম কাঠ খোদাইকারের জীবিকা গ্রহণ করেছিল। 'লিথোগ্রাফে'র কথায় ত্রৈলোক্যনাথের বই থেকেই আমরা জানতে পারি যে কলকাতার আদিতম 'লিথোগ্রাফ' ছবিতে হাতের সাহায্যে রঙ লাগান হতো। এসব ছবির ইয়োরোপীয় শৈলীর কথাও উল্লেখ করতে তিনি ভোলেন নি [পৃ ২৯-৩০]। বর্ধমান জেলার দাঁইহাটের 'ভাস্কর' এবং গয়া, গোয়ালিয়র, জয়পুর, মান্দাসোর, ধার প্রভৃতির পাথরের খোদাই-কাজের বিবরণও আছে এখানে। বিভিন্নভাবে মহরমের 'তাজিয়া', কাগজ প্রভৃতির ফুল ও কাগজের মণ্ডের জয়পুরী মুখোশ, রঙচড়ান কাপড় ও চামড়ার ঘোড়া ও হাতির কথাও বলা আছে। এটি এমন একটি বিষয় যার সম্পর্কে এখনো যথাযথ আলোচনা হয় নি।

ত্রৈলোক্যনাথ গভীর খেদের সঙ্গে লক্ষ্য করেছিলেন যে ব্রিটিশ আমলের কলকাতা প্রভৃতি শহরে ইয়োরোপীয় ধারায় শিক্ষিত স্থাপত্যনক্সারচনাকারীরা ভারতীয় রীতি সম্পর্কে উদাসীন এবং এর ফলে ভারতের স্থাপত্যনক্সাকারীরাও তাঁদের ক্ষমতা ও ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন নন। মহারাষ্ট্র ও বিশেষ ক'রে দিল্লী রাজপুতানা ও গুজরাটের স্থপতিদের নক্সা ও স্থাপত্যসম্মত রেখাঙ্কন কেবলমাত্র অনেক পরবর্তীকালেই আমরা আলোচনা করছি। ত্রৈলোক্যনাথ এর সূত্রপাত ক'রে গেছেন অনেক পূর্বে [পৃ ৩৪-৩৭]। বাংলার দরদালানের দেওয়াল-চিত্র ও চণ্ডীমণ্ডপের কাদামাটির দেওয়ালের ছবি নিয়ে ত্রৈলোক্যনাথের আলোচনাটি মনে রাখার যোগ্য। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের কাঠের উপর গঁদ ও 'হোয়াইটিং' দিয়ে মলা কাপড়ের বা শন্-জাঁশের জমিতে বিভিন্ন পদ্ধতিতে জলরঙে ছবি আঁকবার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। আলোয়ারের কাচ-বসান দেওয়াল-চিত্র, মহীশূরের জ্যামিতিক নক্সা ইত্যাদির কথা এর পরেই আছে। বাংলার দাশদা, বিহারের গয়া, পশ্চিমভারতের পঞ্জাব, ডেকান, গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন কেন্দ্র ও দক্ষিণভারতের স্থাপত্যমূলক কাঠ-খোদাইয়ের কাজ যুক্ত হয়েছে একই অধ্যায়ে। পাথরের জালিকাটার কাজ ও তার রাজস্থানী কেন্দ্রসমূহ এখানে উল্লিখিত।

ত্রৈলোক্যনাথের বিবরণের দু'টি পৃথক বিভাগ [পৃ ৫৫-৫৬] বাংলার চণ্ডীমণ্ডপের এবং শিল্পমণ্ডিত অলংকারমূলক ইটের কাজ ও জমাট চুনের কাজ সম্পর্কে লিখিত। এর মধ্যে প্রথম বিভাগটিতে অতিসুন্দর বুনটের কুটিরের ছাওয়া অংশে সুনিয়ন্ত্রিত কারুকুশলতায় সৃষ্ট বাঁশের কাজ ও তালকাঠের কড়ির ব্যবহার এবং ভিতরের দিকে নীলকণ্ঠ পাখির পালকের অলংকার-সজ্জার কথা বিবৃত হয়েছে। এখনকার দিনে আমরা পোড়ামাটির ইটের ফলকে ছাঁচ-তোলা এবং হাতে করা নানাধরনের নরনারীর মূর্তি, দৃশ্য ও আলংকারিক রচনাদি নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করি। কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথ দিনাজপুরের কান্তনগরের মন্দিরে

এ ধরনের কাজের নিদর্শন দেখিয়েছেন অনেক আগেই। এছাড়া চন্দননগর অঞ্চলের একটি মন্দির এবং ঢাকার 'স্টুকো' বা জমাট চুনের কাজের সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করেছেন। অনেক সময়ে আমরা অনেক কারিগরী পরিভাষা সম্যক না বুঝেই ব্যবহার ক'রে থাকি। কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থ থেকেই আমরা দেখছি যে প্রত্যেক কারিগরী পরিভাষার একটা সহজসাধ্য প্রচলিত ব্যুৎপত্তিসহ অর্থ আছে। কৃষ্ণনগরের মাটির প্রতিরূপের কথা 'আর্ট ম্যানুফ্যাকচার্স···'-এর ৫৯ থেকে ৬৮ পৃষ্ঠার মধ্যে দেওয়া আছে। কৃষ্ণনগরের কাদামাটির প্রতিরূপের কথায় ত্রৈলোক্যনাথ মূলানুগভাবে ভারতের আদিবাসীদের প্রমাণাকার প্রতিরূপ তৈরির কথা বলেছেন। কৃষ্ণনগরের কুমোরদের কথাও তিনি বলেছেন [৫৯-৬৮ পৃ]। তাঁর লেখা থেকেই আমরা জানতে পারি যে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দের প্রদর্শনীর সময় থেকেই কৃষ্ণনগরের কাজের নিদর্শন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে পাঠানোর প্রথার শুরু হয়েছিল। যদুনাথ পাল ডঃ ওয়াট-এর তত্ত্বাবধানে 'কলকাতা আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী'র জন্য কলকাতার আগত মূল ও জীবন্ত আদিবাসী-আদর্শ থেকেই প্রতিরূপ তৈরি করেন। এধরনের কাজের জন্য যদুনাথের অদ্বিতীয় কর্মপদ্ধতি ত্রৈলোক্যনাথ স্বীকার করেছেন। এখানে আরও সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে যে গ্লাসগো প্রদর্শনীর জন্য খামতি, মিশ্‌মি, গারো, দাফ্‌লা, নাগা, মিকির, কারেন, সাঁওতাল প্রভৃতি আদিবাসীদের সতেরোটি মূর্তি নির্বাচিত হয়েছিল। যাঁরা ভারতের ও ভারতের মাধ্যমে সংগৃহীত নৃতত্ত্ব ও জাতিতত্ত্বের মিউজিয়ম প্রভৃতির গত একশো বছরের ইতিহাস রচনা করতে চান তাঁদের কাছে এই সংবাদ মূল্যবান যে কলকাতার 'ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে' এই ধরনের প্রতিরূপের পূর্ণাঙ্গ সংগ্রহ রক্ষিত হয়েছিল এবং এখান থেকেই এগুলির প্রতিরূপ তৈরি ক'রে নিয়ে লণ্ডনের 'ইম্পিরিয়াল ইন্সটিট্যুট্' ও ইয়োরোপের বিভিন্নদেশের মিউজিয়মে প্রেরিত হয়েছিল। এইখানে প্রতিরূপগুলির মূল্যও উল্লেখ করা আছে [পৃ ৬৭]। কৃষ্ণনগরের শিল্পীদের মধ্যে রাখালদাস পাল ক্ষুদ্রায়িত প্রতিরূপ নির্মাণের দক্ষ কারিগর ছিলেন এবং তাঁর রচিত আসামের চা-বাগানের ক্ষুদ্রাকার দৃশ্য-প্রতিরূপ গ্লাসগোতে পাঠানো হয়। বঙ্কেশ্বর পাল নামে এক শিল্পী বাংলার মাছের নানান প্রতিরূপ নির্মাণে দক্ষতা অর্জন করেন। অন্যদিকে নিবারণ পাল তৈরি করেন ফল, শাকসব্জী ইত্যাদির ক্ষুদ্রায়িত প্রতিরূপ। এইসব প্রতিরূপের মাধ্যমে ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন প্রকারের জীবিকার ত্রৈ-মাত্রিক রূপায়ণ সম্ভব হয়। এর পরে আছে প্রতিরূপ নির্মাণে লক্ষ্ণৌ, পুণা ও অন্যান্য স্থানের কুমোরদের কাজের পরিচয়। হীরা সিং নামে দিল্লীর এক কুমোর পোড়ামাটিতে সাপ ক'রে জোসেফ কেয়ারের সর্প-সম্পর্কিত পুস্তকের চিত্রাবলি অনুসরণে জলরঙ দিয়ে যে সুন্দর প্রতিরূপ করতেন ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে তার সংগ্রহও রাখা হয়েছিল। পরিশেষে ত্রৈলোক্যনাথ দিয়েছিলেন

বর্ধমানের গুস্‌করা ও বীরভূমের ইলামবাজারে যথাক্রমে মাটির পুতুল ও লাক্ষার পুতুল বা প্রতিরূপের বিবরণ।

'আর্ট মানুফ্যাকচার্স···' গ্রন্থের সংগীত-যন্ত্রের অধ্যায়ে ত্রৈলোক্যনাথ অপেক্ষাকৃত উচ্চকোটির মার্গ ও দরবারী সংগীতে ব্যবহৃত সংগীত-যন্ত্রের সঙ্গে আনন্দলহরী, একতারা গোপীযন্ত্র, দোতারা, চিকারা, কামানচি প্রভৃতি লোকসংগীতে ব্যবহৃত যন্ত্রের বিবরণ দিতে কোনোরকম কার্পণ্য করেন নি। তারের যন্ত্রের পর বায়ুচালনা-নির্ভর সংগীত-যন্ত্রের কথায় অনুরূপভাবে বাঁশের বাঁশি, সাপখেলান বাঁশি প্রভৃতির কথা এসে পড়েছে। আঘাত ও সংঘর্ষভিত্তিক বাদ্যযন্ত্রে এসেছে মন্দিরা, খট্টালি, ঝনি, ঢোলক, ঢাক ও ডুগ্‌ডুগির কথা।

অলংকার ও গহনার বর্ণনায় ত্রৈলোক্যনাথের যুক্তিবাদী দক্ষতার সবিশেষ পরিচয় লাভ করা যায়। এর সব থেকে সুন্দর প্রমাণ আছে তাঁর দেওয়া বাংলার গহনার বিবরণটিতে [পৃ ১১০-১১৭]। এখানে মানুষের অলংকারকে মাথার, নাকের, গলার, বাহুর, মণিবন্ধের, কোমরের এবং পায়ের এই সাতটি প্রধান ভাগে বিভক্ত ক'রে দেখান হয়েছে প্রায় কমবেশি আশীটি বঙ্গদেশে ব্যবহৃত গহনার স্থানীয় নাম এবং তার ব্যাখ্যাসহ সংজ্ঞা নির্দেশ ক'রে। যে-কেউ বাংলার কারুকৃতি সম্পর্কে কাজ করতে চান তাঁকে এই অংশটিতে বার বার ফিরে আসতে হবে। অলংকারের বিবর্তিত শ্রেণীবিভাজন পদ্ধতি আমাদের সাগ্রহশালা সমূহেও অনুসৃত হওয়ার যোগ্য। কাঁসা-পিতলের অলংকার নিয়ে আলোচনাটিও মূল্যবান। এই প্রসঙ্গে ত্রৈলোক্যনাথ বলেছেন যে এ ধরনের শ্রেষ্ঠ ও পুরনো অলংকারের অনুসন্ধানের জন্য আমাদের দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে যেতে হবে, কারণ দরিদ্ররাই সহজে নিত্যনতুন রীতির বশীভূত হন না। কটক ও ঢাকার রুপোর তারের কাজ ও তার কর্মকৌশল, উত্তর-পশ্চিম ভারতের কাচের ও লাক্ষার চুড়ি, শাঁখা, হস্তীদন্তের অলংকার ও কাঠের অলংকার এই অধ্যায়ের অন্তর্গত।

ধাতব কারুকলার অধ্যায়ের গোড়ার দিকে ত্রৈলোক্যনাথের একটি বক্তব্য তাঁর সুনিপুণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার পরিচয় দেয়। আজকের দিনের সুপ্রতিষ্ঠিত পণ্ডিত, প্রত্নবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীদের মতোই ত্রৈলোক্যনাথ প্রাণীদেহের উপাদানে সৃষ্ট আধার ও প্রাকৃতিক ফলমূলের আকারকে সমস্ত রকমের ধাতব পাত্র ও আধারের প্রেরণাদানকারী মূল নিদর্শনরূপে অভিহিত করেছেন [পৃ ১৫৬]। পরে এসেছে স্বর্ণ-রৌপ্য পাত্র এবং ক্রমান্বয়ে এনামেল-করা, খোদাই-করা, খোদাই-বসান প্রভৃতি নানারকম কাজের কথা। কিন্তু এখনকার অনুসন্ধানীদের জন্য দেশের ব্যাপকতম অংশে সর্বশ্রেণীর মানুষের দ্বারা ব্যবহৃত কাঁসা-পিতলের বাসন-কোসনের পরিচয় দক্ষ-পরিদর্শক ত্রৈলোক্যনাথের রচনায় সর্ববৃহৎ অংশ অধিকার ক'রে আছে [পৃ ১৮৬-২১৩]। গৃহস্থালীর বাসনপত্র সম্পর্কে আমাদের

স্বল্পজ্ঞানের পরিচয় এখনকার বহু ডাকসাইটে 'পণ্ডিত' ও 'বাস্তববাদী' প্রত্নবিদ্, নৃবিজ্ঞানী ও কারুশিল্প সমালোচকের ইয়োরোপ থেকে ধার-করা পারিভাষিক শব্দে দেশী পাত্র-বিচার ও অতীতের পাত্র-বর্ণনার 'মূল্যবান' গ্রন্থাবলি দেখলেই স্পষ্ট বোঝা যাবে।

অস্ত্রশস্ত্র ও বর্ম প্রভৃতির কথা ত্রৈলোক্যনাথের পুস্তকের বিশিষ্ট অংশ। এই অংশের এক জায়গায় ত্রৈলোক্যনাথ একটি সুন্দর উপমার সাহায্যে ভারতের উপ-মহাদেশিক পটভূমিকায় বিভিন্নস্তরের সভ্যতার মাধ্যম রূপে একই সময়ে বিভিন্ন উপাদানের ব্যবহার সম্পর্কে একটি সুচিন্তিত মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন যে ভারত এমনি একটা দেশ যেখানে মধ্যভারতের একই মানুষথেকো বাঘের কোনো এক ভীল আদিবাসীর বাঁশের ধনুক হ'তে ছোঁড়া তীরের আঘাতের এবং সর্বাধুনিক রাইফেল বন্দুকের গুলির আঘাতের যুগ্ম অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ আছে। তিনি আরও বলেছেন যে ভারতে পাথর কোনোদিনই সম্পূর্ণভাবে কাঠ প্রভৃতিকে আসনচ্যুত করতে সমর্থ হয় নি, অনুরূপভাবে ব্রোঞ্জও পাথরকে এবং লৌহ ব্রোঞ্জকে পূর্ণাঙ্গভাবে সরিয়ে দিতে পারে নি। ভারতের প্রাগৈতিহাস এবং সমাজব্যবস্থা নিয়ে যাঁরা আলোচনা ক'রে থাকেন তাঁদের কাছে এই মতামতের সত্যতাকে বুঝিয়ে বলার কিছু নেই। অস্ত্রশস্ত্রের প্রসঙ্গে ত্রৈলোক্যনাথ দেখিয়েছেন কীভাবে ব্রিটিশ আমলের সরকারী 'আর্মস্ অ্যাক্টে'র ফলে দেশীয় অস্ত্রনির্মাণ-শিল্প অমোঘভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে এসে কেবলমাত্র ইয়োরোপীয় ভ্রমণকারীদের শৌখিন চাহিদা মেটাতে ব্যস্ত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে বর্ধমানের বনপাশ, বিহারের মুঙ্গের, পঞ্জাব ও উত্তরপশ্চিম অঞ্চলের দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্র নির্মাণের কথা ও নানাস্থানের তলোয়ার, ছুরি, প্রভৃতির কথাও এখানে উল্লিখিত হয়েছে।

সমস্ত প্রকারের কাঠের কাজ ত্রৈলোক্যনাথ অসীম ধৈর্যের সঙ্গে বহুবিস্তৃত-ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। কাঠের সাধারণ ও অলংকৃত গৃহস্থালীর আসবাব প্রভৃতি তাঁর বিবরণের পরিধির মধ্যেই ছিল। কাঠের কারুকাজ সম্পর্কে ত্রৈলোক্যনাথ পর্যায়ক্রমে উত্তর-পশ্চিম, পশ্চিম, মধ্য এবং বিশেষ ক'রে দক্ষিণ ভারত, পঞ্জাব, কাশ্মীর, গুজরাট প্রভৃতির কথা বলেছেন। কাঠের কাজের বিবরণে যথারীতি কাঠের কারিগরদের কথা ও কাঠের কারুকৃতির কথাও এসে পড়েছে। সাধারণ আসবাবের পর কাঠের উপর কাঠ ছাড়া অন্য জিনিস অর্থাৎ পাথর, ঝিনুক, ধাতব পাত ও তার এইসব বসিয়ে নক্সা তোলা ও খোদাই করার কাজের কথা আছে। লাক্ষা চড়ান অলংকরণের কথাও এর অন্তর্গত।

কাঠের পর কুড়ি বোনবার পদ্ধতি ও নানারকম ঘাস, বাঁশ, বেত জাতীয় উদ্ভিদের দেহকাণ্ডের ছিন্নাংশ, বল্কল প্রভৃতিতে তৈরি নানারকম দ্রব্যের কথা। এই প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই মাদুর, ঘাস, শীতলপাটি মসলন্দ'র কথা এসে

পড়েছে। 'সিকি', এবং 'মুঞ্জ' ঘাসে তৈরি উত্তর-ভারতের নানা রকমের গ্রামীণ শিল্পের বিবরণও এখানে দেওয়া আছে।

বস্ত্রশিল্পের অধ্যায় ও তার মধ্যস্থিত খণ্ড বিবরণসমূহ 'আর্ট ম্যানুফ্যাকচার্স...' গ্রন্থের শেষাংশে একটি সুবিখ্যাত সমীক্ষা। এতে স্বাভাবিকভাবেই ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের সুতিবস্ত্রের কথাই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার ক'রে আছে [পৃ ৩১৫-৩৮৮]। এখানে ভারতের কথায় ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর মনোবেদনা-মিশ্রিত অভিমত এক অতুলনীয় ভঙ্গিতে ব্যক্ত করেছেন। তিনি দেখাচ্ছেন যে ভারতের পুরাতন ধারার বস্ত্রশিল্প তাঁর সময়কার উৎপাদনের পরিমাণ সত্ত্বেও অন্তিম নাভিশ্বাসের কাছাকাছি এসে পড়েছিল। ছোটখাটো কাঠের টুকরো আর বাঁশ দড়ির বাঁধনি ও কয়েকটি সুতোর সাহায্যে গড়ে তোলা তাঁতযন্ত্র ভারতের তাঁতিরা যে নিজেই সহজে তৈরি ক'রে নিতে পারেন অথবা তাঁর প্রতিবেশী সূত্রধরের কাছ থেকে কিনতে পারেন, তাই দিয়ে ল্যাংকাশায়ারের যন্ত্রাদির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করাটা প্রায় পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম্য গোরুগাড়ির বিলেতের 'ফ্লাইং স্কট্‌সম্যান' নামক সুবিখ্যাত রেলগাড়ির সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতাতে পাল্লা দেবার মতো অসম্ভব ব্যাপার। তিনি আধুনিক অর্থনীতিকের মনোভাব নিয়ে আরও বলেছেন যে এখনো [তাঁর সমসাময়িককালে] যে আদিম ধরনের তাঁত সমগ্র দেশে তুলোর সুতিবস্ত্রের উপর আপন অধিকার বজায় রেখেছে এটা একদিক থেকে আমাদের দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক। কারণ আদিম উৎপাদনযন্ত্রের ব্যবহার আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছে যে ভারতে মানুষের শ্রমের দাম অতি অল্প। আধুনিক যন্ত্রব্যবস্থা বৃথাই আমাদের দেশে এই মৃতকল্প শিল্পকে প্রতিযোগিতায় পরাজিত করার প্রচেষ্টা করছে। কারণ যতক্ষণ আমাদের দেশের শ্রমিক দৈনিক চার আনা রোজগারের সাহায্যে নিজেকে ও স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে বাঁচিয়ে রাখার চেয়ে আরও উন্নততর কিছু করার সুযোগ না পাচ্ছে ততক্ষণ সে আদিম যন্ত্রকে অবলম্বন করেই জীবনকে টেনে চলবে। এখানে ত্রৈলোক্যনাথ আশা প্রকাশ করেছেন আধুনিক যন্ত্রের অধিকারীরা একযোগে জনসাধারণকে আরও উন্নততর শিল্পবৃত্তি গ্রহণের পদ্ধতি নির্মাণে সাহায্য করবেন এবং অনুরূপ শিক্ষা দেবেন। ত্রৈলোক্যনাথের এই বক্তব্য একদিকে যেমন তাঁকে চিন্তাশীল পর্যবেক্ষকরূপে প্রমাণ করেছে তেমনি তাঁর সময়কার সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি দৃঢ়কারীদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে একটা সীমিত দৃষ্টিভঙ্গির প্রমাণ দিচ্ছে। 'আর্ট ম্যানুফ্যাকচার্স...'-এ প্রদত্ত ভারতের মনোমুগ্ধকর ও বৈচিত্র্যপূর্ণ সুতিবস্ত্র, রেশম, পশম, কার্পেট প্রভৃতির কথা ও তার কারিগরদের কাজের ও পারিভাষিক শব্দাদির আলোচনা সুবিস্তৃত এবং একটি স্বতন্ত্র নিবন্ধে আলোচিত হওয়ার যোগ্য। তবে এ প্রসঙ্গে একটা কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর রচনার অনেক অংশেই ভারতীয় কারুপদ্ধতিতে বস্ত্র

উৎপাদনে আধুনিক যন্ত্রের ক্ষমতা অতিক্রমকারী সূক্ষ্ম বয়ন, বুনন ও স্থায়িত্বের কথা উল্লেখ করতে বিস্মৃত হন নি এবং এবিষয়ে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। বিভিন্ন প্রকারের সূচিশিল্প যথা 'চিকন' প্রভৃতি নিয়েও তাঁর সুপরিচিত মতামত এখানে আছে।

'আর্ট ম্যানুফ্যাকচার্স অব ইণ্ডিয়া' একটি সুবৃহৎ কর্মোদ্যোগের ফল। সামগ্রিক-ভাবে বিচার করলে দেখা যাবে যে এই মহাগ্রন্থকে বহুভাবে নানা দিক থেকে বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে ব্যবহার করা যায়। প্রথমেই মনে পড়ে যে ভারতীয় কারুশিল্পের পরিভাষার সন্ধানীরা বার বার এই পুস্তকের বর্ণনামূলক ও অর্থজ্ঞাপক প্রতিবেদনে বহু সমস্যার সমাধান খুঁজে পাবেন। পরিভাষা বুঝতে পারলে কর্মপদ্ধতির প্রকৃতি বোঝাটা সহজতর হবে এবং একেবারে স্থানীয় লোক-স্বীকৃত পরিভাষা আধুনিক মূল্যায়নেও যথার্থতা এনে দেবে ধার করা ও অস্পষ্ট বিদেশী শব্দের পরিবর্তে। ভারতের ভৌগোলিক পরিব্যাপ্তিতে কারুকৃতির অঞ্চল-ভিত্তিক উপস্থিতিকে চিনে নেওয়ার কাজও এই পুস্তকের মাধ্যমে করা চলে। কৃষ্টি-সমন্বয়, কৃষ্টি-সংঘর্ষ, কৃষ্টি-বিনিময় ও কৃষ্টি-অবলম্বন বিশেষ ক'রে ভারতের মতো উপ-মহাদেশে একটা স্বতন্ত্র বিষয়রূপে গণ্য। এই বিষয়ের অনুসন্ধিৎসুরা ত্রৈলোক্যনাথের রচনা থেকে দেশের এক অঞ্চলের কারিগর কী ক'রে অন্য অঞ্চলে বসতি করে অথবা অন্য অঞ্চলের কর্মীকে নতুন পদ্ধতির কাজে নিয়োগ করে, কিংবা ইয়োরোপ থেকে আমদানীকৃত শিল্প-প্রভাবে কারুপদ্ধতি ও শিল্প উৎপাদনের নিঃশব্দ পরিবর্তনে অংশ নিয়েছেন সেটি খুঁজে নিতে সমর্থ হবেন। দেশীয় কারুশিল্পের কাঁচামাল ও দরদাম নিয়ে যাঁরা অনুসন্ধান করতে প্রয়াসী তাঁরাও এই গ্রন্থ থেকে প্রচুর ব্যবহারিক তথ্য পাবেন। কারণ ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থে তথ্যসংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদিত কারুদ্রব্যের দাম টাকার অঙ্কে [তৎকালীন মূল্যমানে] দেওয়া আছে। এই আঙ্কিক তথ্য ভারতীয় কারুকৃতির আর্থনীতিক মূল্যায়নের ও ইতিহাস রচনার পক্ষে অমূল্য। সংগ্রহশালাকর্মীর দৃষ্টি-ভঙ্গিতে বিচার করলে এই গ্রন্থ সম্পর্কে একটা শ্রদ্ধার ভাব আসে। বাস্তবিক শুধু একটি প্রদর্শনীর তালিকা রূপে রচিত বলেই নয় এই গ্রন্থের সুবিন্যস্ত ও পর্যায়ক্রমে প্রদত্ত তথ্যকে যেন চিত্রকলা, ধাতুকলা, অলংকার-শিল্প, কাষ্ঠশিল্প প্রস্তরশিল্প, হস্তীদন্তশিল্প, বস্ত্রশিল্প ইত্যাদির বহুকক্ষ-বিশিষ্ট সুবৃহৎ সংগ্রহশালা বা মিউজিয়মের মতো বলে মনে হয়। সংগ্রহশালা-বিজ্ঞানের গবেষকদের পক্ষে এই বই পাঠ করার পর কেন কারুশিল্প সংগ্রহশালায় শিল্পের উপাদানকে গ্যালারি বা প্রদর্শন-কক্ষ সুনির্দিষ্ট করার ব্যাপারে সর্বাধিক মূল্য দান করা হয় তার একটা কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে। ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায় 'ডেকোরেটিভ আর্ট' আর প্রথম অধ্যায় 'ফাইন-আর্ট'-এর কিছু কিছু অংশ এবং অষ্টম অধ্যায় 'ল্যাপিডারি'স ওয়ার্ক' ছাড়া বাকি সব অংশ বা অধ্যায়কে

যথাযথভাবে [উপযুক্ত সংগ্রহ আয়ত্তে থাকলে] সরাসরিভাবে সংগ্রহশালার বিভিন্ন শিল্পবিষয়ক কক্ষে বিভক্ত ক'রে দেওয়া যায়। ত্রৈলোক্যনাথ গ্লাসগো প্রদর্শনীর কথা স্মরণে রেখে 'ডেকোরেটিভ আর্ট'কে একটি পৃথক স্থান দিয়েছেন। ডেকোরেটিভ আর্ট সম্পর্কে আজও ইয়োরোপের মিউজিয়মে এই রীতি অনুসরণ করা হচ্ছে। ভারতে গত একশো বছরের কিছু বেশি সময়ে মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠা ও তার ক্রমবিবর্তনের একাধিক ঐতিহাসিক কারণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে 'ডেকোরেটিভ আর্ট' শিল্পবস্তুর সংগ্রহকে কোনো উপাদান, উৎপাদন বা রূপগত সূত্রে রাখবার উপযোগী সর্বব্যাপী শৃঙ্খলায় বেঁধে দিতে পারে নি। একটি প্রধানতম সাংস্কৃতিক বা শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানরূপে মিউজিয়মের বা সংগ্রহশালার ইতিহাস-চর্চার মূল্য অবশ্যই আছে। ত্রৈলোক্যনাথের বর্তমান গ্রন্থটি ইতিহাসের সেই-দিকের বিচারে প্রায় অপরিহার্য ও প্রামাণ্য দলিলরূপে বিবেচিত হতে পারে। এই বইতে রক্ষিত হওয়ার যোগ্য নিদর্শনের আহরণ-ক্ষেত্র, উৎস ও দেশের নানা স্থান থেকে প্রাপ্ত নিদর্শনের বিদেশে গমন সম্পর্কে বহুমূল্যবান সংবাদ পরিবেশন ক'রে গবেষকদের যথার্থ সাহায্য করা হয়েছে। ইয়োরোপীয় কারু-সংগ্রহশালা-গুলিতে ভারতীয় কারু-নিদর্শন কীভাবে পরিবেশিত হয়েছিল এবং কোন পদ্ধতিতে প্রদর্শিত হয়েছিল সেবিষয়ে এবং 'সাউথ কেনসিংটন' ও পরবর্তীকালের 'ভিক্টোরিয়া অ্যাণ্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়মে' কী নীতি অনুসৃত হতো তার বহু পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণ 'আর্ট ম্যানুফ্যাকচার্স...' গ্রন্থের মধ্য থেকেই খুঁজে নিতে হবে। আধুনিক ভারতীয় শিল্প সংগ্রহশালার দৈনন্দিন কর্মপদ্ধতিতে— যথা কারু-প্রদর্শের বিজ্ঞপ্তি-পত্র বা 'লেবেল' লিখনে, পরিচয়-পুস্তিকা বা 'গাইডবুক' প্রণয়নে, এমনকি স্থায়ী-অস্থায়ী প্রদর্শনীর প্রদর্শ [চাক্ষুষ উপলব্ধি-যোগ্যরূপে রক্ষিত নিদর্শন] সংস্থাপনে বা 'একজিবিট্-প্রেজেন্টেশনে', সর্বোপরি বর্ণনামূলক তালিকা-পত্র রক্ষণে বা 'ডেস্‌ক্রিপটিভ কার্ড-ক্যাটালগ' তৈরি করার সময়ে ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থটির সাহায্য গ্রহণ প্রায় অপরিহার্য বলে স্বীকৃত হয়ে আসছে।

'আর্ট ম্যানুফ্যাকচার্স অব ইণ্ডিয়ার' একটা বাড়তি গুণ আছে। সাধারণত আমরা দেখতে অভ্যস্ত যে অতিস্থূল ও ধারাল কারুকৃতি বিচারের সমীক্ষা-পুস্তিকাদিতে অনেক সময়ে আলোচনাকে এমন পর্যায়ে টেনে তোলা হয় যেখানে উপস্থিত হবার পর পাঠক কারুশিল্পে যে জীবন্ত মানুষের সৃষ্ট জীবনসম্পৃক্ত কৃষ্টি-পরিচায়ক দ্রব্যসামগ্রী, সেকথা বিস্মৃত হয়ে সমীক্ষকের কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট পরি-সংখ্যানে বা বাক্য-জালে দিশেহারা হয়ে পড়েন। কারুশিল্পের এই সাত্ত্বিক ও অমানুষী 'টেকনিকাল' বাগ্‌বিস্তারের পথ ত্রৈলোক্যনাথ গ্রহণ করেন নি। তাঁর পুস্তকে কারুকর্মের ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত, কারিগরদের জীবনকথা, লোক-প্রকৃতি, সামাজিক ভালমন্দ, দেশের অবস্থা ও দেশের সামগ্রিক অগ্রগতির

অন্ত সংবেদনশীল মননের পরিচয় বার-বার যুক্ত হয়েছে। উপজাতিদের প্রতিরূপের বিবরণে উপজাতীয় বেশভূষা প্রথা ও গোষ্ঠীগত বিশ্বাস প্রভৃতির কথা এসে পড়েছে। কারুকৌশল বোঝাতে কারিগরের মজুরী ও জীবনযাত্রার কথা জানবার সুযোগ পেয়েছি আমরা। দেশ ও জাতির সঙ্গে এই একাত্মবোধ বা 'ইন্‌ভলভমেণ্ট' 'আর্ট ম্যানুফ্যাকচার্স অব ইণ্ডিয়া'কে এত আকর্ষণীয় ক'রে তুলেছে।

ত্রৈলোক্যনাথ ১৮৮৬ থেকে ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে দুইবার ইয়োরোপে গমন করেন। তাঁর সামাজিক-রাজনৈতিক ও কৃষ্টিমূলক অনেক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় 'এ ভিজিট্ টু ইয়োরোপ' নামক গ্রন্থে এন. এন. ঘোষ লিখিত ভূমিকাসহ ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের ভূমিকা থেকে জানা যায় বইটির বিবরণ ধারাবাহিকরূপে এবং সাপ্তাহিক পর্যায়ক্রমে 'ইণ্ডিয়ান নেশন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। বইটির যথার্থই একটা বিশেষ মূল্য ছিল। কারণ পরিণত বয়সে ভারতের মানসিক ও পার্থিব সম্পদ সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠবার পর ত্রৈলোক্য-নাথের পক্ষে নবীন যুবকের দৃষ্টিতে ইউরোপের সাম্রাজ্যিক সভ্যতার বাইরের চাকচিক্য ও আধুনিক দিক থেকে উন্নত যন্ত্রসভ্যতার দ্বারা অভিভূত হবার কোনো সম্ভাবনা এতে ছিল না। এই গ্রন্থে স্বদেশকে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিন্দা অথবা প্রশংসা না ক'রে একটা ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা ত্রৈলোক্যনাথের ছিল। তবে এর পাশাপাশি সাম্রাজ্যিক শক্তির মূল্যবিচারে কিছুটা স্ব-বিরোধিতা দেখা যায়। ত্রৈলোক্যনাথ সাম্রাজ্যিক লুণ্ঠনের মূলগত বিচারের ক্ষেত্রে সীমিত দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন।

এই গ্রন্থে আছে একাধিক সুলিখিত অধ্যায়। তার মধ্যে 'কোলোনিয়াল অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়ান এক্সজিবিশন'-এর সমারোহ ও দর্শকদের কথা, ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ এবং ইয়োরোপের বিভিন্ন সংগ্রহশালা পরিভ্রমণের বিবরণ, পৃথিবীর নানাদেশের মানুষদের প্রতি ইংরেজ-সমেত অন্যান্য ইয়োরোপীয়দের অমানুষিক নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচারের বর্ণনা, ভারতের কারুকৃতি ও কৃষিপণ্য উন্নয়নের সম্ভাবনা আমাদের বর্তমানে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

৪ মে, ১৮৮৬-তে প্রিন্স অব ওয়েলস কর্তৃক সাড়ম্বর উদ্বোধন 'কোলোনিয়াল অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়ান' একজিবিশনের। লেখকের বর্ণনায় এই আড়ম্বর সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি জানাচ্ছেন যে এই উপলক্ষে ম্যাক্সমূলর-রচিত ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত 'জাতীয় সংগীত' (?) হয় এবং ভিক্টোরিয়াকে প্রদর্শনীর সরকারী তালিকা প্রদান করা হয়। ভারতীয় কারিগরেরা তাঁদের শেখান হিন্দু ও মুসলিম অভিবাদনরীতির মিশ্র ধ্বনি ক'রে ভিক্টোরিয়াকে স্বাগত জানাতে থাকেন। লেখক লক্ষ করেন যে ভারতের বিভাগটিই প্রদর্শনীর মধ্যে সবচাইতে জাঁক-

জমকপূর্ণ ছিল। প্রদর্শনীর এক অংশে যেসব 'ভারতীয় যোদ্ধৃজাতি' ইংলণ্ডের ক্ষমতা পূর্বদেশে প্রতিষ্ঠিত রাখতে সাহায্য করেছে তাদের কাদামাটির প্রতিরূপ দেখান হয়েছিল। সামগ্রিকভাবে এই বিবরণের কৌতুককর ও কৌতূহলোদ্দীপক দিকটি বুঝতে আজকের পাঠকের কোনো অসুবিধা হবে না।

সাম্রাজ্যবাদী দেশের দৃষ্টিতে ভারতের কোন রূপটি সবচাইতে আকর্ষণীয় তা প্রদর্শনীর ভারতীয় বিভাগের প্রবেশ-পথের কাছে রাখা একটি কৃত্রিম দিগন্তলীন দৃশ্য-প্রতিরূপে নগ্নভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। আধুনিক ভারতের অনেক সংগ্রহ-শালার দৃশ্য প্রতিরূপ ('ডায়োরামা') প্রভৃতির বর্ণনভঙ্গির উৎসও এর থেকে পেয়ে যেতে পারেন। দৃশ্যটিতে আছে তরাইয়ের গহন জঙ্গলে শুঁড়-উঁচু-করা হাতি, হাতির মাথায় বাঘ ও রক্তস্রোত, সচকিত স্তব্ধগতি হরিণের দল, গাছে বানর, পাতার আড়ালে ময়ূর, আকাশে শকুনি অন্তদিকে শুঁড়িমেরে এগিয়ে আসতে থাকা সোঁদরবনের বাঘ ইত্যাদি। যেন মনে হয় বন্দুকের সাহায্যে শতমারী সহস্রমারী বন-ঠেঙান মহাপ্রভুদের উপভোগ্য ঊনবিংশ শতকের মনগড়া অনেক-গুলো 'প্রিন্ট'কে তালগোল পাকিয়ে দেওয়া হয়েছে এখানে। ত্রৈলোক্যনাথ জানাচ্ছেন প্রদর্শনীর বামদিকস্থ 'ইণ্ডিয়ান ইকনমিক কোর্ট'-এ ভারতের অধিবাসী-দের কাদামাটির প্রতিরূপ রাখা ছিল। ঝিনুকে বৃক্ষপত্রে নিকটাত্মীয়ের মাথার খুলি ঝুলিয়ে থাকা আন্দামানের নরনারী, সিন্‌ফো, নাগা, মিরি, আবর, খাম্‌তি, মিকির, দাফ্‌লা, খাসি, জৈন্তিয়া, গারো, মেচ, লিখো, লেপ্‌চা, গোর্খা, গাড়ো-য়ালী, সাঁওতাল, পাহাড়ি, ওঁরাও কোল, গোণ্ড এবং কোলগোষ্ঠীর উপজাতি, ইরুলা, বাদাগা, টোডা, কুর্গ প্রভৃতি দক্ষিণদেশের অধিবাসী, ভীল, মিনা এবং ঠাকুর, জাঠ, রাজপুত ও পাঠান এইসব আরও কিছু ভারতের মানুষকে দেখান হয়েছে এখানে। বর্মার অধিবাসী এবং কারেন আদিবাসী এখানে উপস্থিত। সর্বপ্রকার কারুদ্রব্য এসবের পাশাপাশি রাখা এবং সমস্ত মিলিয়ে একটা ভারতীয় (?) পরিবেশ সৃষ্টির প্রচেষ্টা করা হয়েছে। ত্রৈলোক্যনাথকে এই প্রদর্শনীতে আগত বিচিত্র দর্শকদের সম্মুখীন হতে হতো। তিনি ইয়োরোপীয় দর্শকদের কৌতূহল ও জানবার আগ্রহকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। প্রদর্শনী চলাকালে কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথের মনে হয়েছিল যে তথাকথিত সহৃদয় ইয়োরোপীয়দের যা-কিছু হিন্দু ('ভারতীয়' অর্থে) তাকে প্রশংসা করার মাধ্যমে আমাদের সর্বনাশ করার আরও সুচারু ও ভাল কোনো উপায় উদ্ভাবিত হয় নি, কারণ এই প্রশংসার সাহায্যেই ভারতীয়দের মতো সংবেদনশীল ও গর্বিত এবং বিদেশী শাসনের অধীনে থাকা মানুষদের মানসিক দুর্বলতা ও শারীরিক অক্ষমতাকে অতীতের দিকে পিছনের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাওয়া হয়। [পৃ ৭৭]। ত্রৈলোক্যনাথ লক্ষ করেছিলেন যে বিলেতের সাধারণ মানুষের কাছে ভারতের কারুকলা খুবই আকর্ষণীয় রূপে দেখা দেয় এবং অপেক্ষাকৃত মহার্ঘ অলংকারাদির

চাকচিক্যময় প্রদর্শীধারের আশেপাশেই সবচাইতে বেশি ভিড় হয় [পৃ ৯০]। অলংকারাদির পরেই ভারতের মৃৎপাত্র শিল্প, ধাতব তৈজসাদি ও লাক্ষার কাজ এবং তামা-পিতলের কারুকার্য বেশি সমাদর লাভ করে। অন্যদিকে ভারতের বস্ত্রশিল্প, হস্তীদন্তের কাজ সাধারণের মধ্যে ততটা আগ্রহ সৃষ্টি করে নি [পৃ ৯৩, ৯৪], কিন্তু প্রদর্শনীর যে-বিভাগে ভারতীয় কারিগররা তাঁদের বিশেষ বিশেষ হাতের কাজ ক'রে দেখাচ্ছিলেন সেই ভারতীয় 'বাজার' দৃশ্যের নিকটে সাধারণ ইংরেজের ভিড় ছিল যথেষ্ট পরিমাণে [পৃ ৯৯]। সমগ্র ব্রিটিশ-দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নরনারী ও শিশুদের দল এখানে সর্বক্ষণ ভিড় ক'রে থাকত। এখানে তারা দেখে যেত আমাদের দেশের কারিগর সোনার জরির কাজ করছে, কার্পেট বুনে চলেছে নক্সা তুলে তুলে, আর 'ক্যালিকো' ছাপ তুলছে হাতে ক'রে। ত্রৈলোক্যনাথ এই ঘটনায় অহেতুক গর্বিত ও উচ্ছ্বসিত কিংবা অভিভূত হয়ে পড়েন নি, সুতীব্র কিন্তু গভীর বেদনামিশ্রিত উপলব্ধির সঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে বিলেতের সাধারণ মানুষের আমাদের কারিগরদের হাতে তৈরি শিল্পসুষমা এবং তারা যেসমস্ত হাতিয়ার আগেই পরিত্যাগ করেছে সেই সমস্ত স্থূল যন্ত্রাদির ও উপকরণের ব্যবহার দেখে আশ্চর্য হয়ে যাওয়াটা অনেকটা একজন হিন্দুর একটি শিল্পীকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠানে পুরোহিতের ভূমিকায় তার সামনে খুলে রাখা তালপত্রের সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে শাস্ত্রপাঠ করতে দেখে আশ্চর্য হয়ে যাওয়ার মতো। তিনি লিখছেন আমরা তো 'ইণ্টারেস্টিং' কিন্তু জুলু সর্দার ও সিউক্স দলপতিও [রেড ইণ্ডিয়ান] তাই [পৃ ৯৯]।

উপরের বিবরণ থেকে কখনোই মনে করা উচিত হবে না যে ত্রৈলোক্যনাথ কোনো হীনমন্যতার শিকার হয়েছিলেন। তিনি ইয়োরোপের আধুনিক যুগের বহু অগ্রগতির প্রশংসা করেছিলেন বটে কিন্তু বার বার ইয়োরোপীয় জাতিদের বিশ্বব্যাপী অত্যাচারের কথা বিস্মৃত হয়ে থাকতে পারেন নি [১২২, ১২৩, ১৪৮, ১৬৮, ১৭০-৭১, ১৭৩, ২৭০, ৩০৭ ইত্যাদি]। অন্যদিকে ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ভারতবাসীর সাধারণ বিশ্বাসযোগ্যতা, সততা প্রভৃতির কথা তুলে ধরেছিলেন ['অল্-ইদ্রিসি' থেকে উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য [পৃ ১৭০]। ত্রৈলোক্যনাথ লিখছেন যে আমরা দেখেছি কীভাবে স্পেনের হাত আমেরিকাবাসীর রক্তে রঞ্জিত। ব্রাজিলে পর্তুগীজরা কাপুরুষের মতো স্থানীয় অধিবাসীদের শিকার-ক্ষেত্রে বসন্তরোগীর পরিত্যক্ত জামা-কাপড় রেখে মহামারী ছড়িয়ে দিয়ে তাদের ধ্বংস করতে চেষ্টা করত। উত্তর-আমেরিকার ইয়োরোপীয়রা 'উটাহ্'র মরু অঞ্চলে লাল মানুষদের ব্যবহার্য জলের কূপে ভয়ংকর স্ট্রিক্‌নাইন বিষ মিশিয়ে রাখত। আমেরিকার সভ্য ইউরোপীয় মহিলারা কীভাবে দুর্ভিক্ষের নিরন্ন দিনে 'আর্সেনিক' বিষ মেশান খাদ্য ক্ষুধার্ত স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে বিতরণ করতেন সেকথা বলতে তিনি ভুলে যান নি। শেষে টাসমানিয়ার ইংরাজ

উপনিবেশকারীদের কথা আছে, যারা তাদের গৃহপালিত কুকুরদের জন্য অপেক্ষাকৃত ভাল খাবার না পেলে টাসমানিয়ানদের গুলি ক'রে হত্যা ক'রে ফেলত। এর পরে ত্রৈলোক্যনাথের বক্তব্য স্পষ্ট। তিনি বলছেন বাঙালীরা দুর্বল, কাল রঙের আর 'কাপুরুষ' হলেও গর্বের সঙ্গে বলতে পারে যে তারা ঐ পর্যায়ে নিজেদের নামাতে পারে নি। কিন্তু এর পরেও ইংলণ্ডকেই সুবিচার ও দয়ামায়ার পক্ষাবলম্বী সর্বাধিক মানুষের দেশ বলে গণ্য করতে ত্রৈলোক্যনাথের বাধে নি। ভিক্টোরীয় যুগের গণতন্ত্রের মুখোশ এমনিভাবেই পৃথিবীর অনেক অংশের মানুষকে বিভ্রান্ত করেছিল।

ইয়োরোপে থাকার সময়ে ত্রৈলোক্যনাথের সঙ্গে সুবিখ্যাত লঙ্ সাহেব বা রেভারেণ্ড লঙ্-এর একটা যোগাযোগ স্থাপিত হয়। লঙ্ ও ত্রৈলোক্যনাথ বহুক্ষণ ধরে কোলোনিয়াল একজিবিশনের দর্শকদের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং তাদের মতামত শুনতেন [পৃ ৭৯]। লঙ্ প্রতি বৃহস্পতিবার ত্রৈলোক্যনাথের কাছে যেতেন। তাঁর কাছ থেকে 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা নিয়ে পড়তেন। তাঁর জিজ্ঞাসা ছিল, হিন্দুদের ভারতের বাইরে পদার্পণের বিরোধিতা কী প্রকারের? জিজ্ঞাসা করতেন রেলপথের প্রচলন কি ভারতবাসীকে বিদেশ ভ্রমণের সুবিধাদি দেখিয়ে দেয় নি? লঙ্-এর একটি প্রশ্ন বহু সম্ভাবনাময় চিন্তার সূচনা করতে পারে। লঙ্ ত্রৈলোক্যনাথকে প্রশ্ন করেছিলেন যে ভারতবাসীরা জাতিহিসাবে ইংরাজদের প্রতি দোষারোপ করে কেন? লর্ড নর্থব্রুক্, জর্জ বার্ডউড্, জন ব্রাইট্, মিস ম্যানিং এবং ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল কি যথার্থ ভারতবন্ধু নন? মহেন্দ্রলাল সরকারের উদ্যোগে ক্রমপ্রসারমান ইণ্ডিয়ান 'অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স' সম্পর্কেও দু'জনের মধ্যে মতবিনিময় হতো এবং লঙ্ উক্ত প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মের সংবাদে আনন্দিত হতেন। বিলেত পরিভ্রমণের সময়ে ত্রৈলোক্যনাথ যে স্বদেশের সঠিক উন্নতির সম্পর্কে সচেতন ছিলেন সে বিষয়টি 'এ ভিজিট টু ইয়োরোপে'র নানা অংশে ছড়িয়ে আছে। ত্রৈলোক্যনাথ বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের এবং অন্যান্য স্থানের রেশম শিল্পীদের দুরবস্থা ও এ ব্যাপারে ওয়াডল্, উড্‌ম্যাসন, নৃত্যগোপাল মুখার্জী প্রভৃতির অবদানের কথা এবং উৎপাদনের খরচ কমান ও মধ্যস্বত্ব-ভোগীদের শোষণ থেকে তাঁদের রক্ষা করার কথা আলোচনা করেছেন। লণ্ডনের 'ড্রাগ মার্কেটে' গমন ক'রে দেশীয় কোন কোন গাছ-গাছড়ার বিদেশে চাহিদা আছে তা লক্ষ করেছেন, গ্লাসগোর নিকটস্থ পেস্‌লে ও গ্রীনক নামক স্থান দুটিতে তৈরি-হওয়া কৃত্রিম ও অনুকৃতির সাহায্যে তৈরি কাশ্মীরী শাল শিল্পের কিরকম ক্ষতি সাধিত হল সেকথা বলেছেন। ভারতের উদ্ভিজ্জ গঁদ রপ্তানির সম্ভাবনা অনুসন্ধান করেছেন, পাটের প্রতিযোগিতার জন্য তসরের কাপড়ের ক্ষতি এবং এক শ্রেণীর তন্তুজ জাঁশের পশম-সদৃশ প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে চলেছেন।

সখেদে লিপিবদ্ধ করেছেন যে ইয়োরোপের বা আমেরিকায় কোথাও ভারতের বাণিজ্যিক স্বার্থ দেখাশোনা করবার মতো কেউ নেই। যেখানে পৃথিবীর প্রত্যেক সভ্যদেশ নিজ নিজ বাণিজ্যিক স্বার্থ দেখবার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে 'কন্‌সাল' বা প্রতিনিধি নিয়োগ করে সেখানে ভারতের মতো মহাদেশ-সদৃশ ভূভাগের আলোকপ্রাপ্ত শাসনব্যবস্থার কোনো প্রতিনিধি নেই। পুরনো পূর্বদেশীয় ও পশ্চিমের চিকিৎসাবিদ্যার যৌথ প্রয়াসে রোগের বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রামের কথা বলতে গিয়ে বিভিন্ন অগ্রগামী ভারতীয় চিকিৎসকদের, যেমন কানাই পাল, মদিন শরিফ্, সখারাম দত্ত ও উদয়চাদ দত্তর কথা উল্লেখ করেছেন।

এবারে আমরা ইয়োরোপে ত্রৈলোক্যনাথের মিউজিয়ম বা সংগ্রহশালা ও তদনুরূপ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের কথায় আসতে পারি। একথা চিন্তা করলে আশ্চর্য হতে হয় যে ত্রৈলোক্যনাথ মিউজিয়মের শিক্ষাগত সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেনতার পরিচয় দান করেছেন। ব্রিটিশ মিউজিয়ম কীভাবে পার্লা-মেণ্টের আইনের দ্বারা জাতীয় সংগ্রহে রূপান্তরিত হয়েছিল সেকথা বিবৃত করার পর তিনি ব্রিটিশ সাধারণ মানুষের জ্ঞানস্পৃহা এবং জ্ঞানভাণ্ডারের স্থানাধিকারীরূপে মিউজিয়মের গুরুত্ব সম্পর্কে সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেন এমন একটা সময়ে যখন পৃথিবী, ও বিশেষ ক'রে ভারতবর্ষে সংগ্রহশালার শিক্ষামূলক চরিত্রের কথাটা সুপরিচিত ছিল না। এর পরে ত্রৈলোক্যনাথ আক্ষেপ প্রকাশ করেন যে বিলেতে যখন দেশের মধ্যে অগ্রগণ্যরা সংগ্রহশালায় দান ক'রে বহু বিষয়কে জনসাধারণের আয়ত্তের মধ্যে জ্ঞানার্জনের জন্য এনে দিয়েছেন তখন আমাদের দেশে আমরা পূজা-অর্চনা ইত্যাদিতেই আমাদের অর্থ, শ্রম ও সময় ব্যয় ক'রে চলেছি। এখানে আক্ষেপ প্রকাশ করা হয়েছে এই বলে যে দেবার্চনায় নিয়োজিত অর্থ যথার্থভাবে আমাদের দেশের মূঢ়তায় অন্ধকারাচ্ছন্ন মানুষের মনে আলোকপাতের জন্য স্কুল, মিউজিয়ম এবং বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষে প্রয়োজনীয়।

এটি একটি সাধারণ ধারা যে শাসক জাতিগোষ্ঠীর নিয়ামকেরা পদানত পশ্চাদ-গামী ও দুর্বলতর অধীন জাতিকে বর্বররূপে দেখতে ও দেখাতে ভালবাসে। ত্রৈলোক্যনাথের মতো তীক্ষ্ণধী মানুষের কাছে ইয়োরোপের সংগ্রহশালাগুলির 'এথ্‌নোলজি' অর্থাৎ নৃ-বিজ্ঞানের অন্তর্গত জাতিবিদ্যাগত [এথ্‌নোলজি মনুষ্য-ব্যবহার্য দ্রব্যের সংগ্রহ সম্পর্কিত] প্রদর্শনীর এই দিকটির প্রকৃতি গোপন থাকতে পারে নি। ত্রৈলোক্যনাথ বলেছেন যে ইয়োরোপের বিভিন্ন মিউজিয়মে পৃথিবীর সকল অংশ থেকে আনীত জাতিবিদ্যাবিষয়ক নিদর্শনাদির সংগ্রহ একজন ভারতীয়ের মনে দুঃখ ও অবমাননার অনুভূতি উদ্রেক করবে। সেখানে ঐ ভারতীয় নিজেকে বিশ্বের বর্বর এবং নরমাংসভোজী সর্বপ্রকার নিষ্ঠুর এবং

কৌতূহলজনক বর্বরজীবনের প্রথার সঙ্গে যুক্ত গোষ্ঠীদের সঙ্গে একই শ্রেণীভুক্ত রূপে দেখতে পাবে। আর ইয়োরোপের জাতিরা এই সমস্ত প্রথা পূর্বেই পরিত্যাগ করেছে। তারা এইসব কাজকর্মের প্রতি মর্মাহত দৃষ্টিপাতে বর্তমানে অভ্যস্ত [পৃ ৩২৪]। এর কয়েক পৃষ্ঠা পর পদানত জাতির মননশীল ও কৃষ্টিবান দর্শকরূপে ত্রৈলোক্যনাথের বক্তব্য জ্বলে উঠেছে তীক্ষ্ণ উপলব্ধিতে। ভারতীয়দের বর্তমান মাপকাঠিতেই মূল্যায়নের প্রচেষ্টা করা উচিত, পৃথিবীও তাদের সেইভাবেই দেখবে। তারা অতীতে কী ছিল তার নিরীখে কোনো বিচার হবে না। একজন প্রাচীন পুরাতত্ত্ববিদ্ বা পণ্ডিত ব্যক্তি ভারতীয়দের সম্পর্কে একটা সম্মানজনক মনোভাব গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু ইয়োরোপে প্রতিটি নরনারী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বা পুরাতত্ত্ববিদ্ নন। সত্য কথা বলতে কি, পঞ্জাবের সমভূমিতে বহুসহস্র বৎসর পূর্বে এক যাযাবর জাতির দ্বারা উচ্চারিত গীতিমালা এখনকার পৃথিবীকে বিস্ময়ের আঘাতে মূক অথবা মনকে পক্ষাঘাতে আশ্চর্য ক'রে ফেলে নিশ্চল ক'রে দিতে পারে নি। এ পর্যন্ত এসে ত্রৈলোক্যনাথ বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর বিপরীতমুখী টানাপোড়েনে খিন্ন উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের [ও বিংশ-শতকেরও] নিদারুণভাবে সাধারণ ভারতীয়ত্বের মর্মান্তিক উপলব্ধিতে এসে পড়েছিলেন। দূরবর্তী জগতের কাছে যে একজন ব্রাহ্মণ ও একজন খোণ্ড গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই ; একজন জৈন ও আর একজন মুসলমানে কোনো তফাত নেই। বাইরের পৃথিবীর কাছে জৈনরা জীববলি-দানের প্রথাকে নিন্দা করেন অথবা মুসলমানেরা যে সতীদাহ প্রথাকে অস্বীকার করেন এসব কথা বলার কোনো অর্থ হবে না। সেখানে ভারতীয়রা সকলে একটা নির্দিষ্ট আকারবিহীন পিণ্ডের মতো ভারতে অনুষ্ঠিত সকল প্রকার চমকপ্রদ কাজকর্মের জন্য সাধারণ বিচারের সম্মুখীন হয়েছে, সেকথা ত্রৈলোক্য-নাথ ব্যর্থহীনভাবে ব্যক্ত করেছেন [পৃ ১২৭]।

এখানে ত্রৈলোক্যনাথের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে ইয়োরোপের উনিশশতকীয় সংগ্রহশালার জাতিস্বত্বমূলক প্রদর্শনীর পুনর্মূল্যায়নের সুযোগ রয়েছে, কারণ এই প্রকারে প্রদর্শনী জনতার জন্য উন্মুক্ত তথাকথিত 'পাবলিক মিউজিয়মে'র মাধ্যমে উপনিবেশবাসীদের সম্পর্কে সাধারণ ইয়োরোপীয়ের মননে চিন্তায় একটা ছাপ ফেলেছিল বলে অনুমান করা যায় সহজেই।

ত্রৈলোক্যনাথ 'ব্রিটিশ মিউজিয়মে'র প্রাগৈতিহাসিক, ও প্রাচীন ইয়োরোপীয় সংগ্রহাদির কথার পর 'সাউথ কেনসিংটন মিউজিয়মে'র ইয়োরোপীয় ক্লাসিকাল শিল্পকলার 'প্লাস্টার' প্রতিরূপের প্রসঙ্গ অতিক্রম ক'রে প্রথমে 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি' এবং 'ইণ্ডিয়া অফিসে' স্থিত ও পরে 'সাউথ কেনসিংটনে' স্থানান্তরিত ভারতীয় কারুকলা ও শিল্পবস্তুর কথায় এসেছিলেন। অবশ্য ইতিমধ্যে তাঁর সময়ে ব্রিটিশ মিউজিয়মের এশীয়-সংগ্রহের অপ্রতুলতার প্রতিও

তিনি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বিস্মৃত হন নি। 'কিউ'স্থিত উদ্ভিদ উদ্যানের উদ্ভিদ-নিদর্শনের পৃথিবীব্যাপী সংগ্রহ এবং ঐ স্থানের 'আর্থনীতিক উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের মিউজিয়মে'র কথা এসেছে এর পরে।

ইংলণ্ডের পরে ত্রৈলোক্যনাথ হল্যাণ্ডের রটারডাম, হারলেম্ ও আমস্টারডাম পরিদর্শন করেছিলেন। রটারডামের উদ্ভিদ-উদ্যান ও পশুশালার পর হারলেমে গমন ক'রে হল্যাণ্ডের 'কোলোনিয়াল মিউজিয়মের' অধ্যক্ষের অতিথিরূপে তিনি যবদ্বীপ, সুমাত্রা, বোর্নিও এবং ফিলিপাইনের এবং তথাকথিত 'ডাচ ইণ্ডিয়া'র নানান উৎপাদিত দ্রব্য দর্শন করেন এবং সর্পচর্ম ও পাখির পালকের বাণিজ্য-সম্ভাবনা সম্পর্কে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন। এখান থেকে আমরা জানতে পারি কীভাবে জাভা সুমাত্রা অঞ্চলের সুন্দর পাখির পালক বা সাপের চামড়া দক্ষিণ ইয়োরোপের মহিলাদের শিরোভূষণ ও আলংকারিক শিল্পে ব্যবহার করা হতো। ফিলিপাইনের আনারস পাতার স্যাঁসে তৈরি কাপড় দেখে ভারতে যে এই উপাদান কাজে লাগান হয় না সেকথা চিন্তা করেছেন তিনি। আমস্টারডামে বিখ্যাত প্রকৃতিবিজ্ঞানী এবং পশু উদ্যানের সভাপতি ডঃ ওয়েস্টারমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও পশু উদ্যান দেখার পর তিনি ক. ন. সুইয়েরস্ট্রা নামক জনৈক সুপরিচিত বিশেষজ্ঞের পৃথিবীব্যাপী প্রজাপতির সংগ্রহ দেখেন এবং আমস্টারডামের জলপ্রাণী-বীক্ষণাগার বা অ্যাকোয়ারিয়মের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের সঙ্গে সুমিষ্ট ও লবণাক্ত জলপ্রাণীদের রক্ষণ-ব্যবস্থা পরিদর্শন করেন ও সর্বসময়ে প্রবাহিত স্রোতের মাধ্যমে পরিশোধিত ক'রে পুরাতন লবণাক্ত জল কীভাবে পুনরায় এধরনের বীক্ষণাগারে কাজে লাগান হয় তার কথা উল্লেখ করেছেন। আমস্টারডামের সুবিখ্যাত 'রিকস্ মিউজিয়মে' পৃথিবীখ্যাত রেম্ব্রাঁন্টের 'রাত্রির পাহারা' প্রভৃতি চিত্র সম্পর্কে বিবরণও তাঁর পুস্তকটির এই অংশে আছে [পৃ ৩৩৩, ৩৩৮]।

প্যারিস শহরের মিউজিয়মগুলির মধ্যে ত্রৈলোক্যনাথ প্রথমে 'ত্রোকাদেরো'র প্রাচীন মূর্তিকলা ও 'এথ্নোগ্রাফিকাল' নিদর্শন দেখার পর ল্যুভ্র্ প্রাসাদাশ্রিত সংগ্রহশালার বিভিন্ন বিষয়ের প্রদর্শন-কক্ষের ব্যবস্থা বর্ণনা ক'রে তাঁর বিবরণ সম্পূর্ণ করেন। 'ল্যুভ্র্' মিউজিয়মের প্রাচীন নিদর্শন ফরাসী দেশের ভাস্কর্য, ইতালীয়, ফ্লেমিশ, স্পেনীয় ও ফরাসী চিত্রকলা, গ্রীক, রোমক ও ঈজিপ্টীয় পুরাবস্তু এবং সমুদ্রগামী জাহাজের প্রতিরূপাদি দেখবার পর সহজ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার সাহায্যে চিত্রাঙ্কনের বিভাগকে এই সংগ্রহশালার সর্বশ্রেষ্ঠ সংগ্রহরূপে ব্যাখ্যা করেন [পৃ ৩৪৩-৪৭]।

জার্মানির বার্লিন শহরে ত্রৈলোক্যনাথ একাধিক সংগ্রহশালার মধ্যে একটিতে পূর্বে নিশ্চিহ্ন হওয়া একটি সৌন্দর্যময় মৃৎপাত্রশিল্প কেমনভাবে একজন বৃদ্ধের (যিনি আপন শৈশবে ঐ ধরনের পাত্রাদি তৈরির কর্মকৌশল দেখেছিলেন)

সাহায্যে পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল তার বর্ণনা দেন। তাঁর জার্মানির প্রদর্শক অধ্যাপক রিউলিউক্স, তাঁকে ছবিতে অঙ্কিত কার্পেটের সাহায্যে কীভাবে কার্পেট-বয়নশিল্পের পুরাতন নক্সাসমূহ পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল তা দেখিয়েছেন। ভারতে অনেক সুন্দর হস্ত-কারুশিল্প আধুনিক যুগের অসম প্রতিযোগিতায় বিনষ্ট হয়েছিল। সেইজন্য স্বাভাবিকভাবেই সংগ্রহশালার এই উদ্যোগে ত্রৈলোক্যনাথ আকৃষ্ট হন। আধুনিক সংগ্রহশালা-বিজ্ঞানের ছাত্ররা মিউজিয়মের দ্বারা এধরনের কারুশিল্প-পুনরুজ্জীবনের কার্যক্রমকে গুরুত্ব দেন এবং আমেরিকার 'মিউজিয়ম অব নিউমেক্সিকো' কর্তৃক নাভাহো রেড ইণ্ডিয়ান প্রভৃতিদের সুন্দর নক্সার কম্বল বয়নশিল্প অথবা 'পুয়েবলো'র আদিবাসীদের মৃৎপাত্র তৈরির পুনরুজ্জীবনের কথা জানেন। সম্প্রতি আফ্রিকা এবং লাতিন-আমেরিকার কোনো কোনো দেশের সংগ্রহশালা বর্তমানে এ ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করলেও ভারতের বহু আধুনিক কারুশিল্পের মিউজিয়ম এখনো কেবলমাত্র শিল্পদ্রব্যের নির্জীব ও পরোক্ষ-প্রদর্শনের উদাসিকতার পথেই চলেছে।

বার্লিনের 'এথনোলজিক্যাল মিউজিয়ম' ত্রৈলোক্যনাথ ডঃ বাসটিয়ন নামক ঐ মিউজিয়মের কর্মাধ্যক্ষের সঙ্গে পরিদর্শন করেন। এই মিউজিয়মবিদ্ ভারতে এবং কলকাতায় এসেছিলেন এবং সমগ্র পৃথিবী ঘুরে প্রদর্শনের উপযুক্ত বস্তু নিজ মিউজিয়মের জন্য সংগ্রহ করেন। সংগ্রহশালা সম্পর্কে ত্রৈলোক্যনাথের মতামত যে কত গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ও মূল্যবান সেটা তাঁর এ স্থান পরিদর্শনের পর ব্যক্ত হয়েছে। ত্রৈলোক্যনাথ বলেছিলেন তিনি যত সংগ্রহশালা দেখেছেন তার মধ্যে এই সংগ্রহশালা শ্রেষ্ঠতম এবং জার্মানির সর্বগামী নবজীবনের প্রকাশক। গত বহুবৎসর ধরে সংগ্রহশালা-জগতে এই সংগ্রহশালার পদ্ধতিমূলক কাজ ও গবেষণার রীতি ত্রৈলোকনাথের কথাকেই সমর্থন করে। এ সম্পর্কীয় আলোচনার মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানে রক্ষিত মধ্য-আমেরিকার প্রাচীন ভাস্কর্যাদির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

অষ্ট্রিয়াতে ভিয়েনার রাজপ্রাসাদস্থিত (বেলভিডিয়ার?) সংগ্রহশালার গ্রন্থাগার, বৃহৎ চিত্রকলা ও খোদিত কাজের সংগ্রহ, জাতিতত্ত্ববিষয়ক নিদর্শন, খনিজ নিদর্শন, প্রকৃতিবিজ্ঞানের নিদর্শন, প্রাচীন পুরাবস্তু এবং মুদ্রাতত্ত্বের সংগ্রহের উল্লেখ করার পর ত্রৈলোক্যনাথ একটি গুরুতর বিষয়ের অবতারণা করেন।

এখানে উল্লেখনীয় যে বার্লিনে পরিভ্রমণকালে ত্রৈলোক্যনাথ লক্ষ করেছিলেন যে জার্মান দেশে কীরকম ব্যাপকভাবে ভারতের ধাতব পাত্র ও তৈজস, কাচ-শিল্পপাত্র, লাক্ষা-চর্চিত পাত্র প্রভৃতি কারুশিল্পের প্রথমশ্রেণীর অনুকরণ উৎপাদিত হচ্ছে। ভিয়েনাতে এসেও ত্রৈলোক্যনাথ দেখলেন অষ্ট্রিয়ান কর্তৃপক্ষ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও জাতির উৎপাদিত দ্রব্যসম্ভারের এক সংগ্রহ গড়ে তুলেছেন

এবং কীভাবে এই সংগ্রহ থেকে নিদর্শন স্থানীয় উৎপাদনকারীদের ধার দিয়ে ঐ সমস্ত জিনিসের নকল তৈরি করতে উৎসাহ দিচ্ছেন। ত্রৈলোক্যনাথ বলেছিলেন বিদেশে ব্যবহারের জন্ত [সোজা কথায় বিদেশে রপ্তানি বাণিজ্যের জন্ত] এই প্রকারের উদ্যোগ ইয়োরোপীয় মহাদেশের অনেক অংশেই গ্রহণ করা হয়েছিল। আজকে যাঁরা ভারত তথা অন্যান্ত উপনিবেশের দেশগুলিতে কারু-শিল্প বিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করবেন তাঁদের কাছে ত্রৈলোক্যনাথের প্রদত্ত এই তথ্যের মূল্য অপরিসীম। পূর্বদেশের কারুকৃতিতে ইয়োরোপীয় প্রভাব কোন বক্রপথে এসেছিল তার কাহিনী এখানে সন্ধান করলেই পাওয়া যাবে। ভারতেও উনিশ ও বিশ শতকে ইংলণ্ড জার্মানদেশ প্রভৃতি থেকে আসা নকল ভারতীয় (?) কারুকাজের দ্রব্যাদি বা ভারতের পদ্ধতিতে চীনামাটির দেব-দেবীর মূর্তি এবং লিথোগ্রাফের কথা আমরা অল্পবিস্তর জানি। এই অনুকরণ এবং নকল দ্রব্যের ব্যবসার জন্ত অস্ট্রিয়া যে পৃথিবীর নানাপ্রান্তে কন্সাল রাখত এবং এই কন্সালদের পাঠানো বিবরণের ভিত্তিতে রচিত দ্রব্যমূল্য, চাহিদা, বাণিজ্য-শুল্ক এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য সাপ্তাহিক 'সার্কুলার'-এর মাধ্যমে উৎপাদক ও আড়তদারদের মধ্যে বণ্টন করত সেটা বিশেষ তাৎপর্যময়। বলা বাহুল্য এধরনের উদ্যোগ শুধুমাত্র অস্ট্রিয়ার সীমাবদ্ধ ছিল না [পৃ ৩৬৭]।

অস্ট্রিয়ার পর ইতালীতে ফ্লোরেন্স [পৃ ৩৭৯] ও রোমে [পৃ ৩৯০] ত্রৈলোক্য-নাথ বিভিন্ন ধরনের কয়েকটি মিউজিয়ম ও বিখ্যাত প্রাচীন সৌধাদি প্রদর্শন করেন। ভেনিসের স্থাপত্যের প্রাচুর্য তাঁকে ঐ শহরের প্রাক্তন শাসকদের নিষ্ঠুরতার কথা মনে পড়িয়ে দিয়েছিল। আমাদের বর্তমানে আলোচ্য বিষয়ে সেইসব বিবরণ ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাহলেও এর মধ্য দিয়ে ত্রৈলোক্যনাথের জীবনদৃষ্টির একটি দিক সম্পর্কে আমরা আরও সচেতন হয়ে উঠতে পারি।

বাংলার সংগ্রহশালা বিষয়ক এবং কারুশিল্পসংশ্লিষ্ট আলোচনার ক্ষেত্রে উপযুক্ত তাৎপর্যময় শব্দসম্ভারের অভাব অনেক সময়েই একটা বড় আকারের সমস্যার সৃষ্টি করে। এর একাধিক কারণের মধ্যে দেশীয় কারিগরদের ব্যবহৃত প্রয়োগ-সিদ্ধ শিল্পশব্দাবলির প্রতি আমাদের অবজ্ঞা ও অবহেলাই সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর। ত্রৈলোক্যনাথ এই ধরনের ভ্রান্ত অবজ্ঞাকে একেবারেই আমল দেন নি। ফলে তাঁর ব্যবহৃত পরিভাষা সরল সুষ্ঠু প্রথায় দ্বারা আমাদের একটা উত্তম এবং আদর্শ পদ্ধতির প্রবর্তন করতে সক্ষম হয়েছে।

ত্রৈলোক্যনাথ বাংলায় একাধিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তার মধ্যে ব্যবহারিক প্রয়োগে ও প্রাঞ্জল আলোচনার জন্ত 'লৌহ' নামক প্রবন্ধটি নিশ্চিতভাবে উল্লেখ করার মতো। আকর থেকে লৌহ-নিষ্কাশন করবার পদ্ধতির বর্ণনায় লেখক একাধিক দেশজ শব্দ সহজে ও অনায়াসে নিয়োগ করেছেন। এইভাবে কর্ম-কারদের ব্যবহৃত 'জাঁতা' বা 'হাপর', 'ঢে কি কল', 'নোল দেওয়া' বা 'আল্‌গা

দেওয়া', তাপ প্রবাহ চালনার রীতি অথবা 'তাও' দেওয়া, প্রথম পর্যায়ে গলিত হবার পরে লম্বা লোহের পিণ্ড বা 'গিরি' প্রভৃতির কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। এখন পর্যন্ত বাংলার গ্রামদেশে এইসব শব্দ নিরক্ষর কর্মকারদের 'লেহাই'য়ের আশেপাশে শুনতে পাওয়া যায়। আমরা এসব শব্দের কোনো খবর রাখি না, আর ধাতুবিজ্ঞানের প্রয়োগকৌশল বা কারিগরী নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আজও দুরূহ, অসার ও কৃত্রিমভাবের শব্দ দিয়ে এমন একটা বিকট জিনিস খাড়া করি যা সময়ে সময়ে আমাদের নিজেদের পক্ষেই সম্পূর্ণরূপে বোঝা কষ্টকর হয়ে ওঠে। ত্রৈলোক্যনাথের দৃষ্টিভঙ্গি উদার, বাস্তবানুগ ও নৃবিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ কর্মীদের মতো থাকাতে তাঁর রচনাগুলির কৃষ্টিগত মূল্য অপরিসীম। লোককথার সংগ্রাহকরূপে ত্রৈলোক্যনাথ বর্ণিত 'লোহাসুরের উপাখ্যান' আমাদের কাছে বিশেষ মূল্যবান। এর মধ্যে দিয়ে আমরা লোহার কর্মকার, পিতল কর্মকার কাঁসারী, স্বর্ণকার বা স্বর্ণ-কামার, ঘণ্টা কর্মকার, চাঁদ কামার, ঢোক্রা কামার ও তাম্র কামারদের শ্রেণী-বিভাজন ও কর্ম-উদ্ভবের লৌকিক রীতিটি বুঝে উঠতে সমর্থ হই। মুঘল যুগীয় রীতিতে উদ্ধাপিণ্ড হতে লৌহ-তরবারি নির্মাণের কথা থেকে বীরভূম, ছোটনাগপুর, বর্ধমান, মুঙ্গের, গরক্‌পুর প্রভৃতি অঞ্চলে দেশীয় লৌহ-শিল্পের কর্মপদ্ধতি, বাৎসরিক উৎপাদনের পরিমাণ সেরকরা ও মনকরা দর, লৌহ শিল্পের অবনতির কারণানুসন্ধান প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে এই প্রবন্ধ এখনো আমাদের কারুশিল্প সমীক্ষাবিদ্, মিউজিয়ম-কর্মী, বিজ্ঞানের লেখককে লজ্জা দিতে পারে। 'লোহা অগরীয়া'দের কথার প্রসঙ্গে মৃতদেহ প্রোথিত করার রীতি ও পরে হাড়কে জলে নিক্ষেপ করা প্রথা বর্তমানের লৌহযুগীয় বিবরণে উৎসাহী নৃবিজ্ঞানী ও প্রত্নবিদ্‌দের নিকটও বিশেষরূপে অর্থবহ। 'নত্থুরাম ও বামা'র দরিদ্র কর্মকার পরিবারের কথায় ত্রৈলোক্যনাথের দেশীয় কারিগরের কারিগরী দক্ষতা ও জীবনসংগ্রামের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধার ভাব প্রকাশিত হয়েছে এবং ত্রৈলোক্যনাথ উপাধিধারী কিন্তু অজ্ঞ তথাকথিত শিক্ষিতদের পক্ষে না থেকে বাংলার এবং বিহারের কর্মকারদের কাছের মানুষরূপে দেখা দিয়েছেন। 'লৌহ' নামক প্রবন্ধটি ছাড়া ত্রৈলোক্যনাথের রচিত প্রবন্ধাবলির মধ্যে 'এরণ্ড বা রেড়ি', 'পশম' ও 'পাথুরে কয়লা' সমানভাবে মর্যাদালাভের যোগ্য। এতে ব্যবহারিক বিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজতত্ত্ব ও অর্থনীতি এবং লোক-জীবনের উপাদান অসামান্য দক্ষতায় প্রকাশিত। যে ধরনের মুক্তিবাদী অন্তর্দৃষ্টি সকল সমীক্ষামূলক সমস্যাকে ও সংগ্রহশালা বিষয়ক রচনাকে প্রাণবন্ত ক'রে তুলতে সাহায্য করে ত্রৈলোক্যনাথের রচনাতে সেটি ছিল। তাঁর সমস্ত প্রবন্ধের ও বিজ্ঞানবিষয়ক পাঠ্যপুস্তকের একটা সর্বব্যাপী মূল্যায়ন আজকের দিনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং মাতৃভাষার বৈজ্ঞানিক আলোচনাকে সাফল্যমণ্ডিত করার পক্ষে অপরিহার্য।

ত্রৈলোক্যনাথ বিস্তৃত পরিপ্রেক্ষিতে কর্মোদ্যমে আস্থাবান, বহুদিকে উৎসাহী, বহুবিষয়ে অনুরাগী গবেষক, প্রবন্ধকার ও সংগঠক ছিলেন। ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতের বিশিষ্ট পটভূমিকায় তাঁকে ও তাঁর মানসিক সংঘাতকে বোঝবার প্রচেষ্টাই বাঞ্ছনীয়। হয়ত কোনো কোনো ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল উনবিংশ শতাব্দী কালীন দ্বিধা-দ্বন্দ্বে প্রক্ষিপ্ত এবং বিচ্ছিন্ন। সাম্রাজ্যিক স্বার্থ ও স্বদেশীয় স্বার্থ পর্যায়ক্রমে তাঁকে খানিকটা দ্বিধাগ্রস্ত করেছে একাধিকবার। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি পশ্চিমী শাসন-শোষণের সমালোচক। কোথাও তিনি ইয়োরোপ আমেরিকার বাণিজ্যতন্ত্রভিত্তিক অগ্রগতিতে, প্রাচুর্যে ও যন্ত্রের ব্যবহারে আস্থাবান হয়ে তাদের সপ্রশংস সমর্থন করেছেন। কিন্তু কোনো-ক্ষেত্রেই ভারতের মধ্যযুগীয় বর্ণাশ্রম ধর্ম এবং দেশের অভ্যন্তরে নানা দুর্বলতর অংশের প্রতি অত্যাচারী সমাজের সমর্থকরূপে আমরা তাঁকে কখনো দেখতে পাই নি। এই সকল কারণে ত্রৈলোক্যনাথের রীতির, ত্রৈলোক্যনাথের পদ্ধতির ও ত্রৈলোক্যনাথের তির্যক দৃষ্টির নিদর্শনাদি আমাদের কাছে আজও সমাদর লাভ করার যোগ্য। ত্রৈলোক্যনাথের [আপাতদৃষ্টিতে] ব্যঙ্গরসাত্মক সাহিত্যসম্ভার এবং তাঁর ব্যবহৃত গতানুগতিক রীতি বহির্ভূত চিত্রাবলির ব্যাখ্যাও করা চলে তাঁর সমগ্র রচনাবলির সার্বিক মূল্যায়নের মাধ্যমে।

ত্রৈলোক্যনাথের বহু মতামত বা বক্তব্য আজ সংগ্রহশালা-কর্মীরা প্রায় অজ্ঞাত-সারে গ্রহণ করেছেন। দুঃখের কথা, তাঁর কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে তাঁকে না জেনে ও তাঁর কাজকর্মের আলোচনাকে বাদ দিয়ে।

এখন অনুসন্ধান ও গবেষণা চলতে পারে বিশেষ বিশেষ কারুশিল্প সম্পর্কে ত্রৈলোক্যনাথের বক্তব্যকে তথ্যের আলোকে মূল্যায়ন করার দিক থেকে। ভারতের 'ন্যাশনাল আর্কাইভস' ও পশ্চিমবঙ্গের 'স্টেট আর্কাইভস'-এর কাগজ-পত্রের মধ্যে তাঁর কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত নিদর্শন উদ্ধার করার কাজটি বেশ জরুরি। ভারত ও ভারতের বাইরে যেসব সংগ্রহশালা, সরকারী বিভাগ ও সংগ্রাহক ত্রৈলোক্যনাথের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁদের কাছে অনুসন্ধান করাও কর্তব্য। ১৮৮৩-৮৪র 'কলকাতা ইন্টারন্যাশনাল এক্সিবিশন'-সংক্রান্ত প্রতিবেদন ও কাগজপত্র এবং সংগ্রহশালা ও কারুশিল্প সংক্রান্ত সরকারী নীতি-নির্দেশক তথ্যাদিও এজন্য দরকার হতে পারে। ভিক্টোরিয়ার রাজ্যশাসনের জুবিলি উপলক্ষে ভারতের নানা অংশে একাধিক প্রদর্শনী ও সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা করা হয়। লণ্ডন থেকে প্রকাশিত 'জর্নাল অব ইণ্ডিয়ান আর্ট'-এ ঐ সময়েই সরকারী সংগ্রহশালা সম্পর্কে একটি নীতি ঘোষিত হয়েছিল। ত্রৈলোক্যনাথের কাজের সূত্রে এটিকে পুনরায় বিচার করা যেতে পারে। 'বেঙ্গল ইকনমিক মিউজিয়ম' এবং কলকাতার ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের 'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ও আর্ট' বিভাগ এবং আনথ্রোপলজি বিভাগের কাগজপত্রের একটা নতুন পর্যালোচনা দরকার।

কীভাবে ত্রৈলোক্যনাথ সংগ্রহশালায় তালিকা প্রণয়ন করতেন, কারুশিল্প ও শিল্প সম্ভাবনাপূর্ণ উদ্ভিদ-নিদর্শনের জন্য বিজ্ঞপ্তি বা মন্তব্যাদি রচনা করতেন সে সবই আমাদের পক্ষে অমূল্য। অক্সফোর্ড ইণ্ডিয়ান ইন্‌স্টিট্যুট্ কিছুদিন আগে 'অ্যাশমোলিয়ান মিউজিয়মে' যুক্ত হয়েছে। শোনা যায়, ঐ প্রতিষ্ঠানের কাগজপত্র 'বোদলিয়ান লাইব্রেরি'তে রক্ষিত। সেখানেও ত্রৈলোক্যনাথ সম্পর্কে অনুসন্ধান দরকার। আরো দেখতে হবে ত্রৈলোক্যনাথের সাহিত্যকর্মে তাঁর এই বহু বিচিত্র কর্মজীবনের ছাপ কতখানি পড়েছে।

বর্তমান অবস্থায়, ভারতের উপ-মহাদেশীয় কৃষ্টির সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য ও তথ্যসংবলিত সমীক্ষার সাহায্যে আমাদের যদি লাভবান হবার ইচ্ছা থাকে অথবা যদি সংগ্রহশালা ও তৎবিষয়ক প্রদর্শনী সংগঠনের মাধ্যমে দেশের সর্বসাধারণের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করতে হয় তাহলে ত্রৈলোক্যনাথ ও তাঁর পথকে ভুলে থেকে বা অবহেলা ক'রে অগ্রসর হওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার রূপে বিবেচিত হবে। ত্রৈলোক্যনাথের রচনার একটি বড় অংশ ইংরেজিভাষায় লিখিত ও প্রকাশিত। এই সমস্ত পুস্তক ও প্রবন্ধাদি একত্র ক'রে একাধিক খণ্ড বিশিষ্ট গ্রন্থাবলির আকারে প্রকাশ হওয়ার যোগ্য। আশা করা যায় এই কাজটি সুসম্পাদন করার জন্য উদ্যোগী প্রকাশকের অভাব হবে না।

গ্রন্থপঞ্জি

১. *Art Manufactures of India* (specially compiled for the Glasgow International Exhibition 1888) by T. N. Mukharji F.L.S, Indian Museum, Calcutta, Officer-in-Charge of the Indian Central Office for the Glasgow International Exhibition; Superintendent of Government Printing, India, Calcutta, 1888.

২. *A Visit to Europe* by T. N. Mukharji, F.L.S, with an introduction by Mr. N N. Ghosh, Bar-at-Law, Newman & Co., 4, Dalhousie Square, Calcutta; Edward Stanford, 55, Charing Cross, London. 1889.

৩. *A Handbook of Indian Products and Raw-materials* by T. N. Mukherji (Author of 'A Rough List of Indian Art-ware' and 'A Catalogue of Indian Products contribruted to the Amsterdam Exhibition', J. Patterson, Calcutta, 1883. এই পুস্তকে একটি সূচনাস্থিত ভূমিকাসহ প্রথম ভাগে কারুশিল্প নিদর্শন এবং দ্বিতীয়-ভাগে খনিজ, প্রাণীজ, উদ্ভিজ্জ ও তৈলশস্যাদির বিবরণ আছে। এই পুস্তক থেকে ইং ১৮৮২ সনে 'এ ক্যাটালগ অব ইণ্ডিয়ান আর্ট-ওয়্যার' প্রকাশিত হওয়ার কথা জানা যায়।

৪. 'Brass, Bronze and Copp.r Manufactures' by T. N. Mukharji in *Art and Industry Through the Ages*—a monograph series on Bengal, Navrang, New Delhi, Jan. 1976. Pages 275-301. ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশে তৎকালীন সরকারী নির্দেশে রচিত কারুসমীক্ষামূলক পুনর্মুদ্রিত রচনাদির সংগ্রহ।

৫. 'Extract from the Proceedings of the Goverament of India in the Department of Revenue and Agriculture, dated Calcutta 14th March, 1813' : *Museums and Exhibitions* by E. S. Buck, Secretary to the Government of India. Pages 1-4. 'Draft Scheme for the Promotion of Industrial Arts in India' by E. S. Buck. Pages 5-6. এই দুইটি মূল্যবান পরিকল্পনা 'জর্নাল অব ইণ্ডিয়ান আর্ট' নামক পত্রিকার প্রথম খণ্ডে (সংখ্যা ১-১৬) অক্টোবর ১৮৮৪-৮৬ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত।

৬. 'Pottery and Glass-ware of Bengal' by T. N. Mukharji, F. L. S., Indian Museum, Calcutta. Pages 99-102. 'জর্নাল অব ইণ্ডিয়ান আর্ট' চতুর্থ খণ্ড (৪৬-৪৩), জানুয়ারি ১৮৯৪-৯৬ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত।

৭. **ত্রৈলোক্য রচনা সমগ্র**, ১ম ও ২য় খণ্ড ; গ্রন্থমেলা, কলিকাতা ১২ ; সম্পাদমণ্ডলী : ডঃ সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য, ডঃ নির্মল দাশ, শ্যামল সেনগুপ্ত, দিব্যজ্যোতি মজুমদার, এবং নেপালপদ দাস। ১৯৭৩-১৯৭৪। [সম্প্রতি প্রকাশিত এই খণ্ডদ্বয় ত্রৈলোক্যনাথকে যথার্থ আলোকে উপস্থাপিত করার পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করে। এর প্রথম খণ্ডে গ্রথিত 'অ্যাবস্ট্রাক্ট অব সার্ভিসেস অব বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মুখার্জী ১৮৬৬-১৮৯৬' (ইংরেজিতে) উল্লেখযোগ্য]

৮. **ত্রৈলোক্য রচনাসম্ভার**, প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত, মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা, ১৩৭৪।

৯. *The Indian Museum 1814-1914*, Trustees of the Indian Museum, Calcutta 1914.

১০. *Industrial Art and the Museum* ; Charles R. Richards, The Mac Millan & Company, New York, 1927.

১১. *Indian Art at Delhi, 1903* : Being the Official Catalogue of the Delhi Exhibition, 1902-1903 by Sir George Watt ; the illustrative part by Percy Brown, Superintendent of Government Printing, India, Calcutta, 1903.

১২. *The Museums of India by* S. F. Markham & H. Hargreaves, London 1936.

এক্ষণ ।। বিজ্ঞপ্তি

বর্তমান সংখ্যাটি ষাদশ বর্ষের প্রথম-দ্বিতীয় যুগ্ম সংখ্যা। পরবর্তী সংখ্যা শারদীয় সংখ্যারূপে সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হবে।

পত্রিকার বার্ষিক গ্রাহক-চাঁদা ১২ টাকা। পত্রিকা অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়, কিন্তু এই চাঁদার মধ্যে বিশেষ সংখ্যাসহ গ্রাহকেরা মোট চারটি সংখ্যা পাবেন। রেজিস্ট্রি ডাকে পত্রিকা পেতে হলে অতিরিক্ত ৮ টাকা পাঠাতে হবে।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা লাইব্রেরিগুলির কাছে আবেদন, তাঁরা যেন বার্ষিক চাঁদা পত্রিকার নামে মনি অর্ডারে অগ্রিম পাঠান। আমাদের পক্ষে আগে থেকে বিল পাঠানো বা কলকাতার বাইরের চেক নেওয়া সম্ভব নয়।

কলকাতার বাইরের এজেন্ট, যাঁরা ডাকে পত্রিকা নিতে চান, তাঁদের ভি. পি.-তে পত্রিকা পাঠানো হয়। কত কপি পত্রিকা দরকার তা আগে থেকে জানাতে হবে। তাঁরা যথারীতি ২৫% কমিশন পাবেন। ডাক-খরচ আমাদের।

যাঁরা লেখা পাঠাতে ইচ্ছুক, তাঁরা কপি রেখে লেখা পাঠাবেন। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া অনেক সময় সম্ভব না-ও হতে পারে। লেখার সঙ্গে ডাক-টিকিট পাঠাবেন না। লেখা মনোনীত হলে জানিয়ে দেওয়া হয়।

চিঠিপত্রের জবাব সবসময় দেওয়া সম্ভব নয়॥

এক্ষণ

১৯৫৪ সালের সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮ ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি

১. প্রকাশের স্থান : কলকাতা

২. প্রকাশের কালানুক্রম : দ্বিমাসিক

৩. মুদ্রাকরের নাম : প্রবীর ঘোষ
জাতীয়তা : ভারতীয়
ঠিকানা : ১৩ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা ৯

৪. প্রকাশকের নাম : প্রবীর ঘোষ
জাতীয়তা : ভারতীয়
ঠিকানা : ১৩ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা ৯

৫. সম্পাদকের নাম : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় | নির্মাল্য আচার্য
জাতীয়তা : ভারতীয় | ভারতীয়
ঠিকানা : অব। এক্ষণ, ১৩ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা ৯ | অব। এক্ষণ, ১৩ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা ৯

৬. স্বত্বাধিকারী : নির্মাল্য আচার্য। ১৩ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা ৯

আমি, প্রবীর ঘোষ, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরে প্রদত্ত বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য। ১-৩-৭৬

(স্বাঃ) প্রবীর ঘোষ

MENDED
IN 2007

প্রকাশ আসন্ন

যুগান্তর চক্রবর্তী-সম্পাদিত

অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যকৃতির পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পেতে হলে শু তাঁর এ-যাবৎ প্রকাশিত গ্রন্থগুলিই যে যথেষ্ট নয়, তার বাইরে আরে আরো এক সম্পূর্ণ অপরিচিত অধ্যায়, তারই অমূল্য দলিল এই প্রকাশনা। ১৯৭৪ এর অক্টোবরে 'এক্ষণে' যে-পরিকল্পনার আংশিক প্রকাশমাত্র প পর্যন্ত দেশের প্রতিটি উল্লেখযোগ্য পত্র-পত্রিকায় যা নিয়ে আলোচনা ব বিতর্কের আলোড়ন চলেছে এবং প্রতিটি সচেতন ঠকের কাছেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায় এক 'নতুন' মূর্তিতে প্রতিভাত, সেই পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণ। বলা বাহুল্য, এই বই ছাড়া মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে যে-কোনো মূল্যায়নই অসম্পূর্ণ থাকতে বাধ্য। সম্ভবত এদেশে প্রথম একজন আধুনিক কথাকারের গোটা ব্যক্তিত্ব-সন্ধানের বৈজ্ঞানিক প্রয়াসরূপে গ্রন্থটি অভিনন্দিত হবে।

এই বইতে থাকছে : সম্পূর্ণ ডায়েরি ॥ চিঠিপত্র ॥ অসুস্থতার বিবরণ ও রোগনির্ণয়ে নিজের গবেষণা সংবলিত খাতাপত্র ॥ শেষ পর্যন্ত অ-লিখিত বহু গল্পের খসড়া ॥ গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত গল্পসমূহের তালিকা ॥ বিস্তৃত নির্দেশপঞ্জি ও প্রাসঙ্গিক যাবতীয় তথ্য ॥ ডায়েরির অসংখ্য প্রতিলিপি ॥ গুরুত্বপূর্ণ একটি সম্পাদকীয় নিবেদন ও নির্ঘণ্ট ইত্যাদি এবং তৎসহ লেখকের পিতার আত্মজীবনীর পাণ্ডুলিপি থেকে অজ্ঞাতপূর্ব তথ্য সংকলন ॥

১৫ ৮.৭৬ তারিখের মধ্যে যাঁরা ৫'০০ টাকা পাঠাবেন তাঁরাই গ্রাহক বলে গণ্য হবেন। গ্রাহকদের বইয়ের উপর ২০% হারে কমিশন দেওয়া হবে। যাঁরা ডাকে বই নিতে চান তাঁদের ডাকখরচ আলাদা দিতে হবে। ডাকে নিলে পরিষ্কার করে নাম ঠিকানা উল্লেখ করবেন। আনুমানিক ২০শে আগস্ট গ্রন্থটি প্রকাশিত হবে।

সতীনাথ গ্রন্থাবলী

১ম খণ্ড ২৪'০০ ॥ ২য় খণ্ড দ্বিতীয় মুদ্রণ যন্ত্রস্থ
৩য় খণ্ড ২০'০০ ॥ ৪র্থ খণ্ড ৩০'০০

সম্পাদনা : শঙ্খ ঘোষ / নির্মাল্য আচার্য

অরুণা প্রকাশনী : ৭ যুগলকিশোর দাস লেন ॥ কলকাতা ৬
পরিবেশক : সিগনেট বুক শপ : ১২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট ॥ কলকাতা ১২

কাজ
দেরী
ান।
আর
ভাব
য়োজন,
না-১২
ার
তুলবে।
আর
স-এ তৈরী
লা-১২
ভাবে,
মার শারীরিক
বে।
খান সুস্থদেহ,
লা-১২
ফার্মাস্যুটিক্যালস লি.
vinkola-12
vinkola-12
shilpi SPL 4A/74 Ben.

Vol: XII No. 1-2
1976

ত্রিপুরায় আসুন

এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য
আদিবাসী সমাজের সহজ সরল আতিথেয়তা
প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শন
এবং
আধুনিক রুচিসম্মত
নানারকম কুটিরশিল্পের উপকরণ
আপনাকে মুগ্ধ করবে।

ত্রিপুরা দেখুন

তথ্য সংযোগ ও পর্যটন অধিকার ত্রিপুরা সরকার